KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 200	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীরা রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৮/2 ৫৮/৩ ৫৮/৪	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫ কার্তিক-পৌষ ১৪০৫ মাঘ-চৈত্র ১৪০৫
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৩
কার্তিক-পৌষ ১৪০৫

আধুনিক ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেকুলারিজমের প্রাসঙ্গিকতা এবং অপরিহার্যতা নিয়ে অর্থনীতিবিদ- সমাজবিজ্ঞানী-দার্শনিক অমর্ত্য সেনের দীর্ঘ সন্দর্ভ — 'সেকুলারিজম এবং সে সম্পর্কে বিবিধ আপত্তি'।

প্রোফেসর দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অমর্ত্য সেন — কোথা থেকে কোথায়' নিবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের অর্থনীতিতত্ত্বকে সহজ ভাষায় সরস ভঙ্গিতে সকলের বোধগম্য করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস।

গৌরী আইয়ুবের আবেগ-ঋদ্ধ স্মৃতিচারণ — 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি'—২য় পর্ব।

প্রবীণ সংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত-র তথ্যসমৃদ্ধ রচনা — 'বঙ্গসংহার এবং' — প্রাক বঙ্গবিভাগ পর্বের প্রাণবন্ত ভাষ্য।

মূল ফরাসি থেকে অনূদিত নোবেলজয়ী কবি সাঁ-জন প্যার্সের বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা — 'আনাবাজ'।

এক এক জন মানুষের বাঁচার ধরন কী রকম ছন্দোময় শিল্পের মতো হয়ে উঠতে পারে তাই নিয়ে সুধীর চক্রবর্তীর সুখপাঠ্য আলেখ্য।

অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — 'আজকের পরিবেশ-বিতর্কের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত'।

অভিজিৎ সেনের গল্প 'কলাপাতা'।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৩
কার্তিক-পৌষ ১৪০৫

■ সেকুলারিজম এবং সে সম্পর্কে বিবিধ আপত্তি	অমর্ত্য সেন	১৭৫
■ অমর্ত্য সেন — কোথা থেকে কোথায়	দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯০
■ আনাবাজ	স্যাঁ-জন পার্স অনুবাদ : শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় অসীমকুমার রায়	১৯৬
■ চক্রব্যূহে	সিদ্ধেশ্বর সেন	২০৫
কবিতা লেখার যোগ্য পৃথিবী এখন	পবিত্র মুখোপাধ্যায়	২০৬
প্রাণমন মাতানো অন্ধকার	মেঘ মুখোপাধ্যায়	২০৭
দল উপদল	সিদ্ধার্থ সিংহ	২০৮
পিছুটান	কিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়	২০৯
একটি পাতা তোমার	মৌলিনাথ বিশ্বাস	২১০
আজকের দিন	সন্দীপ চক্রবর্তী	২১১
■ শান্তিনিকেতনের দিনগুলি	গৌরী আইয়ুব	২১২
■ গৌরী আইয়ুব — ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে	মন্দার মুখোপাধ্যায়	২১৭
■ মানুষ মানুষ সবাই বলে	সুধীর চক্রবর্তী	২২২
■ কলাপাতা	অভিজিৎ সেন	২৩০
■ বঙ্গসংহার এবং	সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত	২৩৮
গ্রন্থসমালোচনা ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ■ পুলকনারায়ণ ধর ■ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ■ মধুময় পাল কামাল হোসেন ■ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ■ হাসির মল্লিক ■ মালবিকা সেনগুপ্ত		২৪২
সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি		
■ আজকের পরিবেশ-বিতর্কের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৯
চিঠিপত্র		
■ সুধীর চক্রবর্তী		২৬২

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে — র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

দূরভাষ : ২৭-৩৭৭০

শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদক : আবদুর রউফ

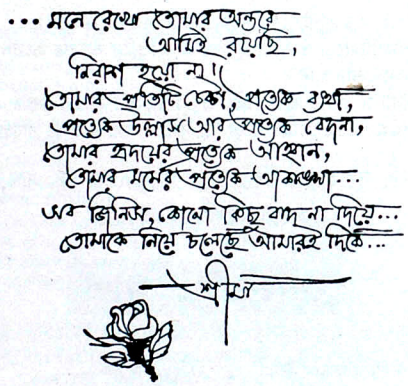

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা—

- উৎসবের আনন্দকে অম্লান রাখতে মাইক্রোফোনের আওয়াজ নিয়ন্ত্রণ করুন।
- হাসপাতাল, নার্সিংহোম সহ যে কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে মাইক্রোফোন ব্যবহার করবেন না।
- নীরব এলাকায় শোভাযাত্রা বা অন্য কারণে আওয়াজ বন্ধ রাখুন।
- নির্ধারিত সময়সীমা ও অনুমতি ব্যতীত মাইক্রোফোন ব্যবহার করবেন না।
- যদৃচ্ছভাবে বাজি ও উচ্চ বিস্ফোরক শব্দসম্পন্ন পটকার ব্যবহার করে শব্দ দূষণ ঘটাবেন না।
- এয়ার হর্ণ ব্যবহার থেকে বিরত হোন।
- অযথা হর্ণ বাজাবেন না।

প্রবন্ধ

সেকুলারিজম এবং সে সম্পর্কে বিবিধ আপত্তি

অমর্ত্য সেন

১। প্রস্তাবনা

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির উপর প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং এই অগ্রাধিকারের বিপক্ষে দৈবাৎ কোনও মতামত উচ্চারিত হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে আজ ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির প্রগাঢ় সমালোচনার স্থায়ী পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায় এবং সেই আক্রমণের উৎসও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধে আমি এইসব অসন্তুষ্টির বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি।

আরও এগনোর আগে আমি যেসব পাঠকের উদ্দেশে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে তাদের সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেব। জাতীয়, সামাজিক এবং মৌলবাদী পরিচয়ের বিষয়ে এবং তৎসম্পর্কিত রাজনৈতিক অনুষঙ্গগুলি ভিত্তি করে বর্তমানে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুদক্ষ বিদগ্ধজনেরা বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও এই বিষয়টি তাঁরা ছাড়াও ভারতবর্ষ ও তার বাইরে অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই অবস্থায় যদি, ভারতীয় ইতিহাস অথবা সমসাময়িক রাষ্ট্রব্যবস্থার সানুপুঙ্খ জ্ঞান একটি পূর্বশর্ত হয়ে সম্ভাব্য পাঠকগোষ্ঠীর সামনে এই আলোচনায় প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রাখে, সেটা খুব দুঃখের বিষয় হবে। এই অসমসত্ত্ব পাঠকগোষ্ঠী, আমার বিশ্বাস, একটি ভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গি দাবি করে, যা কিনা বিশেষজ্ঞদের পক্ষে অস্বস্তিকর হতে পারে। এই অবস্থায় আমি অবশ্যই বিমুখ পাঠকদের কাছে ধৈর্য আশা করব। যদিও আমার স্থির বিশ্বাস রয়েছে যে, এই প্রবন্ধের জোরালো প্রকাশভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পাঠকের কাছে এই বিমুখ বিরক্তি ছাড়া অন্য কিছু অস্বস্তির প্রধান কারণ হয়ে দেখা দেবে।

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্দেশে চালিত করাত আক্রমণের অধিকাংশ এসেছে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের তরফ থেকে, বিশেষকরে বিজেপি'র (ভারতীয় জনতা পার্টি) সঙ্গে জড়িত, যে দলটিকে 'নির্বাচনী মঞ্চে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতধারার প্রধান রাজনৈতিক প্রবক্তা' বলে উল্লেখ করা হয়। কখনও কখনও এই আক্রমণ এসেছে মহারাষ্ট্র ও তার রাজধানী বোম্বাই-নির্ভর, আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাশালী জঙ্গি হিন্দু দল শিবসেনার তরফ থেকে। ধর্মনিরপেক্ষতার স্থায়ী সমালোচক হিসাবে দেখা যায় আর. এস. এস-কেও (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ), যে কিনা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু হিন্দুবাদী সক্রিয় রাজনীতির পিছনে শক্তি যোগানোর অনেকটা কাজই করে, যেগুলির মধ্যে বিজেপি ও তথাকথিত **'সঙ্ঘপরিবারে'**র (হিন্দুত্বনির্ভর রাজনীতি চালিত সমমনোভাবাপন্ন অন্যান্য সংগঠনের একত্র পরিবার) অন্যান্য অংশের দিকনির্দেশিকা রচনা ও নেতৃত্বের যোগান দেওয়াও অন্যতম।

তবুও, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি যে মননশীল সংগ্রহ রয়েছে, তা কেবলমাত্র সক্রিয় রাজনীতিকদের মধ্যেই সীমায়িত থাকেনি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিদগ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনায় এই সংশয়ের সাবলীল প্রকাশ রয়েছে। এই সমালোচনাগুলির অধিকাংশ বিজেপি এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যান্য মুখপাত্রদের থেকে অনেকটা আলাদা। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনায় এই সব সমালোচনার ব্যাপ্তি এবং তীব্রতার কথা এবং একই সঙ্গে এগুলির নানাবিধ উৎসের ও স্বতন্ত্র যুক্তিবিন্যাসের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। যদি আজ 'বহুধর্মী ভারতবর্ষের ভাবাদর্শের মূলভিত্তি স্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিবর্ণ এবং ক্লান্ত ও নিঃশেষিত বলে মনে হয়' তা হলে এই নির্ধারণকে ভুল বোঝা হবে ও গুরুত্বহীন করে দেওয়া হবে, যদি একে কেবল হিন্দু গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়ে থাকে। অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থাকা সত্ত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিকে প্রায়শ

ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা এবং সচেতনতার প্রয়োজন আছে।

এই ধরনের বিকৃত এবং জোরালো প্রতিস্পর্ধা সত্ত্বেও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী মহলে কিছুটা আকর্ষণহীন এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে বেশ অনীহা দেখা যায়। তার পরিবর্তে, সাধারণত সংস্কারবশত, ধর্মনিরপেক্ষতাকে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের শুভপ্রদ ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সদগুণ হিসাবে গণ্য করার যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রশ্নাতীত প্রথা রয়েছে, তার উপরে প্রত্যয় জ্ঞাপন করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে একজন অসংশোধিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হিসাবে আমি এই অনীহার কারণ বুঝি এবং কিছুটা মেনে নিই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এই সমালোচনাগুলির উদ্দেশে লেখার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করি। এর কারণ শুধু এই নয় যে সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিজীবী মণ্ডলে এই প্রতিবাদী আলোচনার তাৎপর্য রয়েছে, তা ছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে এই সব বিষয়গুলির মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন — স্বভাবসিদ্ধভাবে মেনে নেওয়া এইসব অগ্রবর্তী বিষয়গুলির পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা করা এবং একই সঙ্গে তাদের যুক্তিসিদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন। ব্যবহারিক প্রয়োজনে এবং রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে এই সব বিশ্বাসের আত্মপরীক্ষণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছে। এই কারণে, ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত কিছু বিতর্কিত প্রশ্নের সরাসরি আলোচনার উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টা।

২। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার অসম্পূর্ণতা এবং তা অতিক্রমণের প্রয়োজনীয়তা।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি নীতিগতভাবে বিশদীকরণ এবং পর্যালোচনা দাবি করে। আমি ব্যাখ্যা করে দেখাব যে ধর্মনিরপেক্ষতা শিরোনামে এমন কিছু প্রসঙ্গ আসে যেগুলি এর সরাসরি নাগালের বাইরে। ধর্মনিরপেক্ষতার যাজক প্রদত্ত অর্থ (ecclesiastical) না নিয়ে যদি রাজনৈতিক অর্থ গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে যে-কোনও বিশেষ একটি ধর্মপ্রবৃত্তি থেকে পৃথক রাখতে হবে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে কোনও একটি বিশেষ ধর্মকে সুবিধাজনক স্থান দেওয়া স্বীকৃত হবে না। এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, সুবিধাজনক স্থান না দেওয়া বলতে কী অর্থ বহন করে, আর কী করে না। এর জন্য যে, রাষ্ট্রকে সমস্ত প্রকার ধর্মীয় প্রসঙ্গের সংস্রব বাঁচিয়ে চলতে হবে, তা আবশ্যিক নয়। বরঞ্চ রাষ্ট্রকে যত্নকণ অবধি বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, তা যেন মূলত সমদর্শী ব্যবহারের ভিত্তিতে হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

সুতরাং রাজনৈতিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রকে যে সমস্ত ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আদানপ্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে তা নয়। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্র যদি প্রতিটি মানুষের স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পূজার্চ্চনার অধিকার সংরক্ষিত রাখে তার ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘিত হয় না, যদিও এটি পালন করার জন্য রাষ্ট্রকে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির **সাহচর্যে** এবং **প্রয়োজনে** কার্যনির্বাহ করতে হয়। অসমদর্শী ঔৎসুক্য ব্যাতিরেকে (যেমন একটি বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর পূজার্চনার অধিকার রক্ষা করা, অন্য ধর্মগোষ্ঠীগুলির নয়) ধর্মীয় স্বাধীনতার সংরক্ষণ কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির শর্তভঙ্গ করে না।

এখানে লক্ষ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সমদর্শী ব্যবহারের উপযোগিতা একটি খোলা প্রশ্নের অবতারণা করে যে এই সমদর্শিতা ঠিক কী **প্রকৃতির** হওয়া উচিত।

একটি উদাহরণ সহ বলা যায়, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আর্থিক বা অন্য কোনও সাহায্য না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। অন্যথায়, রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের (বা সম্পর্কহীনতার) ভিত্তিতে কোনও পৃথকীকরণ না করে, সমস্ত চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য প্রদান করতে পারে। পূর্ববর্তী পদ্ধতিটিকে আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছেদ করায় অবশ্যই এটি 'সম্পর্কিত' (associative) অর্থে সত্যি) বলে বোধ হয়, পরবর্তী পদ্ধতিটিও **রাজনীতিগতভাবে** যথেষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ, কেননা এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনও ধর্মীয় সম্পর্ক **নির্বিশেষে** (সম্পর্ক থাকলে ধর্মমত নির্বিশেষে) সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করে, এবং এই ভাবে, রাষ্ট্র এবং ধর্মমতগুলিকে পর্যাপ্তভাবে পৃথক রাখে।

যেহেতু এই দুটি পন্থাই রাজনৈতিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীকে এই দুটির মধ্য থেকে (এবং ধর্মনিরপেক্ষ সমদর্শিতার অন্যান্য বিকল্প থেকে) পছন্দের সম্মুখীন হতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কয়েকটি বিকল্প পন্থা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু তবুও বহুবিধ স্বতন্ত্র পথ খোলা রাখে। এই কারণেই ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আদানপ্রদানের সময় ধর্মনিরপেক্ষতার সীমানা উদ্ভীর্ণ করে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এই প্রবন্ধটি যদিও কেবল ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনৈতিক শর্তগুলির সমালোচনাসমূহের মূল্যায়নে নিবিষ্ট, ধর্মনিরপেক্ষ সীমানা পেরিয়ে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলি উত্থাপিত হয় সেগুলিরও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা অবশ্যই উচিত। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ভূমিকার বিশ্লেষণে অবশ্যই এই ধারণার অন্তর্নিহিত 'অসম্পূর্ণতা' এবং এই অসম্পূর্ণতা থেকে উৎপন্ন সমস্যা ও সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত সুযোগ সম্ভাবনাগুলির বিষয়ে নজর দিতে হবে।

৩। বিভিন্ন পর্যালোচনা

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত অধিশ্বাস বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আমি বিশেষভাবে ছয়টি পৃথক যুক্তিবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনাটি একটি গবেষণা প্রবন্ধের পক্ষে সম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী সমস্ত আক্রমণেই যে এই প্রবন্ধের পরিধির আওতায় পড়ে যাবে আমি এমন দাবি করব না।

১। *'অস্তিত্বহীনতা' পর্যালোচনা*

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত সংশয়ের সম্ভবত সরলতম ভাষ্য যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের মতে এই বিষয়ে বেশি কিছু অন্তত প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করার মতো কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমী ভাষ্যকারদের ভাবনায় ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত অবয়বহীনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এবং তাঁদের ভাষায় 'হিন্দু ভারতের' (বা 'প্রধানত হিন্দু ভারতের') সঙ্গে 'মুসলিম পাকিস্তানের' (বা প্রধানত 'মুসলিম পাকিস্তানের') বৈপরীত্য প্রকাশের প্রবণতা রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই, পশ্চিমী ধ্যানধারণায় বৃহত্তর বৃত্তে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা কখনওই একনিষ্ঠ চিন্তাভাবনার উদ্রেক করেনি, এবং রাজনৈতিক জঙ্গি হিন্দুদের হাতে অযোধ্যায় একটি প্রাচীন মসজিদ ধ্বংস করার বর্তমান চিত্রগুলি এই ধ্যানধারণার পরিবর্তনে কোনও সহায়তা করেনি। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ভারতের স্বীকৃতি পশ্চিমে প্রায়শই কপট পবিত্রতার অর্থহীন প্রলাপ বলে পরিগণিত হয়, যাকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক আলোচনায় এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মুখ্য স্থানাধিকারী শক্তিশালী এবং দায়িত্বশীল পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সামান্যই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২। *'পক্ষপাতবাদ' পর্যালোচনা*

আক্রমণের দ্বিতীয় একটি ধারায় যুক্তি দেওয়া হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তরালে ভারতীয় সংবিধান এবং রাজনৈতিক ও আইনগত ঐতিহ্যপরম্পরা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে পক্ষপাত প্রদর্শন ক'রে একটি সুবিধাপ্রাপ্ত স্থান প্রদান করে, যা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগোষ্ঠী বঞ্চিত। হিন্দু সক্রিয়তাবাদী দলগুলির অনেক নেতা এবং সমর্থকদের মধ্যে এই পক্ষপাতবাদ মতধারাটি লোকপ্রিয়। এই সমালোচনার বাকচাতুর্য, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তা থেকে শুরু করে 'প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার' (মুসলিম পক্ষপাত খণ্ডন) সপক্ষে যুক্তি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রসারিত।

৩। *'পূর্ব পরিচয়' পর্যালোচনা*

সমালোচনার তৃতীয় ধারাটি প্রথম দুটির তুলনায় অধিকতর মননশীল। এই মতানুসারে 'ভারতীয়' পরিচয়ের তুলনায় 'হিন্দু' বা 'মুসলিম' বা 'শিখ' পরিচয় রাজনৈতিকভাবে পূর্বগণ্য। ভারতীয় পরিচয় পৃথক পৃথক পরিচয়ের **সংশ্লিষ্ট** উপাদানের সমন্বয়ে 'গঠিত' হয়েছে। এই যুক্তিবিন্যাসের একটি ধারায় দাবি করা হয়েছে যে ভারতবর্ষে হিন্দু প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয় পরিচয়ের যে কোনও প্রকার অবশ্যই কোনও না কোনও আকারে মূলত হিন্দু পরিচয়ের অপেক্ষক হিসাবে প্রতিফলিত হবে। অন্য একটি উপধারায় আরও এগিয়ে গিয়ে ভারতীয় জাতিত্বের প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসাবে একটি সমসত্ত্ব পরিচয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করা হয়েছে, (একটি স্যালাডের পাত্রে উপাদানগুলির সমন্বয় ঘটে না কিন্তু রান্নার পাত্রে ঘটে, এই চিত্রিত প্রতিতুলনা) এবং এই প্রস্তাব থেকে এগিয়ে এসে দাবি করা হয়েছে যে শুধু মাত্র একটি ভাগ করে নেওয়া সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি — যা কিনা ভারতবর্ষের কেবলমাত্র মূলত হিন্দু মতাদর্শে হতে পারে — এই ধরনের সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম। একই সঙ্গে এও দাবি করা হয়েছে যে হিন্দুধর্মের 'বন্ধনী শক্তি' থেকে ভারতীয় একতার সৃষ্টি হয়েছে।

৪। *'মুসলিম প্রাদেশিকতা' পর্যালোচনা*

সমালোচনার আরেকটি ধারায় 'ভারতীয়ত্বের' সংজ্ঞায় হিন্দু পরিচয়ের প্রস্তাবিত আধিপত্য সংখ্যার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা না করে, এটি 'হিন্দুদের উপর আরোপিত' বলে দাবি করা হয় এবং এর পিছনে মুসলিমদের নিজেদের প্রথমত ভারতীয় বলে স্বীকার না করার 'ব্যর্থতাকে' দেখা হয়। এই সমালোচনার ধারাটি, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের অন্যান্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ঐতিহ্যসিক ব্যর্থতা এবং মুসলিমদের পৃথক ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করার প্রবণতা থেকে প্রচুর উদাহরণ উপস্থাপিত করে। একই সঙ্গে এও দাবি করা হয়েছে যে মুসলিম শাসকরা সুযোগ মতো সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু মন্দির ও ধর্মীয় স্থানগুলি ধ্বংস করেছিল।

স্বাধীনতার পূর্বে রচিত জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকে (ভারতীয় উপমহাদেশ বিভাগে যা ছিল ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ) মুসলিমদের পক্ষ থেকে অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে শনাক্তকরণের সুস্পষ্ট অনীহার ধারাবাহিকতা হিসাবে গণ্য করা হয়। এই সঙ্গে এও দাবি করা হয় যে, দেশবিভাগ এই উপমহাদেশে মুসলিমদের একটি 'বাসভূমির' অভাব পূরণ করেছিল এবং ভারতবর্ষে রয়ে যাওয়া মুসলিম জনগোষ্ঠী বিভেদবুদ্ধিসম্পন্ন এবং মূলগতভাবে ভারতবর্ষের প্রতি 'আনুগত্য প্রদর্শন' করে না। এই সমালোচনার ধারাটির 'প্রামাণ্য' অংশটি এই ভাবে সমকালীন ভারতবর্ষে এবং ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষ পাঠে প্রাপ্ত মুসলিম আনুগত্যহীনতার সংশয়ের অনুপ্রবেশ ঘটায়।

৫। 'আধুনিকতা বিরোধী' পর্যালোচনা

মূলত পশ্চিমে এবং (কিছুটা প্রসঙ্গক্রমে) ভারতবর্ষেও সমকালীন মনস্বিতার গতিপ্রকৃতিতে 'আধুনিকতা' নামক বিষয়টিকে আক্রমণের যথেষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সমালোচনার পঞ্চম ধারাটিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আধুনিকতার একটি মূঢ়তাপূর্ণ অংশ হিসাবে প্রত্যাঘাত করে মূল আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিকোত্তর (Post-modernist) সমালোচনার মধ্যে, বর্তমানে, 'আধুনিকতার রূপ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা' এই মতের বিরুদ্ধে সক্রিয়তর আঘাত গঠিত হয়েছে মামুলি আধুনিকতা বিরোধিতার সঙ্গে ভারতের অতীতের প্রতি সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যাকুলতার সংযুক্তির মধ্য দিয়ে, বিশেষত ঘটনাগুলি এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কম সমস্যাসঙ্কুল হওয়ার কথা (বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে)। সমকালীন সমাজবিদগণের মনস্বী আলোচনার কেন্দ্রীয় অংশ এই প্রকার প্রতীতির প্রভাবে নির্মিত।

আশীষ নন্দী লক্ষ করেছেন 'ভারতবর্ষের আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় হিংসা বৃদ্ধি পাচ্ছে' এবং একই সঙ্গে তিনি প্রশংসা করেছেন 'প্রচলিত জীবনরীতি(র), শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, (যা) অভ্যন্তরীণ সহনশীলতার নীতির উন্মেষ ঘটিয়েছে'। এই সমালোচনার ধারাটিতে যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অভিযুক্ত করা হয় তা আশীষ নন্দীর তীব্র উপসংহারে প্রতিফলিত হয়েছে: 'ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ মেনে নেওয়া মানেই, কর্তৃত্বের নতুন যুক্তি হিসাবে উন্নয়ন এবং আধুনিকতার মতবাদ মেনে নেওয়া এবং একই সঙ্গে এইসব মতবাদগুলিকে জনগণের নতুন আফিম হিসাবে অধিকার ও বজায় রাখার জন্য হিংসার ব্যবহার মেনে নেওয়া।'

৬। 'সাংস্কৃতিক' পর্যালোচনা

ষষ্ঠ এবং শেষ সমালোচনাটি, যেটি আমি বিবেচনা করব, সেটি, যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে, একটি 'ভিত্তিমূলক' দৃষ্টিভঙ্গি নেয়, যে ভারতবর্ষ মূলত একটি হিন্দু দেশ এবং ফলশ্রুতি হিসাবে হিন্দুধর্মকে সাংস্কৃতিকভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ধর্মহিসাবে গণ্য করা খুব ভুল হবে। এই মতানুসারে হিন্দু ধর্মই ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্তা নির্মাণ করেছে, এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সমদর্শী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দাবি একটি জ্ঞানবাদী (epistemic) ত্রুটিকে অবশ্যই একটি রাজনৈতিক প্রমাদে পরিবর্তিত করে দেয়।

এই সমালোচনার ধারাটি পূর্বতন খ্রিস্টান দেশগুলি, যেমন ব্রিটেনের, সঙ্গে প্রায়শই সমরূপতা প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে দেশের বিশিষ্ট ইতিহাস এবং তার 'নিজস্ব ধর্মের' স্বকীয় ভূমিকা 'সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত'। উদাহরণস্বরূপ, ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন (ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও জাঁকজমকপূর্ণ ভণিতা সেখানে থাকে না)। একই ভাবে অবমাননা সংক্রান্ত ব্রিটিশ আইনগুলি বিশেষভাবে খ্রিস্ট ধর্মকে সুরক্ষা দেয় অন্য কোনও ধর্মকে দেয় না (ঠিক যেমন পাকিস্তানে ঈশ্বরনিন্দা আইনের আওতায় কেবলমাত্র ইসলামের প্রতি 'অবমাননা' শাস্তিযোগ্য)। ভারতবর্ষের সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে যে সে 'নিজস্ব' ঐতিহ্যকে, মুখ্যত হিন্দু উত্তরাধিকার, সমতুল্য কোনও সুবিধাপ্রাপ্ত স্থান না দেওয়ায় তার দেশজ সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করেছে।

আমি এই আধ ডজন পর্যালোচনাগুলি একটির পর একটি বিবেচনা করব। আগেই বলা হয়েছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জনের সপক্ষে অন্যান্য যুক্তিও রয়েছে। এইসব পর্যালোচনার কয়েকটি বিস্তৃত ধ্যানধারণার একত্রীকরণ এবং ভাষার প্রশংসনীয় দুরধিগম্যতার সমন্বয়ে গঠিত এবং তা ভেদ করা শ্বাসরুদ্ধকারীভাবে সহজ নয় (এমনকী এক হাতে নতুন অর্থচয়নের (neologism) ডিকশনারি এবং অন্য হাতে দুর্জয় সাহস নিয়েও)। আমি ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত সবকটি যুক্তিধারা নিয়ে আলোচনা করার ভণিতা না করে কেবল পূর্বে চিহ্নিত ছয়টি পর্যালোচনার ধারার মধ্যে নিবদ্ধ থাকব।

৪। 'অস্তিত্বহীনতা'র পর্যালোচনা প্রসঙ্গে

'অস্তিত্বহীনতা'র পর্যালোচনাটি কি গুরুত্ব সহকারে বিচার করা উচিত? বিভিন্ন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এই মতামতটিকে কিছুটা বিরূপতার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং এটিকে পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গির অনমনীয়তা (বা আরও খারাপ কিছু) হিসাবে গণ্য করে কোনও রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে অনীহা জানান। এই মতটিকে কখনও কখনও, ভারত সম্পর্কে 'অন্যরা' কি ভাবছে তাতে কিছু আসে যায় না, (এটি প্রধানত ভারতীয় রাষ্ট্রাবাসের চিন্তার বিষয়) এই সার্বিক তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। এই ধরনের চর্চিত নিষ্ক্রিয়তা কেবল যে রুদ্ধকৃত তা নয়, (সমকালীন বিশ্বে আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনার গুরুত্ব অস্বীকার করে) একই সঙ্গে তা ভারতীয়দের নিজস্ব পরিচয় নির্ধারণে আন্তর্জাতিক ধ্যানধারণার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এমনকী একটি একীকৃত ধর্ম হিসাবে হিন্দুত্বের সম্মিলিত ধারণা, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের এবং আচরণের শ্রেণীবদ্ধ একতা বিষয়ে বিদেশি মতের প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করে।

এখন চলতি ঘটনা হিসাবে এও দেখা যায় যে, 'দেশে' সংঘটিত—শিখ, মুসলিম এবং হিন্দু—সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে উপমহাদেশ থেকে চলে যাওয়া বিত্তশালী প্রবাসী জনগণ এগিয়ে আসছেন। এবং তাদের পাঠ্যবিষয়

ও তার প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের গুরুত্বের জন্য—এমনকী ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির তাৎক্ষণিক বিষয়গুলি নিয়েও—আমরা ভারত সংক্রান্ত এইসব বিদেশি প্রতিবেদনগুলিকে 'তাৎপর্যহীন' বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

(যেসব পাঠক এই বিষয়গুলি অবগত আছেন তাঁরা এই আলোচনা চলাকালীন পাঠ বন্ধ করে দিতে পারেন,) তা সত্ত্বেও অস্তিত্বহীনতার পর্যালোচনাকে অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতবর্ষ কি প্রকৃতই পাকিস্তানের হিন্দু প্রতিরূপ? যখন ব্রিটিশাধীন ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল, পাকিস্তান চেয়েছিল একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র, যেখানে ভারত চেয়েছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান। এই পার্থক্যের কি কোনও তাৎপর্য আছে? এটি সত্যি যে সাধারণভাবে পরিচিত পশ্চিমী ভাষ্যে এই তুলনাকে সামান্যই গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে যাঁরা, এই দেশ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করুক এরকম চাইছেন, তাঁরা পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গির এই 'বাধ্যতামূলক সমতা'র নীতির দৃষ্টান্তকে পর্যাপ্ত প্রমাণ ধরে নিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ প্রচেষ্টার মধ্যে বেশ কিছুটা অযোগ্যতা রয়ে গেছে, কেননা যখন বিশ্বরাজনীতির নতুন প্রভুরা, এমনকী, ব্যাখ্যাও করতে পারেন না ভারতে ঠিক কী প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

তবুও একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র এবং একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের পার্থক্যটি আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর রাজনৈতিক তাৎপর্যও যথেষ্ট বিস্তৃত। সমাজবিন্যাসের বিভিন্ন স্তরে, বিচারালয়ের কার্যপদ্ধতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্রিয়াকর্ম পর্যন্ত, এর প্রয়োগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানে যেমন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধানকে মুসলিম হতে হবে, ভারতে এর তুলনামূলক কোনও শর্ত আরোপিত হয় না। একই সঙ্গে, এই দেশে রাষ্ট্রপতি পদে এবং অন্যান্য মুখ্য ও প্রভাবশালী সরকারি ও বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন পদে (সুপ্রিম কোর্টসহ) অ-হিন্দু ব্যক্তিদের (মুসলিম ও শিখসহ) দেখা পাওয়া গেছে।

একই ভাবে, আরেকটি উদাহরণে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের দৌলতে, একটি মাত্র ধর্মকে উদ্দেশ্য করে, অবমাননার পক্ষপাতিত্বমূলক আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়, যেমনটি পাকিস্তানে সম্ভব। পাকিস্তানে ইসলাম ধর্ম আইনের বলে যে পদাধিকার পায়, (যে কোনও ইসলামী প্রজাতন্ত্রে যা গ্রাহ্য) এবং ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের সমতুল্য আইনি পদাধিকার না থাকার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে 'অস্তিত্বহীনতার' পর্যালোচনা দেশের চেয়ে বিদেশেই বেশি ধ্বনিত হয়েছে, এবং প্রায়শই তা উপমহাদেশের উপর পশ্চিমী বিশ্লেষণের রঙে রঞ্জিত কোনও প্রত্যক্ষ প্রস্তাব না হয়ে একটি অপ্রত্যক্ষ অনুমানের আকার নেয়। এই ধরনের অনমনীয় বিশ্বাস ভারতীয় সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে নেয়।

এখানে দুটি শর্ত আরোপের প্রয়োজন আছে। প্রথমত 'অস্তিত্বহীনতার' পর্যালোচনাকে অন্য একটি দাবি—যা প্রায়শ (অধিকাংশ কট্টর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে) দেখা যায়—আইনগত সমদর্শিতার উপাদান থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদের চেয়ে হিন্দুরা পর্যাপ্ত সুবিধা ভোগ করে এই মতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। এই মতটি, স্পষ্টত, ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার 'পূর্ণতর' প্রয়োগের সপক্ষে যুক্তি স্থাপনা করে, আগে থেকেই রয়ে যাওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাকে 'প্রত্যাখ্যান' করে না। দ্বিতীয়ত 'অস্তিত্বহীনতার' পর্যালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করা মানে ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক রূপটিকে চিহ্নিত করা নয় (এবং নিশ্চয়ই সেই রূপটির 'শ্রেয়ত্ব' দাবি করাও নয়)। প্রকৃতপক্ষেই, যেমনটি আগে দাবি করা হয়েছে যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে নিলেও বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধিত বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে। যদিও রাজনৈতিক এবং আইনগত প্রয়োগে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি সমদর্শিতার নীতি মেনে নেওয়া হয় তা সত্ত্বেও আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এই সমদর্শিতার নীতি ঠিক কী আকৃতির হবে এবং তার ঠিক কী পরিমাণ সীমানা এবং প্রসার হওয়া উচিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর্ম অবমাননা সংক্রান্ত আইনগত সমদর্শিতা বিভিন্ন সূত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়—সকল ধর্মের জন্যই এর প্রয়োগ চলতে পারে, আবার কোনও ধর্মের ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ না করা হতে পারে। পরবর্তী মতটি সরাসরি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ প্রত্যাখ্যানের নীতির সঙ্গে মিলে যায়, পূর্ববর্তী মতটি বিশেষ করে কোনও একটি ধর্মকে পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে ধর্মমতগুলির প্রতি সমদর্শিতা প্রদর্শন করে। ঠিক যেমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ধর্মমত নির্বিশেষ সমস্ত নাগরিকের স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পূজা করা (বা না করার) স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে (এবং এটি, যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘন করে না)। নীতিগতভাবে, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে তাদের মতে যা কিছু গুরুতর ধর্মীয় অবমাননার বিষয় বলে মনে হয়, সেগুলি থেকে রক্ষা করার নীতি গ্রহণ করতে পারে। আমি অবশ্য এই ধরনের সর্বজনীন ধর্ম অবমাননা বিরোধী প্রস্তাবের পক্ষে নই—প্রকৃতপক্ষে আমি সাধারণভাবে ধর্মীয় অবমাননাবিরোধী আইনের বিপক্ষে জোরালো যুক্তির অবতারণা করব। ধর্মীয় অবমাননাবিরোধী সর্বজনীন আইনগুলি প্রত্যাখ্যানের কারণ এই নয় যে সেগুলি ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী, বরং এর ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতার পরিধির বাইরে অবস্থিত, বিশেষত, ধর্মীয়

অসহিষ্ণুতা ও মিথ্যা দোষারোপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এবং ভারতের সমস্ত ধর্ম একত্রে নিয়ে (বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী যারা ভারতের সংখ্যালঘু এবং সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদের ধর্ম সমেত) ধর্মীয় অবমাননাবিরোধী আইন প্রণয়ন বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভবপর না হওয়া উল্লেখযোগ্য। ধর্মনিরপেক্ষতার বিভিন্ন রূপের মধ্য থেকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন থেকেই যায়, কিন্তু ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয় শর্ত যে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন ও অবান্তর এই বিতর্ক থেকে বিষয়টি অনেক পৃথক।

৫। 'পক্ষপাতবাদ' পর্যালোচনা প্রসঙ্গে

এই পর্যালোচনাটিতে বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু আইনি পার্থক্যের ব্যাখ্যা ও তার উপর আলোকপাত করা হয়। হিন্দু সক্রিয়তাবাদী রাজনৈতিক সাহিত্যে বর্তমানে এগুলি পর্যাপ্ত আলোচিত। বিশেষত 'ব্যক্তিগত আইনের' পার্থক্যের উপর মুখ্য আলোকপাত করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, একজন হিন্দু ব্যক্তি বহুবিবাহের জন্য শাস্তি পেতে পারে, সেক্ষেত্রে একজন মুসলিম ব্যক্তির একই সঙ্গে চারজন অবধি স্ত্রী থাকতে পারে যেটা কিনা মুসলিম আইনে স্বীকৃত (যদিও, কার্যত ভারতীয় মুসলিমদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ খুবই বিরল)। অন্যান্য পার্থক্যের ওপরও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, যেমন, বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিস্থিতিতে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব কার হবে। এই বিষয়ে (মুসলিম আইনের একটি ভাষ্য অনুসারে) অন্যান্য ভারতীয় নারীর চেয়ে মুসলিম নারীর নিশ্চয়তা অনেক কম। এই বিষয়টি বিখ্যাত 'শাহবানু মামলা'র (একজন বিবাহবিচ্ছিন্ন মুসলিম নারীর তার বিরূপ ও ধনী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার নিয়ে) উপর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। এই ধরনের পার্থক্যের অস্তিত্ব, বারবার হিন্দু রাজনীতির সক্রিয় কর্মীদের তরফ থেকে ওঠা দাবি যে ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব 'ব্যক্তিগত আইন' ও 'বিশেষ সুবিধার' অধিকার ভোগ করে, এর সপক্ষে উদাহরণ হিসাবে স্থাপিত হয়।

এই যুক্তিধারার অনেকগুলি ত্রুটি আছে। প্রথমত, যদিও বা এই উদাহরণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণে বিশেষ সুবিধাদানের প্রয়োগ কোনওরকম 'পক্ষপাতে'র প্রতি নির্দেশ করে, সেটি সাধারণভাবে মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাতের দৃষ্টান্তরূপে স্থাপন করা যায় না। এখানে যদি কোনওরকম পক্ষপাতিত্ব থেকে থাকে তা অবশ্যই **মুসলিম রমণীদের বিপক্ষে যাবে, হিন্দু পুরুষদের** বিপক্ষে নয়। এই ধরনের রাজনৈতিক অভিযোগ দৃশ্যতই একটি সঙ্কীর্ণ পুরুষপ্রধান যৌন পক্ষপাতের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে অভিন্ন নাগরিক আইনের মাধ্যমে হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইনগুলিকে কিছুটা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে এই মতটিও সঠিক নয়। হিন্দু ব্যক্তিগত আইনের পৃথক স্থান **সাধারণভাবে** রক্ষিত হয়েছে। অভিন্ন নাগরিক আইনের বিষয়টিকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, বিশেষকরে ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে হিন্দু আইনের যে সংস্কার করা হয়েছে (প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের **অভ্যন্তরে** ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি) তার থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। হিন্দু আইনগুলির সংস্কারে বহুবিবাহের সম্ভাবনা সুস্পষ্টভাবে বাতিল করা হয়েছে। অভিন্ন নাগরিক আইন যে কেবল হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে, মুসলিমদের ক্ষেত্রে হয়নি তার থেকে এই বিষয়টি আসেনি। বিপরীতক্রমে এর মাধ্যমে হিন্দু ব্যক্তিগত আইনগুলিকে যে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে তাও ঠিক নয়। হিন্দু আইনের মধ্যে আরও অনেক ধারা যুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু হিন্দু ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রসীমা এখনও যথেষ্ট বিস্তৃত রয়ে গেছে।

ভারতীয় সংবিধানের স্রষ্টারা 'মূল নাগরিক এবং অপরাধী আইনের অভিন্নতার' প্রতি পছন্দ ব্যক্ত করেছিলেন যেটিকে ডক্টর আম্বেদকার (ভারতীয় সংবিধান সৃষ্টিকারী দলটির প্রধান) দেশের একতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন। শেষ অবধি যদিও, এই ধরনের অভিন্নতা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, অভিন্নতার প্রতি প্রবণতা, বলবৎকরণের অধিকার ছাড়াই, কেবলমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম নির্ধারক নীতি হিসাবে স্থান পেয়েছে। গৃহীত এই নীতিতে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি অভিন্ন নাগরিক আইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেবে'। ভারতীয় সংবিধানের অন্যান্য নির্দেশক নীতির মতো এটিকেও 'দেশের প্রশাসনের মূলগত ভিত্তি' হিসাবে দেখা হয়, এবং এও বলা হয়েছে যে এই নীতি 'প্রয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে', কিন্তু একই সঙ্গে এই নীতি (অন্যান্য নির্দেশক নীতির মতো) 'কোনও বিচারালয়ে বলবৎ করা যাবে না।'

এই নির্দেশক নীতিগুলির সমর্থনে কতদূর এগনো যাবে সেটা অবশ্য বিচারলয়ের অধীনস্থ বিষয়। বহু আলোচিত 'শাহবানু মামলার রায়ে', যেখানে বিবাহবিচ্ছেদের পর একজন মুসলিম রমণীর অধিকতর আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অধিকার জড়িত ছিল সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য এই অভিন্নতার দিকে পদক্ষেপ নিয়েছিল। 'সংবিধানের আদর্শ' অনুসারে একটি অভিন্ন নাগরিক আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নিয়ে বিচারালয় তার হতাশা ও ব্যক্ত করেছিল (এবং লক্ষ করেছিল যে এই সাংবিধানিক প্রস্তাবটি 'কার্যকারিতা হারিয়েছে')। এ সম্পর্কে 'মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া' যদিও কোনওভাবেই অভিন্ন ছিল না, এবং এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ থেকে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের

সপক্ষে সমর্থন এবং বিরোধী সমালোচনা উভয়ই ব্যক্ত করা হয়। শেষ অবধি রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকার নতি স্বীকার করে নতুন আইন পাশ করে যাতে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' মতকেই সমর্থন করা হয়, সুপ্রিম কোর্টের আরও অভিন্নতা প্রবর্তনের চেষ্টাকে মানা হয়নি।

পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহারের সাধারণ বিষয়টি প্রকৃতপক্ষেই জরুরি, এবং সেখানে সুনিশ্চিতভাবে, সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযুক্ত এক গুচ্ছ অভিন্ন নাগরিক আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী কোনও প্রস্তাব নেই। অপর পক্ষে, যেমনটি এই প্রবন্ধে আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি, বিভিন্ন ব্যক্তিগত আইন যাতে ভবিষ্যতেও বজায় থাকে এমন একটি ব্যবস্থার অনুমোদনও করতে পারে (যতক্ষণ অবধি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শী মনোভাব বজায় রাখা হয়)। পরবর্তী মতটির বিপক্ষ যুক্তিতে ন্যায় বিচারের প্রশ্ন তোলা যায়, যা বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি মনোভাবে এবং একই সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীগত পার্থক্য নির্ণয়ে (যেমন, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, 'উচ্চবর্গ' ও 'নিম্নবর্গের' মধ্যে ইত্যাদি) নিরপেক্ষতার প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণে সমদর্শিতার দাবি রাখে।

এই দুটি বিকল্পের এবং মধ্যবর্তী অন্যান্য বিকল্পের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়ার বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে এবং কোনও একটি দিকে এর সমাধানসূত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়াও অন্যান্য শর্তের উপর নির্ভর করে। এটি লক্ষ করা মানে অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যর্থতা মেনে নেওয়া নয়, বরং এর সীমাবদ্ধ পরিধির স্বীকৃতি দেওয়া এবং একই সঙ্গে—সমদর্শিতা ও ন্যায়বিচারের অন্যান্য নীতি ব্যবহার করে—ধর্মনিরপেক্ষতার সীমানা অতিক্রম করে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার অভিপ্রায় জানানো যাতে সুনির্দিষ্ট আইনি ও সামাজিক রূপ চিহ্নিত করা যায়। যেহেতু মুসলিমদের সুবিধাপ্রদান সংক্রান্ত 'পক্ষপাতবাদ' অভিযোগের যথেষ্ট ভিত্তি নেই এবং এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কোনও সাধারণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আলোচনায় এর নিজস্ব পরিধি অতিক্রম করে অন্যান্য নীতি—যেমন ন্যায় সংক্রান্ত নীতি—সংযুক্ত করা জরুরি। আমাদের বিশেষ করে, (১) বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সমদর্শিতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা (ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন) এবং (২) এই সমদর্শিতার নীতি ঠিক কী আকার নেবে এই প্রশ্নের (এই ভাবনাটি ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে অতিক্রম করে ন্যায়ের অন্যান্য নীতির সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োজন যা আমাদের, একদিকে, ধর্মসম্প্রদায়গুলির দলগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার দিকে, এবং অপরপক্ষে, ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতে (সামাজিক শ্রেণী, লিঙ্গ ইত্যাদি) পৃথকীকৃত ভারতীয়দের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমতার অপরিহার্য প্রসঙ্গের দিকে চালিত করে) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা উচিত।

৬। 'পূর্ব পরিচয় পর্যালোচনা' প্রসঙ্গে

রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিচয়ের প্রশ্নটি একটি ভিন্নতর বিষয় উত্থাপন করে। এ বিষয়ে সামান্যই সন্দেহ আছে যে অধিকাংশ ভারতীয় কোনও না কোনও প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুগামী এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এই বিশ্বাসগুলি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, এই পরিচয়ের অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি যে বিষয়টি উত্থাপন করেছে সেটি **ব্যক্তিগত** অথবা **সামাজিক** আচার আচরণের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের সাধারণ গুরুত্ব সংক্রান্ত নয়, বরং **রাজনৈতিক** বিষয়ে ওই পরিচয়ের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য সংক্রান্ত (রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সমেত বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়ের সম্পর্কে তাদের মতামতগুলির স্মৃতিচারণ করা উপযোগী হবে। 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' প্রবক্তা এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের জনক জিন্না খুব সামান্যই গোঁড়া মুসলিম ছিলেন। অপরপক্ষে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি এবং ভারতীয় ইউনিয়নের একজন প্রধান নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন একজন প্রগাঢ় ধার্মিক মুসলিম ব্যক্তি। একইভাবে, হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু আচারঅনুষ্ঠান কমই পালন করতেন। তুলনামূলকভাবে, মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক আচরণে সক্রিয়ভাবে ধর্ম মেনে চলতেন (উদাহরণস্বরূপ, তিনি প্রাত্যহিক প্রার্থনাসভার আয়োজন করতেন যা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল) এবং একই সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন (বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সমদর্শী রাজনৈতিক আচরণ প্রদর্শন এবং রাষ্ট্র ও ধর্মগুলির মধ্যে স্পষ্ট পৃথকীকরণের উপর জোর দেওয়া)। যখন একজন চরমপন্থী হিন্দু রাজনৈতিক কর্মীর হাতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হয় তখন ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক আচরণে হিন্দু ধর্ম না মানার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠেনি, কিন্তু তিনি যে রাজনৈতিক বিষয়ে মুসলিমদের প্রতি নরম মনোভাব নিতেন এবং হিন্দু স্বার্থকে এ বিষয়ে অগ্রাধিকার দেননি এই দোষারোপ করা হয়েছিল।

ধর্মীয় পরিচয়ের গুরুত্বকে ওই পরিচয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য থেকে পৃথক করে দেখা উচিত। ঠিক এই জন্যই একজন ভারতীয়ের পক্ষে ভারতীয়ত্ব দাবি করার **পূর্বে** তাকে প্রথমে ধর্মীয় পরিচয়ের 'শর্তপূরণ' করতে হবে এটা দৃষ্টিকটু এবং ভারতীয় পরিচয় যে বিভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়ের সম্মিলিত ভিত্তির উপর **অবশ্যই** নির্ভর করে সৃষ্টি হয়েছে এই দাবিটি আরও

কম যুক্তিযুক্ত। এই ধরনের অগ্রাধিকারের দাবি কেবলমাত্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর (বিশেষত, বর্তমানে, হিন্দু-জাতীয়তাবাদী) তরফ থেকেই ওঠেনি, যাঁরা রাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত ভূমিকা (সম্প্রদায়ের ভূমিকার পরিবর্তে) এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন, তাদের পক্ষ থেকেও উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় পরিচয়ের বিষয়টি প্রায়শ ভুলবশত, আমার বিশ্বাস, একটি 'জাতীয় রাষ্ট্রের' (nation state) ধারণার সঙ্গে একাত্ম করা হয় এবং এর ফলে, ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সামাজিক শ্রেণী বরাবর যে কোনও রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণাকে অবধারিতভাবে একটি 'রাষ্ট্রীয়' দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এটা নিশ্চিতভাবে সত্য যে একতার উদ্ভব এবং দৃঢ়বদ্ধকরণে জাতীয় রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পদ্ধতিগতভাবে কার্যকরী ভূমিকা থাকতে পারে, কিন্তু একতার ধ্যানধারণাগত ভিত্তির কেন্দ্রীয় স্থানে রাষ্ট্রের অবস্থিতি প্রয়োজনীয় নয় এমনকী তার উৎপত্তির সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেও নয়। উদাহরণস্বরূপ, এটা ভাবলে কোনও মূলগত ত্রুটি হবে না যে, ১৯৪৭-এর পূর্বে ভারতীয় জাতি বলতে তথাকথিত 'দেশীয় রাজ্যগুলির' (যেমন ত্রিবাঙ্কুর) এবং ব্রিটিশ ছাড়া অন্যান্য উপনিবেশগুলির (যেমন গোয়া) সম্মিলিত অধিবাসীদের কথা বোঝাত। এটা ভাবলে ভুল হবে যে একটি জাতির ধারণা সৃষ্টিতে পূর্বশর্ত হিসাবে একটি জাতীয় রাষ্ট্রের উপস্থিতি প্রয়োজন।

এই ধরনের যুক্তিবিন্যাসের দ্বিতীয় সমস্যাটি হল ভারতবর্ষের প্রস্তাবিত হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হওয়ার পথটির ব্যবহার সংক্রান্ত। ধর্মীয় পরিচয়কে যদিও বা ভারতীয়ত্বের নির্মাণে রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে কিছুটা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, কেবলমাত্র এই যুক্তির ভিত্তিতে একজনের পক্ষে হিন্দু ভারতের ভাষ্যে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব হবে। এদেশে অ-হিন্দু সম্প্রদায় সমূহকে—বিশেষ করে মুসলিম এবং তার সঙ্গে খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, পারসি ও অন্যেরা—এমনকী সংখ্যার বিচারেও নগণ্য বলে ধরে নেওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে দশ কোটিরও বেশি মুসলিম রয়েছে—যে সংখ্যা পাকিস্তানের চেয়ে খুব কম নয়, এবং বাংলাদেশের চেয়ে যথেষ্ট বেশি। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম নাগরিকের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ভারতবর্ষকে শুধু মাত্র হিন্দু দেশ হিসাবে দেখা খুবই অদ্ভুত ধারণা, এই তথ্যের ভিত্তিতে তো বটেই, ভারতীয় সমাজ এবং সাংস্কৃতিক জীবনে (সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে) হিন্দু ও মুসলিম সংমিশ্রণের পরিপ্রেক্ষিতেও। একই সঙ্গে ভারতীয় ধর্মীয় বহুত্ব, হিন্দু-মুসলিম ভাগাভাগির সীমানা পেরিয়ে বহুদূর অবধি বিস্তৃত। এদেশে একটি বৃহৎ ও প্রকাশ্য শিখ জনগোষ্ঠী আছে, একই সঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক খ্রিস্টান রয়েছে যারা অন্তত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে ভারতবর্ষে বসবাস করছে (ব্রিটেনে কোনও খ্রিস্টান আসার অনেক আগে)। ভারতবর্ষে জেরুজালেমের পতনের পরে পরেই ইহুদিদের বসবাস শুরু হয়েছিল। বহু শতাব্দী পূর্বে, অপেক্ষাকৃত কম সহনশীল ইরান থেকে পারসিরা ভারতবর্ষে চলে আসে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে লক্ষ লক্ষ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মানুষকে, যে ধর্মগুলি, দীর্ঘদিন ধরে, অনেক ভারতীয় সম্রাটের রাজত্বকালে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহামতি অশোক এর অন্যতম, যাঁর সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বৃহত্তম সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল)।

তা ছাড়া, বৃহৎ সংখ্যায় ভারতীয় রয়েছেন যাঁরা নাস্তিক অথবা সংশয়বাদী (agnostic) (যেমন ছিলেন জওহরলাল নেহরু নিজে), এবং ভারতবর্ষে এই ঐতিহ্য অতি প্রাচীন (বিভিন্ন সংশয়বাদী চিন্তাধারার মধ্যে চার্বাক এবং লোকায়ত দর্শন উল্লেখযোগ্য)। ভারতীয় সমাজ পরিসংখ্যানের শ্রেণীবিন্যাসের রীতি, বিশ্বাসের এই অসমসত্ত্বতার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, কেননা যেসব শ্রেণী ব্যবহার করা হয় ভারতবর্ষে তা 'সম্প্রদায়' বলে পরিচিত হয় প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের হিসাব রাখা হয় না (দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিন্দু পরিবারে জন্মানো একজন নাস্তিক ব্যক্তিকে হিন্দু হিসাবেই শ্রেণীভুক্ত করা হয়, যা তথাকথিত 'সম্প্রদায় ভিত্তিক পটভূমিকেই' প্রতিফলিত করে)।

ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা ভারতীয় জনগণের বিস্তারিত ধর্মীয় বহুত্ববাদের উপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন, এবং ভারতীয়ত্বের ধারণা কোনও একটি বিশেষ ধর্মীয় পরিচয় থেকে নির্দীত হোক তা চাননি। ভারতীয় সংবিধান পরিষদের প্রধান হিসাবে ডক্টর আম্বেদকার যেভাবে এটি বলেছেন, 'যদি ভারতীয় মুসলিমরা একটি পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ একটি জাতি নয়'। ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে, একটি মূলগত সমদর্শিতার নীতি সুনিশ্চিত করা এবং কার্যকরীভাবে রাষ্ট্রকে প্রতিটি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া অন্য কোনও বাস্তব রাজনৈতিক বিকল্পের অস্তিত্ব নেই।

হিন্দু পরিচয়ের মাধ্যম দিয়ে ভারতীয় পরিচয় নির্মানের পরিকল্পনা দুটি ভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমত, এটি (১) ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংলগ্নতা এবং (২) সেই সংলগ্নতাকে রাজনৈতিক অগ্রাধিকার প্রদান (বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সমদর্শী ব্যবহার ব্যতিরেকে) এই দুটি বিষয়ের অপর্যাপ্ত পৃথকীকরণের ত্রুটিতে আক্রান্ত। দ্বিতীয়ত এটি ভারতের প্রভূত ধর্মীয় বৈচিত্র্যের তাৎপর্য স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়।

প্রকৃতপক্ষে, ধর্মীয় বৈচিত্র্যের প্রশ্নটি শুধু মাত্র হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মের (অথবা ধর্মহীন) অনুগামীদের মধ্যস্থিত সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত তা নয়। এটি হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিভিন্নতার

সঙ্গেও জড়িত। এই শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই জাতপাতের বিচারকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এবং সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতির চরিত্রে বিভিন্ন স্তরে এটি অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের বিভিন্নতার বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র জাতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাস, স্বতন্ত্র দেশাচার এবং ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন মতবাদও অন্তর্ভুক্ত।

এমনকী প্রাচীন ভারতে গৃহীত 'ষড়দর্শনের' শ্রেণী বিভাগ এই বিশ্বাস ও যুক্তিবিন্যাসের সুগভীর পার্থক্যের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তুলনামূলকভাবে বর্তমানে চতুর্দশ শতকের ক্ষেত্রজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিত মাধব আচার্য (মহীশূরে শৃঙ্গেরী ধর্মীয় শাখার প্রধান) যখন তাঁর বিখ্যাত সংস্কৃত নিবন্ধ **সর্বদর্শন সংগ্রহ** (সকল দর্শনের সঙ্কলন) লিখেছিলেন, তিনি ষোলোটি অধ্যায়ে সমসংখ্যক হিন্দু ধর্মভাবনার বিভিন্ন ধারার উপস্থাপনা করেছিলেন (যেখানে তিনি চার্বাক মতবাদের নাস্তিকতা দিয়ে প্রথম অধ্যায় শুরু করেছিলেন)। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কীভাবে প্রতিটি ধর্মীয় মতবাদ অন্যদের থেকে পৃথক, তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের সপক্ষে তাদের নিজস্ব যুক্তিগুলি কী কী এবং তাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের প্রতিবাদী যুক্তি উঠতে পারে সেগুলি পরীক্ষা করেছেন (যদিও তিনি, শেষ অবধি, তাঁর নিজস্ব বিষ্ণুবাদী বিশ্বাসের সমর্থন থেকে শেষ অধ্যায়ে সরে আসেননি)।

বাস্তবিকই, হিন্দুত্বকে একটি একীকৃত ধর্ম হিসাবে ব্যাখ্যা করা তুলনামূলকভাবে আধুনিক ঘটনা। 'হিন্দু' শব্দটি কোনও সমসত্ত্ব বিশ্বাসকে নির্দেশ করে, প্রথাগতভাবে মূলত একটি স্থান এবং দেশের প্রতীক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্ডাস বা 'সিন্ধু' নদের (সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার লালনভূমি, যেটি খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সাল নাগাদ বিকশিত হয়েছিল) থেকে শব্দটির উৎপত্তি, এবং ওই নদের নাম 'ইন্ডিয়া' নামেরও উৎস। পারসিক (Persian) এবং গ্রিকদের কাছে ভারতবর্ষ (India) বলতে ইন্ডাস (সিন্ধু) নদের চারপাশে ও নদ পেরিয়ে যে অঞ্চল তাকেই বোঝাত এবং হিন্দুরা ছিল সেই অঞ্চলের অধিবাসী। এক সময় ফারসি (Persian) এবং এমনকী আরবিতেও ভারতবর্ষের মুসলিমদের 'হিন্দাভি' (Hindavi) মুসলিম বলা হত। এ ছাড়াও প্রথম দিকের ব্রিটিশ নথিপত্রে 'হিন্দু মুসলিম' এবং 'হিন্দু খ্রিস্টানদের' প্রচুর উল্লেখ আছে, যাতে তাদের যথাক্রমে ভারতবর্ষের বাইরের মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের থেকে পৃথক করা যায়।

ধর্ম বিশ্বাসের এবং ঐতিহ্যের একটি বিস্তৃত বহুত্ব ধর্ম হিসাবে হিন্দুত্বের স্বরূপ নির্ণয় করে। এই বিষয়টি রামের (আধুনিক হিন্দিতে, রাম) মনোভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, যাঁর নামে বর্তমানে প্রচুর হিন্দু সক্রিয়বাদী রাজনীতি জাগৃত হয়েছে (যার মধ্যে অযোধ্যায়, 'রামের জন্মস্থানে' বাবরি মসজিদ ধ্বংসও অন্তর্ভুক্ত)। রামের সঙ্গে দেবত্বের সমরূপতা উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে প্রচলিত, কিন্তু অন্যত্র (উদাহরণস্বরূপ আমার দেশ বাঙলায়) তাঁকে ঈশ্বরের অবতার ভাবার চেয়ে মূলত **রামায়ণ** মহাকাব্যের একজন শৌর্যশালী নৃপতি হিসাবেই দেখা হয়। মহাকাব্য হিসাবে ভারতবর্ষের বাইরেও— উদাহরণস্বরূপ থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ায়— (থাইল্যান্ডের ঐতিহাসিক রাজধানী আয়ুত্থ্যা (Ayuttaya), অযোধ্যা নামের একটি সমগোত্রীয় প্রতিরূপ) এটি সত্যি। একটি অসাধারণ সাহিত্যকৃতি হিসাবে **রামায়ণ** মহাকাব্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিষয়টি রামের দেবত্বের বিশেষ প্রশ্নটি থেকে পৃথক করে দেখতে হবে।

বাস্তবিকই, **রামায়ণের** মধ্যে, মহাকাব্যিক নায়ক রামকে বহুলাংশে একজন সৎ এবং আত্মত্যাগী রাজা হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে, ঈশ্বর হিসাবে নয়। এমনকী এখানে একটি আকর্ষণীয় অংশে সংশয়বাদী পণ্ডিত জবালি রামকে বলছেন: 'হে রাম, প্রজ্ঞাবান হও, এইটি ব্যতীত আর কোনও বিশ্বের অস্তিত্ব নাই, এটি নিশ্চিত। যা বর্তমান তা উপভোগ করো এবং যা কিছু অপ্রিয় তা তোমার পিছনে ফেলে এসো'। যদিও **রামায়ণে** কথিত আছে যে রাম এই নিভীক উপদেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবুও তাঁকে মুখ্যত একজন সৎ ও ধার্মিক রাজা হিসাবেই দেখা হয় দেবতার অবতার রূপে নয়।

এমনকী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' [Visions of Indian History]-তে রামের প্রতি বিশেষ সুস্থাতি প্রদর্শন করেছিলেন, যার মূল কারণ হিসাবে তিনি লিখছেন, '(রাম) আদিম উপজাতিগুলির কাছে দৈবীশক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল, এদের কারো টোটেম ছিল বানর, কারো ছিল ভালুক'। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যেটি একজন রামের অনুগামীর কাছে বেশ অসম্মানকর বলে মনে হতে পারে, কেবলমাত্র সমস্ত দেশে রামের প্রতি মনোভাব কত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তার দৃষ্টান্ত দেয়। আরেকজন প্রখ্যাত বাঙালি কবি মধুসূদন দত্ত তাঁর নাটকাবোর নায়ক হিসাবে রামের প্রতিদ্বন্দ্বী মেঘনাদকে বেছে নিয়েছিলেন, এবং রাম ও তাঁর ভাই এই ধ্রুপদী ও জনপ্রিয় কাব্যে খুব একটা প্রশংসনীয় চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হননি।

ভারতের বিভিন্ন অংশে তথাকথিত অন্যান্য স্বর্গীয় চরিত্রের শ্রেয়ত্ব দেবত্বের দাবিগুলির সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। আমাদের যদি স্যালাডের পাত্র আর রান্নার পাত্রের প্রতিতুলনাটি আনতেই হয়, যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, হিন্দু ঐতিহ্য কোনওভাবেই এবং কোনও অর্থেই রান্নার পাত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর জন্য অবশ্য হিন্দুদের পক্ষে অন্যদের সঙ্গে সমবেতভাবে এবং পারস্পরিক সহনশীলতার সঙ্গে একত্রে বসবাস করা বিঘ্নিত হবার প্রয়োজন নেই, আবার একই কথা হিন্দু,

মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি, ইহুদি এবং সেই সব মানুষ যাদের কোনও ধর্ম নেই সব সম্প্রদায়ের জন্যই সত্য। সাধারণভাবে, একক ধর্মীয় পরিচয়ের পূর্বশর্ত থেকে ভারতীয় পরিচয় নির্মাণের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তা ছাড়াও এ দেশের হিন্দু ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য থেকে একটি একীকৃত ভারতীয় পরিচয় নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ কাজ হত।

৭। 'মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা' পর্যালোচনা প্রসঙ্গে

আমি এবার ভারতবর্ষে মুসলিম অবিশ্বস্ততার দোষারোপের প্রসঙ্গতে আসছি। এই বিষয়ে প্রচুর উদ্ভীপ্ত দৃষ্টান্ত আছে, যা পাকিস্তানের জন্য ভারতীয় মুসলিমদের গুপ্তচরবৃত্তির সংখ্যাধিক্যের অভিযোগ থেকে শুরু করে, টেস্ট খেলার সময় তাদের পাকিস্তান দলকে উৎসাহ দেওয়ার প্রবণতার কথা বলা হয়ে থাকে (ভারতীয় মুসলিমরা বহু সংখ্যায় তা করুক আর না করুক—এই বিষয়ে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই—আমায় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই অমুসলিম লেখক যখন পাকিস্তান দল খেলে, এবং তারা খুব ঘনঘন খেলে, প্রায়শই ঠিক তাই করে থাকেন)।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় মুসলিমদের রাজনৈতিক অবিশ্বস্ততার তত্ত্বটির সপক্ষে কোনও জোরালো প্রমাণ নেই। দেশবিভাগোত্তর ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক মুসলিম ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্তের বশে (পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পরিবর্তে) তাঁরা যেখানকার স্বাভাবিক বাসিন্দা বলে মনে করতেন সেখানেই রয়ে গেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী, কূটনৈতিক নিযুক্তি ও প্রশাসনিক স্তরে কর্মরত মুসলিমদের ভারতের প্রতি অবিশ্বস্ততার কোনও—হিন্দু এবং অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায়—তথ্যপ্রমাণ নাই। (এমনকী ক্রিকেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন)। এই সমালোচনাটির যাথার্থ্য প্রমাণের মতো কোনও তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই এবং এই আপাত-সত্য যুক্তিবিন্যাসের অনিরপেক্ষতাকে পরিবর্তন করা খুবই কঠিন।

মুসলিম 'সাম্প্রদায়িকতা'র অভিযোগগুলি কখনও কখনও ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকটি পাঠের সঙ্গে যুক্ত করা হয় (যদিও 'পাঠ' শব্দটির প্রয়োগ এখানে সঠিক নাও হতে পারে)। এমনটি দাবি করা হয়েছে যে মুসলিম শাসকরা ধারাবাহিকভাবে হিন্দু প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাঁরা যতগুলি সম্ভব হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে এবং তাঁদের বিচ্ছিন্নতা আরও অন্যান্য প্রকাশ্য উপায়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ঘটনা কি সত্যই তাই? উত্তর ভারত আক্রমণকারী মুসলিমরা বাস্তবিকই অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিল। একাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে, আক্রমণ ও লুণ্ঠনকারী মুসলিমদের হাতে উল্লেখনীয়ভাবে প্রচুর মন্দিরের ধ্বংস ও ক্ষতিসাধন হয় এবং একই সঙ্গে সাধারণ বিপর্যয় ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, গজনী (বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী) থেকে আগত সুলতান মামুদ একাদশ শতকে উপর্যুপরি উত্তর ও পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন, এবং মন্দির সহ নগরগুলি ধ্বংস করেন, যার মধ্যে মথুরা, কনৌজ এবং বর্তমান কাথিয়াবাড় (যেখানের সোমনাথ মন্দির তার ঐশ্বর্যের জন্য প্রভূত বিখ্যাত ছিল) রয়েছে। মুসলিম শাসকদের ভারতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে এই ধ্বংসলীলার উদাহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়, কিন্তু তবুও মুসলিম রাজাদের অধীনে কোনও হিন্দু স্থান যে কোনও দিন বিনষ্ট হয়নি এরকম দাবি করা—তা যতই কম সংখ্যায় হোক না কেন—মূর্খতা হবে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনাগুলি থেকে ঠিক কী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

সমসাময়িক ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির প্রয়োজনীয়তার সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে, অতীতের মুসলিম সম্রাটগণ কীভাবে পরিচালিত হতেন—তাঁরা সাম্প্রদায়িক ছিলেন, না আন্তীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন, নিরীক্ষক ছিলেন না সহনশীল ছিলেন—এই সংক্রান্ত কোনও প্রকার দাবি কোনও ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিরক্ষায়, মোগলরা কী করেছিল আর কী করেনি এ বিষয়ে একটি পক্ষ যে নিতেই হবে, এর কোনও অন্তর্নিহিত কারণ নেই। মুসলিম সম্রাটদের 'অপরাধ', যদি কোনও থেকে থাকে, তা ভারতে বসবাসকারী এগারো কোটি মুসলিমদের উপর 'ঘ্রান্তস্তরিত' করবার কোনও যৌক্তিকতা নেই। একই সঙ্গে আমরা বর্তমান ভারতে মুসলিমদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা এবং আনুগত্য বিষয়ে মতামত নির্মাণে বহু শতাব্দী পূর্বে মুসলিম শাসকগণ কী করেছিলেন আর কী করেননি এই প্রশ্ন দৈবাৎই ব্যবহার করব।

যদিও হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সক্রিয়বাদী আক্রমণের (উদাহরণস্বরূপ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার ঘটনা) সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক আলোচনায় ক্রমাগত মোগল শাসনের—কেবল ঔরঙ্গজেব নয়, সাধারণভাবে সব মোগল শাসকদের—একটি বিশেষ চরিত্রায়ণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমসাময়িক ভারতে মুসলিমদের প্রতি মতামত অতীতের মুসলিম শাসকদের আচরণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হতে পারে না (এই সাধারণ বিষয়টি প্রথমেই জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে হবে)। তা সত্ত্বেও আমরা এই অনিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটির আলোচনা এড়িয়ে যেতে পারি না। কেননা অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীর চিন্তাভাবনায় এই দুটি প্রশ্ন প্রবলভাবে জড়িত, এবং প্রসঙ্গটি উল্লেখ না করা হলে তা তাদের কাছে, এবং অন্য যারা এই যুক্তিধারায় প্রভাবিত তাদের কাছে অসন্তোষজনক বা আরও খারাপ কিছু বলে মনে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, মুসলিমশাসকগোষ্ঠীর হিন্দু জনগণের প্রতি মনোভাবে কোনও ধরনের সমতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের

আগেকার হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিদের মতোই তা প্রজাদের প্রতি সহানুভূতির বিচারে প্রচুর বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন প্রজাবৎসল, অন্যরা ছিলেন না। কেউ কেউ হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণের জোরালো পক্ষপাতী ছিলেন, অন্যরা তা চাননি। মুসলিম শাসকদের হাতে হিন্দুদের ক্রমাগত ধর্মীয় নিপীড়নের কোনও ছবির গঠন খুবই শক্ত কাজ—যদিও স্পষ্টতই এই প্রস্তাবটি কোনও কোনও হিন্দু রাজনীতিবিদের কাছে খুব লোভনীয়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিরোধী মনোভাব প্রায়শ উদাহরণ হিসাবে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে খাড়া করা হয়েছে। তিনি স্পষ্টতই হিন্দুধর্মের প্রতি পর্যাপ্ত অসহনশীলতা দেখিয়েছেন এবং তাঁর হাতে কয়েকটি হিন্দু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, হিন্দুদের উপর বিশেষ কর প্রবর্তন ইত্যাদি উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে মুসলিম রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ ধরে নেওয়া—কিংবা এ বিষয়ে মোগল সম্রাটদের আদর্শ উদাহরণ হিসাবে দেখানো—ইতিহাসের প্রতি গভীর মিথ্যাচারিতা হবে।

অন্যান্য মোগলদের মধ্যে কেউই, প্রকৃতপক্ষে, ঔরঙ্গজেবের মতো অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেননি, এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রভূত প্রচেষ্টা করেছিলেন। মহামতি সম্রাট আকবর, যিনি ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ অবধি রাজত্ব করেছিলেন, গভীরভাবে হিন্দু দর্শন এবং সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, এবং তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে সূত্র আহরণ করে একটি সংশ্লেষিত ধর্ম (দীন ইলাহি) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দরবার হিন্দু ও মুসলিম বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এবং সঙ্গীতকারদের নিয়ে পূর্ণ ছিল, এবং তিনি সর্বতোভাবে তাঁর প্রজাগণের প্রতি অসম্প্রদায়িক এবং সমদর্শী ব্যবহারে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু আকবর মোগল সম্রাটদের মধ্যে কোনও ভাবেই একমাত্র নন যিনি ঔরঙ্গজেবের পছন্দসই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নভাবে হিন্দুদের দেখেছিলেন।

ঔরঙ্গজেবকে আলাদা ভাবে না দেখে তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষাপটে (অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল তাঁদের ভিত্তিতে) বিচার করলে তা প্রকৃতই আকর্ষণীয় হবে। তাঁর পরিবারের নিকটতম সদস্যদের কেউই ঔরঙ্গজেবের তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ভাগীদার ছিলেন বলে মনে হয় না। দারাশিকো হিন্দু-দর্শনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং, কয়েকজন পণ্ডিতের সহায়তায় উপনিষদের কিছু অংশের ফারসি অনুবাদ করেছিলেন। মোগল সিংহাসনে ঔরঙ্গজেবের চেয়ে দারাশিকোর দাবি কিছুটা জোরালো ছিল, কেননা তিনি ছিলেন পিতা সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র। ঔরঙ্গজেব দারার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাস্ত করে সিংহাসন দখল করেন, ঔরঙ্গজেব দারাকে নির্যাতন করে মুণ্ডচ্ছেদ করেন, তাছাড়াও তিনি তাঁদের পিতা শাহজাহানকে বাকি জীবনটার জন্য বন্দি করে রাখেন (তাজমহলের স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টির দিকে কিছুটা দূর থেকে বন্দিদশায় তাকিয়ে থেকে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন)। ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিরোধী অবস্থানের তীব্র বৈপরীত্য যা হয়ত, সর্বধর্মসমন্বয়পন্থী এবং কিছুটা হিন্দুত্ব দ্বারা প্রভাবিত ভায়েরা—যাকে তিনি অত্যধিক ঘৃণা করতেন—বিপ্রতীপ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত।

কিন্তু দারা একমাত্র ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি নন ঔরঙ্গজেবকে যাঁর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা পরিবৃত ছিলেন, হিন্দুদের প্রতি যাঁদের মনোভাব তাঁর থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এমনকী তাঁর নিজের পুত্র, যাঁর নামও ছিল আকবর, তাঁর পিতার বিরুদ্ধে ১৬৮১ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং হিন্দু রাজপুত রাজাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর হাতে রাজপুতরা প্রতিহত হওয়ার পর আকবর রাজা শম্ভাজীর সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। শম্ভাজী ছিলেন শিবাজীর পুত্র যিনি মোগলদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং বর্তমান হিন্দু সক্রিয়বাদীদের কাছে অতীব সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। এমনকী হিন্দু সক্রিয়বাদী দল 'শিবসেনা', যার নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শিবাজীর আবাহন করে থাকে, যিনি জঙ্গি হিন্দুদের কাছে একটি পুজা চরিত্র (cult figure) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে রাজনির্বাচনে জয়ের অব্যবহিত পরেই শিবসেনা যে যে প্রস্তাব এনেছিল তার মধ্যে ঔরঙ্গাবাদ শহরের নাম পরিবর্তন করে রাজা শম্ভাজীর নামে রাখার প্রস্তাবও ছিল। আকবরও তাঁর পিতার হিন্দু নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে, তাঁর হিন্দু সহযোগীদের শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থনে পিতার সঙ্গে যথেষ্ট তিক্ত পত্রাদি বিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন। হিন্দুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে ঔরঙ্গজেবকে, তাঁর দাদার দার্শনিক মতের ওপরে তাঁর পুত্রের তাত্ত্বিক মতেরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ভারতীয় ইতিহাসে যদিও থেকে হিন্দু প্রজাদের প্রতি মুসলিম নৃপতিদের ধারাবাহিক বিরোধিতার কোনও চিত্র ফুটে ওঠে না। আজ, মুসলিম একনিষ্ঠতার বিচারে এই পর্যালোচনার ধারাটির যা-ই তাৎপর্য থাকুক না কেন (যেমন আগেই বলা হয়েছে, আমি বিশ্বাস করি তাৎপর্যটি খুবই সামান্য) এমনকী যার ওপর এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত সেই মূল ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতেও এই যুক্তিধারাটি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। ভারতে অবস্থিত বিশাল মুসলিম জনসংখ্যার আনুগত্যের প্রশ্নটি একটি বিপুল সত্য হিসাবে থেকে যায় এবং হিন্দু সমেত অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় থেকে তারা যে কোনও ভাবেই স্বতন্ত্র নয় তা স্পষ্টত স্বীকৃত হয়।

৮। 'আধুনিকতা বিরোধী' পর্যালোচনা প্রসঙ্গে

ধর্মনিরপেক্ষতার 'আধুনিকতা বিরোধী' পর্যালোচনার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাক, এটি কি সত্য ঘটনা যে 'ভারতবর্ষের

আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সহিংসতার বৃদ্ধি ঘটেছে' (যেমনটি আশীষ নন্দী ব্যাখ্যা করেছেন) ? ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয়েকটি পর্যায়ে অবশ্যই ঠিক এটিই ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, প্রায় নিশ্চিত ভাবেই, ভারতের অতীত ইতিহাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত কোনও হিংসাত্মক ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় জীবনহানি হয়েছিল। কিন্তু দেশ সেই অবস্থা থেকে যত এগিয়ে এসেছে (ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 'আধুনিকতার' মাপকাঠিতে অবনতি হয়নি) হিংসাত্মক ঘটনার সাধারণ ব্যাপ্তি ১৯৪০ এর দশকের সর্বোচ্চ স্তর থেকে হ্রাস পেয়েছে — বাস্তবিকই অর্ধশতাব্দী আগে যা ঘটে গিয়েছিল তার তুলনায় বর্তমান ঘটনাগুলির সংখ্যা খুবই নগণ্য।

আমাদের অবশ্য আশীষ নন্দীর বক্তব্যটিকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করে দেখার প্রয়োজন নেই। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রাক-আধুনিক পরিস্থিতি, যেখানে 'প্রচলিত জীবনযাপন পদ্ধতির, বহু শতাব্দী জুড়ে সহনশীলতার যে অভ্যন্তরীণ নীতি' গৃহীত হয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ধরনের নির্ধারণের নিঃসন্দেহে কিছু কিছু যথার্থতা রয়েছে — ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সত্যিই বৃদ্ধি পেয়েছে তার কিছু কিছু প্রমাণ আছে। অপরপক্ষে ভারতবর্ষে প্রাক-ঔনিবেশিক যুগেও কিছু কিছু পর্যায় আছে (যেমন একাদশ ও ত্রয়োদশ শতক, যার আলোচনা আগে হয়েছে) যে সময়, বিশেষত গোষ্ঠীভুক্ত সশস্ত্র সেনাদলের হাতে, সহিংসতার পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং পরে কমে গেছে। কিন্তু আশীষ নন্দীর এই দাবিটি সত্য যে, সাধারণ ভাবে, যখনই বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আসা মানুষেরা পাশাপাশি বসতি স্থাপন করেছে শেষ অবধি, সহনশীলতার নীতিগুলির বিকশিত হওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। আমার বিশ্বাস, আশীষ নন্দীর এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় এটা পরীক্ষা করা নয় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ের সাপেক্ষে, ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে কি না, এমনকী সাম্প্রতিক কালে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যার সঙ্গে অতীতের সংখ্যার তুলনা করাটাও বিশেষ আকর্ষণীয় নয় (মোট জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির ফলে ওই সংখ্যাগুলি পক্ষপাতপূর্ণ হয়ে যাবে)। বরঞ্চ কেন্দ্রীয় তত্ত্বটি এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বলিত সমাজে সহনশীলতার নীতিগুলির বিকাশ ঘটে থাকে, যদি না সেগুলি বিপরীত কোনও প্রচেষ্টা দ্বারা বিঘ্নিত হয়ে থাকে এবং আশীষ নন্দীর মতে 'আধুনিকতার' উন্মেষ ঠিক সেই রকমই একটি প্রচেষ্টা।

কিন্তু 'আধুনিকতা' প্রকৃতপক্ষে কী যা সহনশীলতার পদ্ধতিতে এত বেশি বিঘ্ন ঘটায় ? আধুনিকতার ধারণাটির চিহ্নিতকরণ সহজ নয়, যদিও আধুনিকোত্তরবাদীরা (post- modernists) মনে হয় আধুনিকতাবাদীদের আধুনিকতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সহজ নির্ধারণের নির্ঝঞ্ঝাট বিশ্বাসের অংশীদার। আমরা 'আধুনিকতার প্রকৃত অর্থ' নিরূপণের উদ্দেশে যাত্রা করা থেকে বিরত থাকতে পারি এবং পরিবর্তে 'আধুনিকতা হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা' এই নির্দিষ্ট চিত্রায়ণের উপর মনোনিবেশ করতে পারি, যেটি কিনা আশীষ নন্দীর বক্তব্যের কেন্দ্রীয় ধারণা। সেক্ষেত্রে যে-বিন্দু থেকে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হচ্ছে তা হল আশীষ নন্দীর এই যুক্তিটির জোরালো প্রস্তাব (যা আগে উদ্ধৃত হয়েছে) : 'চিরাচরিত জীবনযাপন পদ্ধতি, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে, সহনশীলতার অভ্যন্তরীণ নীতিগুলির উন্মেষ ঘটিয়েছিল' এটি একটি যথেষ্ট বিস্তৃত দূরদর্শিতা, যদিও সেটি ধর্মনিরপেক্ষতার একটি ব্যতিক্রমী চরিত্রায়ণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মূলত (যা আগে আলোচিত হয়েছে) বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি বিষয়ে সমদর্শী ব্যবহার প্রত্যাশা করে। এটি একেবারেই স্পষ্ট নয় যে এই ধরনের সমদর্শী ব্যবহার কোনওভাবে, অবশ্যই কেন 'মতবাদগুলি নির্মাণ ও বজায় রাখার জন্য হিংসাকে জনগণের নতুন আফিম হিসাবে ব্যবহার' করার সঙ্গে জড়িত থাকবে।

আমি এটা জানি যে আজকাল জাতীয় রাষ্ট্রগুলি সহিংসতার স্থায়ী সংঘটক হিসাবে জোরালো অবিশ্বাসের মুখে পড়ে এবং প্রকৃতই রাষ্ট্র অনেক রকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায়। কিন্তু যেটা স্পষ্ট নয় যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি একটি সমদর্শী মনোভাব কেন এই ধরনের রাষ্ট্রীয় সহিংসতাকে উসকানি দেবে অথবা সম্প্রসারিত করবে। সমসাময়িক তত্ত্বে খুবই মনোমতো কিছু ধ্যানধারণার আবাহনে রাষ্ট্রকে 'একাধিপত্যের' জন্য 'সমসত্ত্ব' হওয়া দরকার হতে পারে এটা অনুমান করে নেওয়া, নিশ্চয়ই কঠিন হবে না, কিন্তু রাষ্ট্র যখনই একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অন্য গুলির চেয়ে পক্ষপাত দেখানো বন্ধ করে (যেটি ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য প্রয়োজন) তখনই এটা ঘটছে বলে ধরে নেওয়া, মনে হয় খুব বেশি হলে চূড়ান্ত বিমূর্ত হবে। যদি ধর্মনিরপেক্ষতাকে কীভাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যায় তার পথপ্রদর্শক হিসাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতাকে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের নিশ্চয় আরও স্পষ্ট করে দেখা উচিত যে কীভাবে 'ভাগ কর এবং শাসন কর' (divide and rule) নীতিটি 'একত্র কর এবং সমসত্ত্ব কর (unite and homogenize) এই কর্মসূচির বদলে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবিকই, শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনার উদ্দেশ্যে, একটি অসাম্প্রদায়িক এবং সমদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি উত্তেজনা ও সহিংসতা হ্রাসে বহুল পরিমাণে ক্রিয়াশীল হতে পারে। একই সঙ্গে, যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি

সাধারণভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত (কেবলমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির সঙ্গে নয়), এটাও দাবি করা যেতে পারে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি অনেক সমাজেই সাধারণভাবে যে সহিংসতা রয়েছে (যখন রাজনৈতিক মনোভাবগুলি অসমদর্শী, সাম্প্রদায়িক এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সীমানার মধ্যে সন্দেহপরায়ণ) তাকে বাড়িয়ে তোলার বদলে কমিয়ে দিতে পারে।

এর ফলে, উদাহৃত অনুসিদ্ধান্তটিতে যে কিছু একটা ত্রুটি থেকে যাচ্ছে এই সংশয় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এবং একই সঙ্গে এটিও স্পষ্টত প্রতীয়মান নয় যে ধর্মনিরপেক্ষ সমদর্শিতা কেন কেবলমাত্র 'আধুনিকতার' নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন অশোক কিম্বা একজন আকবর শাসিত প্রাচীন রাষ্ট্রগুলিতে তাঁরা ঠিক এই রকম সমদর্শী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, এবং এরকম কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই যে ধর্মনিরপেক্ষ সমদর্শিতার এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাগুলি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার হ্রাস না ঘটিয়ে বৃদ্ধি করেছিল।

আমি যুক্তিসহ বলব যে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আধুনিকতাকে এই অস্বাভাবিক সূত্রগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার কাজটি খুব একটা উপযোগী হবে না। বাস্তবিকই, আশীষ নন্দী যে 'সহনশীলতার নীতির' উপর আস্থা স্থাপন করেছেন সেটি প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি গৃহীত একটি সমদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির থেকে দূরবর্তী নয়, এবং এই ধরনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে যেভাবে রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাকে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে এর প্রতি নিরপেক্ষতা প্রদর্শনে ঘাটতি থেকে যায়। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনীতির ক্রমবিকাশ নিশ্চিতভাবেই সহনশীলতার কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে না গিয়ে এর একটি অংশ হিসাবে চিহ্নিত হয়, যদি না আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার একটি অতি বিশিষ্ট সংজ্ঞা বেছে নিয়ে থাকি।

'আধুনিকতার' ধারণাটি — সাধারণভাবে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে এর প্রস্তাবিত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে — গভীরভাবে বিতর্কিত। অশোক কিংবা আকবর কি ঔরঙ্গজেবের চেয়ে কমবেশি আধুনিক ছিলেন ? গজনীর সুলতান মামুদের হাতে একাদশ শতকে যে সাম্প্রদায়িক ধ্বংসলীলা চলেছিল (যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) তার সঙ্গে আরবি-ইরানি পর্যটক (এবং বিশিষ্ট অঙ্কশাস্ত্রবিদ) আলবিরুনির প্রতিক্রিয়ার — যিনি ভারতবর্ষে মামুদের সঙ্গে এসেছিলেন এবং এই হিংসাত্মক ঘটনা দর্শনে বিবমিষা অনুভব করেছিলেন — বৈপরীত্যের কথা বিবেচনা করা যাক।

মামুদ এই দেশের সমৃদ্ধশালিতা চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করেছিলেন এবং সেখানে বিস্ময়কর প্রাপ্তিযোগ ঘটিয়েছিলেন, যার ফলে হিন্দুরা ধূলিকণার মতো দিগ্বিদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

তিনি আরও প্রস্তাব করেছিলেন — যেটা হয়ত কিছুটা অতি-সাধারণীকরণ (overgenaralizing) হয়েছে — যে, ফলস্বরূপ, হিন্দুরা 'নিশ্চয়ই সমস্ত মুসলিমদের প্রতি চূড়ান্ত গভীরপ্রোথিত বিতৃষ্ণা আঁকড়ে ধরে থাকে।' সুখের বিষয় যে সেই 'বিতৃষ্ণা' আলবিরুনিকে বেশ কিছু সংখ্যায় হিন্দু সুহৃৎ এবং সহকর্মীর সান্নিধ্য পাওয়া থেকে বিরত রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এবং এঁদের সহযোগিতায় তিনি সংস্কৃতে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন এবং সমসাময়িক অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, দর্শন এবং ধর্ম সংক্রান্ত ভারতীয় সন্দর্ভগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন।

আলবিরুনি অবশ্য এখানেই থামেননি, বরং তিনি কি কারণে একটি পটভূমির মানুষেরা অন্য একটি পটভূমির মানুষদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয় তার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছিলেন এবং এই ধরনের সমস্যাগুলির সুষম উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তাটিকে চিহ্নিত করেছিলেন — যেটি ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় সমদর্শিতার জন্য একটি উৎকৃষ্ট প্রারম্ভিক বিন্দু।

... [হিন্দুরা] সমস্ত সামাজিক নিয়মে এবং প্রচলিত দেশাচারে আমাদের থেকে এত বেশি মাত্রায় পৃথকীকৃত যে তারা আমাদের দিয়ে শিশুদের ভয় দেখায় — আমাদের সাজপোশাক নিয়ে, আমাদের রীতিনীতি এবং দেশাচার নিয়ে, আমাদের শয়তানের বংশধর হিসাবে প্রচার করে এবং আমাদের রীতিনীতি যা কিছু উৎকৃষ্ট ও যথাযথ তার ঠিক বিপরীত বলে ধরে নিয়ে। প্রসঙ্গত ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বিদেশিদের একই ধরনের অবমূল্যায়ন যে কেবল আমাদের এবং হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত তা নয়, বরং এটা সমস্ত জাতির একে অপরের মধ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য।

যাঁরা 'আধুনিকতাবাদের' ভক্ত তাঁরা হয়ত আলবিরুনিকে একজন 'আধুনিক' বুদ্ধিজীবীর মতো কিছু হিসাবে দেখতে পছন্দ করবেন (যদিও একাদশ শতক থেকে আগত), কিন্তু সেটা যথেষ্ট অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে।

প্রকৃতপক্ষে 'আধুনিকতা' এখানে আদৌ প্রকৃত বিষয় নয়। আলবিরুনির স্বয়ংসম্পূর্ণ মতামত, যেটি পক্ষপাতশূন্য অনুধাবন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শী সহনশীলতা প্রদর্শনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিল এবং সেটি সহিংসতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ধ্বংসলীলার প্রশমনের দিকে একটি সুনির্দিষ্ট চালিকাশক্তি ছিল। একই সঙ্গে আমরা এটিকে 'আধুনিক', 'প্রাক-আধুনিক' কিংবা 'আধুনিকোত্তর' যাই বলে অভিহিত করি না কেন, পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণটিকে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্বেষা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আমি এই পরিচ্ছেদটি সমাপ্ত করতে চাই এই বলে যে আধুনিকতার রূপ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণটি বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ নয়, এবং একই সঙ্গে এটি

ধর্মনিরপেক্ষতাকে পরিত্যাগ করার সপক্ষে বিশেষ কোনও প্রভাবশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে অপারগ। (পূর্বের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত আর একটি 'বৃহত্তর' প্রসঙ্গও রয়েছে যে 'আধুনিকতাবিরোধীবাদীরা', আধুনিকতার ধারণাটির যুক্তিযুক্ততা এবং অন্তঃসঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে, এটির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান নন— কিন্তু এই প্রসঙ্গটি আমাকে পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত রাখতে হচ্ছে)।

৯। 'সাংস্কৃতিক' পর্যালোচনা প্রসঙ্গে

সবশেষে আমি, 'সাংস্কৃতিক' পর্যালোচনা এবং ভারতবর্ষকে সংস্কৃতির মাপকাঠিতে প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দু রাজ্য' হিসাবে মেনে নেওয়ার প্রস্তাবটির সম্মুখীন হতে চাই। দাবি তোলা হয়েছে যে এটি ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিকূলে বল প্রদান করে, কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা এই মৌল সিদ্ধান্তটিকে অস্বীকার করে।

এইখানে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত করতে হবে। প্রথমত যদিও বা ভারতীয় সংস্কৃতিকে মূলত হিন্দু সংস্কৃতি হিসাবে দেখাটা যুক্তিযুক্ত হয়ে থাকে, এর ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের প্রতি সমান রাজনৈতিক এবং আইনগত আচরণের অধিকারটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া খুবই অস্বাভাবিক হবে (এর মধ্যে এগারো কোটি মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক অবস্থান এবং অধিকারের প্রশ্নও জড়িত)। কোনও একটি বিশেষ ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য, যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলেও কেন তা অন্যান্য ঐতিহ্যানুসারী মানুষদের রাজনৈতিক দাবি ও অধিকারগুলি খর্ব করবে ? নাগরিক হিসাবে, নিরপেক্ষ এবং সমতাযুক্ত আচরণ পাওয়ার অধিকার হারানোর মতো তারা কি কাজ করেছে ?

প্রসঙ্গত ব্রিটেনে ধর্মীয় অসমদর্শিতার যে প্রতিতুলনা প্রায়ই উত্থাপিত হয় সেটি ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও, এই পরিপ্রেক্ষিতে খুবই ভ্রমাত্মক হবে। এটা সত্যি যে ব্রিটেনে সমদর্শী আচরণের পরিধি সাফল্যের সঙ্গে বিস্তৃত করা সম্ভব, উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত বিদ্যালয়গুলিকে আরও নিরপেক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া (এ বিষয়ে ব্রিস্টল বিদ্যালয়গুলির প্রতি পক্ষপাত না দেখিয়ে) অথবা, এই প্রসঙ্গে, ধর্মীয় অবমাননা সংক্রান্ত আইন গুলির বৈষম্য দূর করে (সম্ভবত আইনগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে)। যা-ই হোক না কেন, রাজনৈতিক এবং আইনগত অধিকার সংক্রান্ত অধিকাংশ বিষয়ে বা রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে সংরক্ষণ ও নির্ভরতা প্রদানে, ব্রিটেনে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগরিকদের প্রতি ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত সমদর্শিতার প্রয়োগ রয়েছে, এবং এখানে অসমদর্শিতার প্রান্তসীমাটি সুনির্দিষ্ট এবং স্থিতিশীল। এখানে স্থিতিশীলতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আজকের ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনও আত্মসচেতন প্রত্যাখ্যান প্রায় নিশ্চিতভাবেই নতুন করে গুরুতর অসমদর্শী আচরণের আগমন ঘোষণা করবে।

বিবেচনাধীন তত্ত্বটির দ্বিতীয় সমস্যাটি হল যে ভারতীয় সংস্কৃতির এই ভাষ্যটি অতীব সঙ্কীর্ণ। সমসাময়িক ভারতবর্ষে অতীত থেকে আহৃত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারটি হিন্দু এবং অন্যান্য ধারার সঙ্গে ঐসলামিক প্রভাবের সমমিশ্রণে গঠিত, এবং তাদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার প্রতিফলন সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল যে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐসলামিক লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও অন্যান্যদের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, শুধু তাই নয়, তাঁদের সৃষ্টিকর্মগুলি অন্যদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

বাস্তবিকই, হিন্দু বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠানের ধরনগুলিও ঐসলামিক ধ্যানধারণা এবং মূল্যবোধের সংস্পর্শে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। সমসাময়িক হিন্দু সাহিত্যকর্মের কিছু কিছু অংশে ঐসলামিক সুফি ভাবনার প্রভাব সহজেই স্বীকৃত। উপরন্তু, কবীর এবং দাদুর মতো ধার্মিক কবি জন্মসূত্রে মুসলিম ছিলেন কিন্তু তাঁরা সাম্প্রদায়িক সীমানা উত্তরণে সমর্থ হয়েছিলেন (কবীর এর একটি দোঁহায় বলা হয়েছে: কবীর রামেরও সন্তান, আল্লাহরও সন্তান; তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর)। তাঁরা দুজনেই হিন্দু ভক্তিপীতি দ্বারা তীব্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং পর্যায়ক্রমে একে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় সাহিত্য এবং শিল্পকলার মধ্য দিয়ে কোনও সাম্প্রদায়িক সীমারেখা টানা যায় না, যার দু পাশে হিন্দু এবং মুসলিমদের পৃথকভাবে রাখা যায়।

'ভারতীয় সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি হিসাবে' দেখার এই সঙ্কীর্ণ ভাষ্যটির আরও একটি গুরুতর সমস্যা হচ্ছে যে, ভারতীয় সভ্যতার বেশ কিছু মুখ্য কৃতকার্যতা, যেগুলির ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই সেগুলির প্রতি আরোপিত অবহেলা প্রদর্শন। আলাদা ভাবে হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের উপর কেন্দ্রীভূত মনঃসংযোগ কার্যত ভারতের যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের বিচার-বিবেচনা থেকে বিরত থাকে। এইটি একটি দেশের পক্ষে গুরুতর উপেক্ষার বিষয় হবে, যে-দেশে বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যার উপরে কয়েকটি নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, যেখানে প্রাচীন দর্শনে বিস্তারিত ভাবে জ্ঞানবাদ (epistemology) এবং তর্কশাস্ত্র ও একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিশাস্ত্রের আলোচনা করা হয়েছিল, যে-দেশের মানুষ দাবার মতো খেলা উদ্ভাবন করেছিল, যৌনবিজ্ঞানের পথিকৃত ছিল, এবং প্রণালীবদ্ধ রাষ্ট্রীয় অর্থশাস্ত্র (political economy) এবং নিয়মনিষ্ঠ ভাষাতত্ত্বের সূচনা করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির চরিত্রায়ণে আর্যভট্ট বা ব্রহ্মগুপ্তের মতো অঙ্কশাস্ত্রবিদ, কিংবা

কালিদাস অথবা শূদ্রকের মতো কবি ও নাট্যকার, কিংবা নাগার্জুনের মতো তর্কশাস্ত্রবিদ অথবা পাণিনির মতো ভাষাতত্ত্ববিদ, কিংবা বাৎস্যায়নের মতো যৌনশিক্ষাবিদ অথবা কৌটিল্যের মতো অর্থশাস্ত্রজ্ঞের সৃষ্টিকর্মগুলি উপেক্ষা করা অযৌক্তিক হবে।

নিশ্চিতভাবেই, জেমস মিল ১৮১৭ সালে প্রকাশিত প্রখ্যাত 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস' (History of British India) গ্রন্থে ভারতবর্ষের ঠিক এই রূপটিই ব্যাখ্যা করেছিলেন, যে ভারত মনস্থিতায় অন্তঃসারশূন্য কিন্তু ধর্মীয় ধ্যানধারণায় পরিপূর্ণ (বর্বর সামাজিকপ্রথাগুলির প্রতি মিলের অম্লুলিনির্দেশের কথা না উল্লেখ করলেও চলে)। মিল এর 'ইতিহাস' ভারতবর্ষ দর্শন না করে কিংবা কোনও ভারতীয় ভাষা না শিখেই লেখা হয়েছিল এবং সেটি কোনও কোনও উপায়ে, তরুণ ব্রিটিশ আধিকারিকদের সমুদ্র পার হয়ে একটি পরাধীন জাতিকে শাসন করার প্রস্তুতি প্রদানের উদ্দেশ্য সাধন করে থাকতে পারে, কিন্তু এটি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতি অনুধাবনের ভিত্তি হিসাবে আদৌ পর্যাপ্ত নয়। ভারতীয় সংস্কৃতিকে সুনির্দিষ্টভাবে হিন্দুত্বের সঙ্গে শনাক্তকরণ, কেবল মাত্র মুসলিম এবং অন্যান্য অ-হিন্দু অবদানের ভূমিকার অবমূল্যায়ন করে তা নয়, একই সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রের বাইরে সাধারণভাবে, অন্যান্য মুখ্য সৃষ্টিকর্মেরও অবমূল্যায়ন করে। এই ধরনের সাংস্কৃতিক গোঁড়ামি যা মুসলিম অবদানগুলিকে উপেক্ষা করে তা আরও অনেক কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে।

ভারতবর্ষকে সুনির্দিষ্টভাবে হিন্দু অনুষঙ্গে শনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করে ধর্মনিরপেক্ষতার যে 'সাংস্কৃতিক' পর্যালোচনা গড়ে উঠেছে, সেটি, এই ভাবে (১) একটি মেকি সাংস্কৃতিক অনুসিদ্ধান্ত এবং (২) অধিকারগুলিকে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক অবদানের শর্তসাপেক্ষ করার রাজনৈতিক অপসিদ্ধান্ত (non Sequitur) উভয় দোষে দুষ্ট।

১০। একটি অন্তিম বক্তব্য

ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে অসন্তোষ অনেকগুলি স্বতন্ত্র এবং আকর্ষণীয় যুক্তিবিন্যাসের ধারা সৃষ্টি করেছে, যেগুলি সমীক্ষা করার উপযুক্ত, কিন্তু — যেমনটি এখানে আলোচিত হয়েছে — এগুলি এই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বিষয়টিকে কমজোরি করে না। ভারতবর্ষকে সামগ্রিকভাবে বহুত্ববাদী সমাজ হিসাবে দেখার প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে যাওয়া শক্ত, এবং একই সঙ্গে এই স্বীকৃতির নির্ণায়ক অংশ হিসাবে সমদর্শী ব্যবহার এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শী রাজনৈতিক আচরণের দাবি করে এবং এটি মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আরও অনেক প্রশ্নের পথ খোলা রাখে, বিশেষ করে সমদর্শিতার বিভিন্ন ধাঁচের মধ্য থেকে পছন্দ সংক্রান্ত বিষয়টি, যা আইনসঙ্গত হবে। সামগ্রিকপূর্ণ রাজনৈতিক আচরণবিধি, যেমনটি আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি, যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ পথে উপলব্ধ করা যায়, এবং কোন পথটি বেছে নেওয়া হয়েছে তার জন্য তফাৎ থেকে যায়। ভারতবর্ষে অবশ্যকরণীয় রাজনৈতিক বিতর্ক ও যুক্তিতর্কে এই সব প্রসঙ্গগুলি অবশ্যই কেন্দ্রীয় স্থানে রাখা উচিত।

এখানে অবশ্য এই দাবি করা হয়নি যে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিটি কোনও রকম সমস্যা থেকে মুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষতা যেসব বিভিন্ন আকৃতি নিতে পারে তার মধ্যে কয়েকটি স্পষ্টতই অন্যগুলির থেকে কম ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ। দেশকে বিভক্ত করার জন্য সাম্প্রদায়িক সীমারেখাই একমাত্র বৈপরীত্য প্রদান করে না — এখানে শ্রেণী এবং লিঙ্গ এবং ভাষা এবং অঞ্চল এবং আরও অন্যান্য বিচ্ছেদরেখা রয়েছে। এখানে গোষ্ঠীগত স্বনির্ভরতার (autonomy) সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধিকারের সামঞ্জস্য বজায় রাখার মতো জটিল প্রসঙ্গও রয়েছে।

এখানে, তদুপরি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত অসহিষ্ণুতার মোট যোগফলের মাধ্যমে অথবা তাদের অনুক্রমিক সহনশীলতার সংযুক্তির মাধ্যমে সমতা আনয়নের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য রয়েছে। যে-কোনও বিষয় যা ভারতবর্ষে কোনও একটি মুখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ঊষ্মার কারণ হয়ে থাকে, বর্তমানে সেটিকে নির্বাসনে পাঠাবার যোগ্য প্রার্থী হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের প্রশ্ন তোলা উচিত যে সমদর্শী আচরণবিধি কি ঠিক এই ধাঁচেই হওয়া উচিত।

. এই ধরনের অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গগুলির পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা — ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে পরিবাগ্ত যুক্তিধারা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সমদর্শী আচরণের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা — এর কোনওটিরই বিরোধিতা করে না। সাম্প্রতিককালে বহুল পরিমাণে উপস্থাপিত বিরোধী প্রবোচনাগুলিকে প্রতিরোধ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমাদের 'অসন্তোষের শৈত্য', এই মুহূর্তে হয়ত একটি 'গৌরবময় গ্রীষ্মের' দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বর্জিত হলে পরিস্থিতি বর্তমানের চেয়ে আরও অনেক বেশি শীতার্ত হয়ে উঠবে। এখানে অনেক কিছু করার আছে, কিন্তু বর্তমানে প্রবলভাবে উত্থাপিত সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ দিক অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে নয়। প্রস্তাবটিতে যুক্তির চেয়ে শক্তির উপস্থিতি বেশি। □

ভাষান্তর : অভিজিৎ দত্ত

প্রবন্ধ

অমর্ত্য সেন — কোথা থেকে কোথায়

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক চিনা ম্যান্ডারিনকে — চিন লাল হওয়ার আগে — আপ্যায়ন করতে এক ইংরেজ নাকি উম্বলডন টেনিস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ খেলা দেখার পর ম্যান্ডারিন ভদ্রলোক বললেন যে বোঝাই যাচ্ছে কোনও সদুদ্দেশ্য সাধনে বলটি নেটের এপার ওপার করা প্রয়োজন, কিন্তু সেই কাজটি চাকর বাকর দিয়ে করানো যায় না?

বছর ষোলো আগে অর্থনীতির প্রখ্যাত অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত আমাকে প্রায় ওই রকম একটি কথা বলেছিলেন। অমর্ত্য সেন তাঁর অতি প্রিয়জন, এই বন্ধুসন্তানকে বরাবরই তিনি খুব স্নেহ করেন, অমর্ত্য অর্থনীতিশাস্ত্র পড়তে গেল তাঁরই উপরোধে, তাঁর প্রতি সম্মানেই তিনি ফিরে ফিরে গর্ববোধ করেন। সেই অমর্ত্য নাকি গরীব মায়ের সন্তানদের প্রতিদিন দুধ আরও কী কী বিলোচ্ছে আর শিশুদের ওজন করছে। তাঁর স্বরে বিরক্তির ছোঁয়া পাওয়ায় আমি বললাম, 'তা কাজটা তো ভালই'। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ভাল কাজ, তবে সে তো থিওরির লোক, নিজের হাতে দুধ বিলোতে তার সময় নষ্ট হয়, বোঝে না?

এতে আমারও তখন মনে হয়েছিল যে এটা বোধ হয় এক রকম খেলা, তাই অমিয়বাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, খেলাতে ক্যাপটেন বাইরে বসে থাকেন না, দলের মধ্যে থেকে তাদের শ্রমের অংশীদার হয়ে জিতবার চেষ্টা করতে হয়, শুধু বাইরে থেকে উৎসাহ দিলে হয় না। অমিয়বাবু — আমার সম্বোধনে মেশোমশাই — আমাকে মৃদু একটা ধমক দিয়েছিলেন মনে পড়ছে। কিন্তু সেদিন তিনি বা আমি, কেউই ঠিকমতো ব্যাপারটা ধরতে পারিনি।

যেমন যখন Poverty and Famines বইটি প্রকাশিত হল সেদিন অনেকেই বইটির তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারেননি। আর সাবটাইটেল An Essay on Entitlement and Deprivation কিছু পাঠকের কাছে ফাঁকা বাগাড়ম্বর মনে হয়েছিল। আজ অবধি অমর্ত্য সেনের কাজ আর তার মূল্য নিয়ে লোকের মনে ধাঁধা আছে, আর তার সমাধানও হয়নি। ভক্তদের (বাম বা দক্ষিণ পন্থায়) নামজপের ফাঁকে ফাঁকে চোখ কান খোলা রাখা যদি বা চলে, নতুন কথা তলিয়ে বোঝবার যতটা খোলা মনে ভাবা দরকার সেটা বোধ হয় সংস্কারবিরুদ্ধ। ঘোড়ার অমর্ত্য সেন থেকে আজকের অমর্ত্য সেনে উত্তরণ কিছু অমর্ত্যানুরাগীর কাছেও পাহাড়ের মাথায় শুদ্ধ স্রোতের থেকে সমতলের মন্দগতি ষোলা জলে পরিণতি তেমন ভাল ঠেকে না, ব্যাপ্তি না হয় ভাল, কিন্তু তা বলে হ্যাঁটুজল?

পাঠক অনুমতি করলে একবার চেষ্টা করে দেখি, পরিণতি কী বা কেন, আর সে পরিণতি যুক্তির পথেই এসেছে এ কথায় আপনাকে রাজি করতে পারি কি না। এ বিষয়ে টেকনিকাল আলোচনা বেশ শটমটো আর অর্থনীতির ছাত্র নয় এমন পাঠকের হয়ত একেবারেই অপরিচিত। তাই তত্ত্বের স্বাদ যদি দিতে পারি তাহলেই আমার কাজ সম্পন্ন মনে করব — পেট ভরে খাবার সখ থাকলে সাক্ষাৎ সেন মহাশয়ের মোকাবিলা করতে হবে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কেনেথ অ্যারো একটি লেখায় সবাইকে আশ্চর্য করেন। সে-লেখাটির বর্ধিত রূপ হল তাঁর বই Social Choice and Individual Values। সেই বই থেকে একটি নতুন বিষয় সৃষ্টি হল যার নাম Social choice theory বা সামাজিক বাছাই তত্ত্ব। রাজনীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র আর অর্থনীতিশাস্ত্র এ তিনের ঘরেই তার স্থান, আরও অনেক কটা বিষয়ে এই তত্ত্ব (বা তার কোনও প্রকার) প্রাসঙ্গিক। তত্ত্বটি কী আস্তে আস্তে ভাঙি, অর্থাৎ একটু ঘুরে ফিরে তত্ত্বটির দিকে যাব।

আমাদের এখানে স্কুলে ঢোকা মাত্র বাচ্চাদের পরীক্ষা দিতে হয় আর পরীক্ষার ফল শুধু যে পাশ ফেল ঘোষণা করে তাই নয়, কে প্রথম, কে পঞ্চম, কে ছাব্বিশ নম্বরে স্থান পেল সেসব খবর থাকে। এই সারি বিন্যাস কীভাবে কী যুক্তিতে হয়? বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার নম্বর যোগ করে মোট নম্বর অনুযায়ী ছাত্রদের সাজিয়ে দেওয়া হয় প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি মার্কা দিয়ে। সবচেয়ে বেশি নম্বর যার সেই প্রথম। এ আমাদের বহু পরিচিত ব্যবস্থা, আমরা অনেক সময়ে স্কুল কলেজের গণ্ডি পার হয়েও এই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই সারিবদ্ধতার চক্করে পড়ে যাই, সব ব্যাপারে এক নম্বর কে এসব প্রশ্ন তুলি।

ইংল্যান্ডে কিন্তু এক আধটা পরীক্ষার বাইরে এমনটা হয় না। পরীক্ষার ফলে শ্রেণী বিন্যাস থাকে, তবে প্রথম (বা অন্য) শ্রেণীতে যারা পড়ল তাদের নাম বর্ণানুক্রম অনুসারে ছাপা হয়। সুতরাং আমাদের পদ্ধতি একমাত্র উপায় এমন কথা সবাই মানে না। কেন, দোষটা কী? নম্বর যোগ যখন করছি তখনই কিন্তু মেনে নিয়েছি — অঙ্কানে বা সঙ্কানে — যে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, যে কোনও বিষয়ে এক নম্বর বেশি পাওয়া অন্য বিষয়ের এক নম্বর কমের ঠিক এক মাপের। অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর সমতুল, commensurable। যদু ইংরেজিতে কাঁচা, পেল চল্লিশ, অংকে পেল নব্বই। যদি এ দুটো বিষয়ে মাত্র পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে মধুর (ইংরেজি ৬২, অঙ্ক ৬২) চেয়ে যদুর নম্বর বেশি। ইংরেজি পড়ান যিনি তিনি বললেন ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে যদুর কোনও ধারণাই নেই, আর অঙ্কের মাস্টার বলেন যে যদু সোনার চাঁদ ছেলে, দেখবেন পরের বার অঙ্কয় শ'য়ে শ' নম্বর পাবে। এ দুটি মত কি যোগ করতে পারি? তা না হলে কে বেশি ভাল ছাত্র এটা স্থির করতে নম্বর যোগ করার পদ্ধতি ব্যবহার করি কোন মুখে? যদু অঙ্কয় ভাল, ইংরেজিতে খারাপ, মধু এর ঠিক উল্টো এই খবর থেকে আমরা কিছুই বলতে পারব না। যদু-মধু কে সব মিলিয়ে বেশি ভাল। শিক্ষকরা এক এক জন যদু-মধুর আপেক্ষিক মূল্যায়ন এক এক রকম করবেন। নম্বর যোগ করা বন্ধ করলে কে সেরা কে নয় কীভাবে ঠিক করি?

লেখাপড়ার ব্যাপারে বিলেতে না হয় এক দুই তিন সাজায় না, কিন্তু অর্থনীতিক মূল্যায়নের বেলাতে ওরকম করলে চলবে কি? দেশের কল্যাণ কিসে বেশি কিসে কম পরিষ্কার না জানলে কী পরামর্শ অর্থনীতিবিদ সরকারকে দেবেন? আর্থনীতিক কল্যাণতত্ত্ব নামে যে বিষয়টি তাতে এর সদুত্তর নেই?

আছে, তবে সে উত্তরে কারুর মন ভরে না। Utilitarianism বা উপযোগবাদ থেকে একটা রাস্তা পাওয়া যায়। ভোগ্যবস্তু থেকে লোকে উপযোগিতা (utility) পায়। উপযোগবাদ হল "অন্য সবদিক উপেক্ষাপূর্বক কেবল উপযোগিতার মানদণ্ডে কার্যাদির ন্যায়-অন্যায় বিচার; প্রচুরতম লোকের প্রভূততম উপকার সাধনই কর্মের উদ্দেশ্য।" (সংসদ ইংরেজি-বাংলা অভিধান)। ওই প্রভূততম উপকার কী করে মাপ করব? সকলের উপযোগিতা যোগ করে দেখতে হবে কী করলে এই যোগফলটি সর্বাধিক হয়। মুশকিল এই যে ওই পোড়া যোগ করা এখানে ঢুকে পড়েছে। পরীক্ষার নম্বরে যে কারণে যোগ করা বোধ হয় ঠিক নয় মনে হয়েছে এবার বিভিন্ন লোকের উপযোগিতা যোগের বিরুদ্ধে সেই কারণগুলো আরও বড়।

যোগ না হয় না-ই করলাম, উপযোগিতা কিসে কার কতটা এই প্রশ্নটা পাল্টে তো আমরা লোকের পছন্দ-অপছন্দ এরকম বলতে পারি। এই পছন্দের একটা সারি থাকা উচিত লোকের মাথায়। যে কোনও দুটি বিকল্প সম্বন্ধে সে বলতে পারে কোনটা তার বেশি পছন্দ; বা সমান ভাল লাগে (শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী, কারে রেখে কারে ফেলি?)। প্রত্যেকের সারিগুলো পেলে আমরা তার থেকে একটা "সামাজিক সারি" তৈরি করবার চেষ্টা করতে পারি — আর সেটা পেলেই আমাদের কেল্লা ফতে।

অ্যারো এই সামাজিক সারি তৈরি করবার একটি বিধি খুঁজছিলেন। সামাজিক সারি তো ব্যক্তিগত সারির পছন্দ অপছন্দ থেকেই বানানো হবে তবে উপযোগিতা যোগকরা বা ওই রকম গোঁয়ার্তুমি না করে অনেক রকম উপায়ের কথা ভাবা যায়। দেশের সবচেয়ে মোক্ষম সিদ্ধান্তগুলো যেসব জায়গায় নেওয়া হয়, যেমন লোকসভা, সুপ্রিম কোর্ট, সেখানে মতবিরোধে মীমাংসা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে। আবার লোকসভায় আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে আমরা দেখি কার কটা ভোট (Simple majority, plurality)। এগুলো ছাড়া অন্য পাঁচটা নিয়ম পেতে পারি যাতে ব্যক্তিগত সারিগুলো থেকে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সুষ্ঠু পথে ওই সামাজিক সারি গড়ে তুলতে পারি।

এই যে সামাজিক কল্যাণবিধি, সেটাকে কিছু শর্ত মানতে হবে। এ শর্তগুলো অ্যারোর বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণে যে রকম দাঁড়িয়েছে তা হল :

১. Unrestricted domain — ব্যক্তিগত সারিগুলো কেমন হবে তার কোনও বাধানিষেধ নেই। বিধি ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা বলতে পারব না ওই যে ওরা, ওদের কথা ধর্তব্যর মধ্যে মনে করছি না।

২. Weak Pareto Criterion — দুটি বিকল্পের একটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি পছন্দ যদি প্রত্যেকে করে তা হলে সামাজিক সারিতে সবার বেশি পছন্দকেই বেশি পছন্দ বলে দেখাতে হবে।

৩. Independence of Irrelevant Alternatives — ব্যক্তিগত সারিতে যদি কোনও দুটি বিকল্পের মধ্যে পছন্দ

না পাল্টায় সামাজিক সারিতে তাদের মধ্যে কোনটি উপরে কোনটি নীচে এও পাল্টাবে না। ধরুন তিনটে পালা, বিদ্যাসাগর, হিটলার, লেনিন। এ নিয়ে সব ব্যক্তিগত সারি দেখি, নানারকম সাজানো পাই। কিন্তু যদি কোনও কারণে বিদ্যাসাগর পালা বর্জন করতে হয় তাতে হিটলার আর লেনিনের মধ্যে কোনটা বেশি ভাল লোকদের মতে একই রইল, কিন্তু সামাজিক সারিতে পাল্টে গেল, এটা হবে না।

৪. Non-dictatorship—স্কুলের পরীক্ষাতে প্রথম হলে বৃত্তি দেওয়া হবে। এদিকে শিক্ষকরা কে সবচেয়ে ভাল বলতে পারছেন না, তাঁরা নম্বর যোগ বন্ধ করেছেন। হেডমাস্টার মশাই বলেন যে আপনারা না পারলে কি হয়, আমি বলাই এর নাম করছি, সেই সেরা। এ রকমটা হবে না।

অ্যারো প্রমাণ করেন যে এই চার শর্ত মানে এমন কোনও বিধি থাকতে পারে না। যদি কোনও বিধি চারটেই শর্ত মানে বলে ধরা যায় তাহলে যে সামাজিক সারি পাব তাতে দেখব তিন বিকল্প ক খ আর গ-এর মধ্যে ক খ-এর চেয়ে ভাল, খ গ এর চেয়ে ভাল আর গ ক এর থেকে ভাল (failure of transitivity)। অর্থাৎ সারিক্রম দাঁড় করানোই যাচ্ছে না। এ উপপাদ্যটি গল্পচ্ছলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়মের প্রসঙ্গে ওই failure of transitivity উদাহরণ বলে দেখানো হয়। উদাহরণ ঠিকই, তবে অ্যারোর উপপাদ্য যে কোনও বিধি সম্পর্কে খাটে, যদি সে বিধি ওই চার শর্ত মানে।

এই প্রজ্ঞার পর কি বা ক্ষমা? অর্থনীতিবিদ কি তাহলে কত ধানে কত চাল, কিসে কী হয় এ সব খবর দেওয়াতে আটকে থাকবেন? দেশের দশের ভাল কিসে বলতে তাদের মানা? অ্যারোর উপপাদ্য তো নেতিবাদী একটি গর্ত খুঁড়েছে, দেশের লোকের মত থেকে ভাল মন্দ বিচারের পদ্ধতিতে পৌঁছতে গেলে সেই গর্তে পড়ে ছটফট করতে হবে। তবে কি যুক্তি ছেড়ে গাজোয়ারীর রাস্তা ধরব আমরা? বলা বাহুল্য অর্থনীতিবিদ মাত্রেই ঠুঁটো হয়ে থাকতে রাজি হননি, স্বয়ং অ্যারো থেকে অনেকেই গাড্ডা থেকে বেরবার অনেক চেষ্টা করেন।

এ বিষয়ে অমর্ত্য সেনের কাজকর্মের শুরু ষাটের দশকে। প্রথম দিকে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সামাজিক সারি করার চেষ্টা করেন। অ্যারো নিজেই (এবং ডানকান ব্ল্যাক) দেখিয়েছিলেন যে এক নম্বর শর্ত (unrestricted domain) একটু আলগা করলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিধিতে সামাজিক সারিক্রম পাওয়া যায়। শর্তটি আলগা না করে হচ্ছে না তাই আলগা করা, তবে শুধু সমানধর্মী লোকেদের মত হিসাবে পড়বে এ তো বড় বেশি গাজোয়ারী। পারলে যেটুকু আলগা না করলে নয় ততটুকু করতে পারলে কিছুটা স্বস্তি হয়, সমস্যার সমাধান পুরো হচ্ছে না কিন্তু যা হোক চলনসই একটা বুদ্ধি বাতলানো গেল। অমর্ত্য সেন এ নিয়ে অনুসন্ধান চালান, প্রথমে একা, পরে তাঁর প্রিয় ছাত্র প্রশান্ত পট্টনায়কের সহযোগে এই প্রসঙ্গের খুব পরিষ্কার একটা উত্তরও পান।

অনেকে ধন্য ধন্য করছে আর প্রসন্নভাবে বিনয়ের মুদ্রা বিন্যাস করে বসে থাকা অমর্ত্য সেনের ধাত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিধি হিসাবে রাজনীতিতে চললেও, অর্থনীতিতে খুব অর্থবহ নয় বলে তাঁর মত তিনি কিছুদিন পরে ছাপার হরফে জানিয়েছেন। সংখ্যাগুরু হয়ে সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচার রাজনীতিতেও সম্ভব, অর্থনীতিতে তো বটেই। যে-কোনও লোকের কাছ থেকে তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পাঁচজনের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া পাঁচজন বলল ভাল, বিরুদ্ধে মাত্র একজন। তা ছাড়া অ্যারো উপপাদ্যের মোকাবিলা করতে তার শর্তগুলোকে আলগা করাও মনে ধরে না। শর্ত রেখে যদি transitivity না পাই তাহলে কি সব গেল? ক খ, খ গ, গ ক এই চক্র না হলেই তো হয়। এই চেষ্টাতে অমর্ত্য transitivity গোষ্ঠীরই অন্য কটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দিয়ে হয় কিনা দেখলেন (quasi-transitivity, acyclicity)। এ প্রচেষ্টাতে গোড়ায় কিছু সুফল পেলেও শেষ অবধি যা টের পাওয়া গেল যে অ্যারোর উপপাদ্য খাঁটি তো বটেই, আর তাগড়া (robust)। অর্থাৎ এটা সেটা বুদ্ধি করে গাড্ডা পেরিয়েছি ভাবতে ভাবতে আবার পা হড়কায়। উপপাদ্যটি যেমন সাজানো হয়েছে তার থেকে একটু অন্য ব্যবস্থা করলে একটু অন্যভাবে ওই নেতি নেতি সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। পলকা উপপাদ্য নাড়া দিলেই চিৎপটাং, অ্যারো উপপাদ্য সেরকম নয়, শক্তসমর্থ আর তার ডাক নাম নিখিল।

বেশ সবার উপযোগিতা যোগ করে ভালমন্দের বিচার করতেন বেন্থাম থেকে মার্শাল, পিসু অবধি অর্থনীতিবিদরা, তা ওরকম খুঁৎখুঁৎ করে যোগ করা ছেড়ে এখন বোঝ। যোগের বিরুদ্ধে আপত্তির এক বড় কারণ হল এতে বিভিন্ন ব্যক্তির উপযেগিতা তুলনা করতে হয়। কিন্তু তুলনা একেবারে করা যাবে না, ব্যক্তির উপযোগিতা আসলে তার অন্তরের সত্তার ছায়া, আর আমি তুমি বিভিন্ন ব্যক্তি, দুই সত্তা পাশাপাশি ফেলে তুলনা করব সাধ্যি কি—এই মত যেন বাড়াবাড়ি। অমর্ত্য সেন তাই আংশিক তুলনার পথ খুঁজলেন যাতে পাকা উত্তর না হলেও সদুত্তরের সম্ভাবনা থাকে।

শুধু উপযোগিতা বা তারই আর এক প্রকার, পছন্দ সারিক্রম (preference ordering) ব্যবহার করতে হবে তাই বা কেন? ব্যক্তিসত্তার ছায়া সে বেশ কথা, কিন্তু ছায়াতে কি আসলের সব রূপ ধরতে পারা যায়? আলোটা এপাশ ওপাশ করলে সেই সত্তার অন্য অবয়ব ফুটে উঠতে পারে অন্য ধরনের ছায়ায়। তা ছাড়া সামাজিক কল্যাণের আলোচনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য বা হক অধিকার এ কোনওটার উল্লেখ হয় না এ তাজ্জব ব্যাপার।

এ সবই খিড়কির দরজা দিয়ে উপযোগিতা বা পছন্দ সারিতে ঢুকে পড়েছে এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুল না হতে পারে। যদি আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবনযাপনের প্রশ্নে যাই তা হলে এখানেও সেই সমস্যা। কিন্তু কী করে কী হচ্ছে বা হচ্ছে কিনা এটা তো আড়ালে রাখলে চলবে না, প্রকাশ্যে আলোচনা করতে হয়।

এ রকম প্রকাশ্যে আলোচনা করতে অমর্ত্য সেন minimal liberty (একছিটে ব্যক্তিস্বাধীনতা?) এ প্রসঙ্গে এনে ফেলে যে তুলকালাম কাণ্ড করেছিলেন তার জের আটদশ বছর পণ্ডিতি ত্রৈমাসিকগুলোর পাতায় চলেছিল। ১৯৭০ সালে অমর্ত্যের The Impossibility of A Paretian Liberal নামে লেখাটি বেরোয়। একটুখানি ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে তিনি ধরেছিলেন যে প্রতি ব্যক্তির কিছু কিছু ব্যাপারে (বাড়িতে পাজামা না লুঙ্গি, মুগের ডালে চিনি, না চিনি না) শেষ কথার হক থাকবে। অর্থাৎ সে ব্যাপারে তার পছন্দ সবাই মান্য করবে, ঘরেও মানবে আর সমাজও মানবে। প্যারেটো নিয়ম তো বলে যে যদি দুটি বিকল্প ক আর খ-এর মধ্যে সবাই ক বেশি ভাল বলে তা হলে সামাজিক মতে ক বেশি ভাল। এবার তিনি প্রমাণ করেন যে তেমন তেমন ব্যক্তিগত সারিক্রম হলে (unrestricted domain) প্যারেটো নিয়ম আর ওইটুকু ব্যক্তিস্বাধীনতা একসঙ্গে ধরা চলে না।

প্রমাণটি শক্ত নয়, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে যে গল্পটা ফাঁদলেন সেটা খুবই সরল ও মনোজ্ঞ। দুটি লোক আছে, একজন অতি শালীন অপরজন কামুক। লেডি চ্যাটারলির প্রেমিক বইটির অমার্জিত সংস্করণ এক কপি মাত্র আছে। তিন রকম ব্যবস্থা সম্ভব, (ক) শালীনবাবু পড়বেন (খ) কামুকবাবু পড়বেন আর (গ) কেউ পড়বেন না। শালীনবাবুর পছন্দক্রম গ ক খ—কেউ না পড়াই ভাল, তবে ওই দুশ্চরিত্র আস্কারা পাবে তার চেয়ে আমিই পড়ি। কামুকবাবুর ক্রম ক খ গ—ওই ভণ্ডটা পড়ুক, শিক্ষা হবে তার, নইলে আমি পড়ি, না পড়ে বই ফেলে রাখা এ আবার কী?

ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কামুকবাবু যদি না পড়ার চেয়ে পড়তে পছন্দ করেন তাহলে খ গ-এর চেয়ে ভাল বলে সমাজ মানতে বাধ্য। শালীনবাবু পড়তে না হলে বেঁচে যান, তাই গ ক-এর চেয়ে ভাল এতে সমাজ রাজি। কিন্তু প্যারেটো নিয়ম বলছে দুজনেই ক খ-এর চেয়ে বেশি পছন্দ করেন তাই ক খ-এর চেয়ে ভাল বলে ধরতে হবে। এই দেখুন ভাল খারাপ জোড়া জোড়ায় পেলাম খ গ, গ ক, ক খ। সেই চক্করে পড়লাম।

এ নিয়ে নাম করা ত্রৈমাসিকগুলোর পাতায় কত না তর্ক, কত না আলোচনা। প্রমাণ কিন্তু অটল, তবে আলোচনায় স্বাধীনতা, হক, অধিকার এই সব ধারণাগুলো অনেকটা পরিষ্কার হল। প্যারোটো নিয়মের মতো আপাত নির্বিরোধী বিধান যে অনেক নষ্টের গোড়া হতে পারে সেটা আরও নানাভাবে অমর্ত্য আর তাঁর কিছু সঙ্গী দেখিয়েছেন। কিন্তু এই "অস্বাভাবিক" ফলটির জন্য অনেকে দায়ী করেছেন ওই দুই বাবুর পছন্দ সারিতে পরস্পরের বই পড়া নিয়ে মত থাকা। ঠিক কথা, বাবুদুটি নিজের চরকাতে তেল দিলে এ গল্পের উদাহরণটি খাটত না। দুটো কথা—উদাহরণটি উদাহরণই, তত্ত্বের প্রমাণটি এই উদাহরণ না খাটলে ভুল, তা নয়। দু'নম্বর কথা, ওই দুই বাবু কি "অস্বাভাবিক"? প্রচুর লোক তো এ রকম হয়, এ রকম পছন্দ ভোগসুখের বাইরের কথা নিয়ে আসছে উপযোগিতা বা পছন্দ সারিতে বলে হিসাবের বাইরে ঠেলে দেব?

এখান থেকে অমর্ত্য সেন উল্টো দিকে রওনা হলেন। কল্যাণ-অর্থনীতি বিষয়টির ঠুঁটো অবস্থার কারণ, তিনি বললেন, আমরা যা তথ্য পাওয়া যায় তা ব্যবহার না করে শুধুমাত্র পছন্দ সারিক্রম থেকে সামাজিক চয়নে পৌঁছতে চেষ্টা করছি। এই ভুলের নাম তিনি দিলেন Welfarism, কল্যাণবাদ।

কল্যাণবাদের শুচিবাই বেশ চড়া ধাতের, কখন মূল্যবোধের ছোঁয়া লেগে যুক্তির ইমারত অশুচি হয় এই ভয়ে শধু মাত্র উপযোগিতা বা পছন্দসারি দিয়ে কাজ সারতে হবে। বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগিতা তুলনা যে তুলনার কাজটি করছে তার মূল্যবোধ দিয়ে নির্ধারণ হয়, প্রকৃতির নিয়মে নয়। যতই বোঝান—মূল্যবোধ এসে পড়লে যা খুশি হতে পারে, তাই বা কেন? পুরো মিল না হতে পারে, অনেকটা বারোয়ারী জায়গা পেতে পারি, কথা বলা যায়, অঘোরপন্থী কাপালিক আর কটা?—পাকা কল্যাণবাদী কর্ণপাত করবে না। উপযোগিতা সম্বন্ধে তথ্য হিসাবে শুধুমাত্র পছন্দের সারি ছাড়পত্র পাবে, আর উপযোগিতার বাইরের কোনও খবরই গ্রাহ্য হবে না। প্রথমটি অ্যারো সমস্যার সমাধান বন্ধ করে, দ্বিতীয়টি কল্যাণমূলক অর্থনীতির অন্য প্রশ্নগুলো আলোচনার বাইরে ঠেলে দেয়। গরিবের জন্য কিছু করা চাই বলছেন, কে গরিব কীভাবে স্থির করব বলুন তো? ধরুন কিছুটা টাকা গরিবের জন্য বরাদ্দ হয়েছে, যার যার উপযোগিতা কম তাদের মধ্যে বিলানো হবে। উপযোগিতা রামের শ্যামের চেয়ে কম (বা বেশি) বলবার জো আছে? আচ্ছা ওই যে নাদুস-নুদুস সুবেশধারী বেশ কিছু লোক দেখা যাচ্ছে ওরা বোধহয় বড়লোক, আর ওদের বাদ দিলে বাকিরা গরিব? কি সর্বনাশ, এ সব খবর আমাদের পছন্দ সারিগুলোতে তো নেই, সেখানে দেখছি বেশি সবাই কমের চেয়ে পছন্দ করে। এ ছকে আমরা শোষণ বন্ধ করো বলতে পারব না, 'সমান কাজের সমান মজুরি'ই বা বলি কী করে?

বেন্থামপন্থী উপযোগিতাবাদ অবশ্য উপযোগিতা তুলনীয় মনে করে, আর এ পথে অ্যারোর সমস্যা সমাধানও সম্ভব। কিন্তু

অনেক তথ্য উপযোগিতায় ঢোকানো যায় না। সামাজিক কল্যাণ বলতে আমরা সহজ বুদ্ধিতে মনে করি, সাম্য, ন্যায় ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের স্বাধীনতা এ সব আমাদের উদ্দিষ্ট। দারিদ্র্যমোচন সোজাসুজি ভোগের উপযোগিতা বাড়ায় না, তবে ভোগীরা যদি সবাই একরকম মনে করি তা হলে প্রত্যেকের উপযোগিতাও এক রকম হবে। প্রান্তিক উপযোগিতাও একরকম, আর ভোগ বাড়লে কমে। তা হলে সকলের আয় সমান হলে মোট উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি হবে। শেষ রক্ষে হল কি? সবাই তাদের উপভোগ করার ক্ষমতায় সমান এটা তো ঘটনা নয়, এটা আমাদের সংকল্পের সহায়ক বিশ্বাস হতে পারে। এ বিশ্বাসে আমরা কি চাইব প্রত্যেকে কুস্তি করে, ধ্রুপদ গায়, নিরামিষাশী?

মানুষে মানুষে অনেক ফারাক থাকে, তবে যেমন সবার এক ভোট সেই রকম কিছু প্রস্তাব এখানে লুকিয়ে আছে? কিন্তু সমান আয় দিলে সমান ন্যায় হচ্ছে কি? কিছুটা টাকা যদি ভাগ করে দিতে হয় দুটি লোকের মধ্যে — একজন আনন্দের উপাসক, ভোগে দক্ষ; অন্যজন আজন্ম রোগেভুগে শিটবিটে তেতো স্বভাবের পঙ্গু — উপযোগিতা দেখে আমরা দক্ষ ভোগীকেই ওই টাকাটা দেব যাতে আচ্ছা করে ভোগ করে সমাজের মোট উপযোগিতা অনেকটা বাড়ায়। আজন্ম রোগে পঙ্গু এমন মানুষ তো কিছুতেই আনন্দ করতে জানে না — তাই তিনি পড়ে মার খাবেন দু' ভাবে। এমনিতেই নিরানন্দ জীবনের লড়াই তার ওপর ভোগে অদক্ষতার দরুন বাড়তি টাকা অনারা পায়।

আবার টেনেমেনে একটা গল্প খাড়া করা যায় যাতে পঙ্গু লোকটির প্রান্তিক উপযোগিতা ভীষণ বেশি। কেন, কোত্থেকে হল এ সব প্রশ্ন না করলে যা আমার আপনার মন চায়, অর্থাৎ বঞ্চিত লোকটিই বাড়তি টাকাটা পাবে এই ফল দেখানো যাবে। কিন্তু টানতে টানতে কোথায় পৌঁছেছি খেয়াল আছে তো?

তা ছাড়া ধরুন আমাদের রোগে ভোগা পঙ্গুটি হালে দীক্ষা নিয়েছেন — গুরুর কাছে শুধু বীজমন্ত্র নয় আরও শিখেছেন ভগবান ভক্তকে পরীক্ষা করতে কত কষ্ট দেন, কিন্তু ইনি তো আসল ভক্ত হাসিমুখে সব কষ্টের মোকাবিলা করেন। না ভুল বলেছি, তাঁর কষ্টই নেই, প্রভু পরীক্ষা করবেন এ তো গর্বের কথা, দুঃখ কষ্ট এমন ভাববে কেন? এবার সেই বেন্থামবাদীরা কী বুদ্ধি করবে?

উদাহরণ আর যুক্তিগুলো সবই অমর্ত্য সেনের। তাঁর মতে কেউ খুঁৎখুতে বা অল্পে সন্তুষ্ট এটা বড় কথা নয়, দেখতে হবে সে বঞ্চিত কি না। বঞ্চনার মাপ করতে কতটা ভোগ্যবস্তুতে তার অধিকার শেষ কথা নয়, কারণ বস্তুর আদর তা দিয়ে কী করা যায় সেজন্যে। কতটা উপযোগিতা সে বিচারও দেখলাম অনেক ক্ষেত্রে খাপ খায় না, ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে। কিসে মানুষের সাম্য আমাদের উদ্দিষ্ট — না, সমাজজীবনে অংশগ্রহণ করে আর পাঁচজনের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকারে। সকলে এক নয়, আলাদা, তাই প্রত্যেকের জন্য ব্যবস্থাও আলাদা হবে যাতে তারা সফল জীবনযাপন করতে পারে। এই করতে পারাকে অমর্ত্য সেন সক্ষমতা (capability) নাম দিয়েছেন। ঠিক হল না, লোকে যা যা করে সফল জীবনযাপন করতে চায় সেগুলোকে তিনি বলেন ক্রিয়া বা functioning। আর সক্ষমতা আসলে নানা প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করবার নানা কার্যক্ষমতার সমাহার যাকে তিনি capibility set বলেন। এই সেট-টি বাড়াতে পারলে লোকের স্বাধীনতা বাড়ে।

এই গোছের আলোচনা অনেকে তেমন পছন্দ করেন না — বলেন কি জানি মশাই, দর্শন হতে পারে কিন্তু এতে আমাদের ইকনমিক্স্ কই? ঘুরে তাহলে সেই পঙ্গুর কথা পাড়ি, সাম্য বলতে আয়-সাম্য মনে করলে কি ঠিক হবে? আর পাঁচজনের মতো জীবনযাপন করতে সে সমান টাকায় পারবে? সামান্য বর্ষ ব্যাপারে সে পিছিয়ে থাকবে না যদি তার জন্য positive discrimination করা হয়? অমর্ত্য সেনের এ কথা বলতে চোখের জলে ভাসতে হয় না, সক্ষমতাই জীবনযাপনের পরিমাপ মনে করলে আপনিই এই মতে পৌঁছতে হবে। অন্যরাও এমন মতে পৌঁছতে পারেন, তবে তাদের হৃদয় হয়ত যুক্তির মাথায় হাঁটে! আপেল ফল তো খসে মাটিতেই পড়বে নিউটনের ঠাকুমা তা জানতেন না? গ্রহ তারা চন্দ্র যে নিয়মে চলছে সেই নিয়মেই আপেল পড়তে বাধা এ প্রমাণে আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র বাড়েনি? খুচরো অনেক কথা লোকে জানে, সেগুলো আলগা কথা না পাকা কথা বুঝতে প্রণালীবদ্ধ (systematic) বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমাদের সমাজে মেয়েরা শিক পুরুষের মাথার উপর নয় বললে অনেকে বিরক্ত হন — সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আরও কত কি বলেন। অর্মত্য যে শিশুদের ওজন করছিল সেটাতে বিলনো দুধে শিশুকন্যার ওজন তেমন বাড়ে না, শিশুপুত্রের তুলনায় এটা হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া একটা বড় শিক্ষা। পিতৃতন্ত্র কতদূর তার শিকড় বিছিয়েছে আমরা মোটেই জানি না, জানতে চাইও না। হ্যাঁ, রাজপুত, জাঠ এদের কথা আলাদা, আমাদের বাঙালির মধ্যে অন্যরকম বলে ভাবতে ভালবাসি। অমর্ত্যের একটি হিসাব — যদি আমাদের ভারতে নারী পুরুষ অনুপাত নিদেনপক্ষে আফ্রিকার মতো হত — পশ্চিমের উন্নত দেশের কথা ছেড়েই দিই — তা হলে আরও তিন কোটি নারী থাকত এ দেশে। নেই কেন? প্রাকৃতিক নিয়মে থাকা উচিত ছিল, মানুষের নিয়মে বাঁচতে পারেনি কারণ মানুষ নাকি পুরুষমানুষ। এখনও আমাদের দেশের নারী অত্যাচার অপচার মেনে নেয়, মানিয়ে নিতে শেখে জন্মাবধি। হই হল্লা

না করলে তাদের কষ্টবোধ কম হতে পারে, কষ্ট কম, বঞ্চনা কম? সাম্যের এই দিকটা অনেক রাজনীতিতে সাম্যবাদী দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। এ বিষয়ে তত্ত্ব তথ্য দুই-ই অমর্ত্য হাজির করেছেন — বঞ্চনার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটা।

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অসম বণ্টন প্রথা এ সব বড় চেনা রোগ। এগুলোর প্রতিবিধান অর্থনীতিবিদের হাতে নেই কিন্তু যাদের হাতে তারা কী করবে এ বিষয়টা তাদের হাতে ফেলে রাখা যায় না। তাই এ সবের কারণ, চেহারা, প্রকার, এ সব অর্থনীতির অঙ্গ, এর আলোচনা করতে হবে যতদূর সম্ভব যুক্তির স্তরে। আর মাপজোকও করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প দুটোই মাপার নিয়ম আছে। এক দল আছে যাঁরা চট করে মেপে ফেলেন — ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি, কোমর ছাব্বিশ ইঞ্চি...। আর যদি ফিতে ভাল হয়, নানা রকম মাপ পাওয়া যায়। কিন্তু কী মাপলাম সব সময়ে বোঝা যায় না। দারিদ্র্যের হিসাবে একটা আয় ধরা হয় সীমারেখা। এর চেয়ে কম আয় যার সে দরিদ্র। জনসংখ্যার যে অনুপাত দরিদ্র সেটা কম হলে ভাল হচ্ছে বলবে। কিন্তু যদি যারা সবচেয়ে গরিব তাদের কাছ থেকে আয় কেড়ে নিয়ে যারা ওই লাইনের ঠিক তলায় আছে তাদের দিই, তাহলে দরিদ্র অনুপাত কমে যাবে। কিছু লোক সীমারেখার তলা থেকে এখন উপরে। আর একদম তলায় যারা, তারা না খেতে পেয়ে মরে গেলে আর একটু উন্নতি হবে অনুপাতে। এ শুনে আপনি শিউরে উঠবেন জানি, কিন্তু ওই গরিবি মাপবার বুদ্ধিটা ছাড়ব না তো, বদলাব। কেন শিউরে উঠলেন জানলে সে রকম আর না হয় এমন করে বদলাব। এই আলোচনায় আমাদের ন্যায়বোধ নিজেই ঢুকে পড়ল আপনার শিউরে ওঠায়। তা হলে উচিত কি? না ad hoc ন্যায় অন্যায় হাততালি শিউরে ওঠা ছেড়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এগনো, ন্যায়বোধকে একটা অ্যাকসিওম আকারে আলোচনার গোড়ায় ঢোকানো গেলে মাপ জোকের ধরন কেমন হবে সেটা ঠিক করা যায়।

সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনাতে প্রায়ই জাতীয় আয় বা মাথা-প্রতি আয় ঢুকে পড়ে। জীবনযাত্রার মান নিয়েও কথা হয়। এগুলোও মাপতে গেলে হড়কে যায়, সোজাসুজি মাপজোক করতে গেলে যা মাপতে চাই তা আড়ালে চলে যায়। অমর্ত্য সেন অনেকটা এই সব সমাজকল্যাণের সূচক নির্ধারণের কাজ করেছেন। দারিদ্র্যের যেমন সেন সূচক চালু হয়েছে, অন্য ব্যাপারে তার নাম ব্যবহার না করলেও তার বিশ্লেষণের ব্যবহার হয়েছে। Capability set-এর ব্যবহারে নানা জট আছে, সব তুলনা করতে পারা যায় না, যেমন স্বাধীনতা বাড়ছে কি কমছে সব ক্ষেত্রে অদ্বর্থক উত্তর পাওয়া যায় না। তা বলে তো আমরা ছেড়ে দিতে পারি না, যা সহজে মাপা যায় গোনা যায় তাতে অনেক শক্ত প্রশ্নের জবাব নেই। শক্ত প্রশ্নের আলগা জবাবের বেশি যদি না-ই পাই একেবারে পাকা ভুল উত্তরের চেয়ে তো ভাল।

দেখুন আস্তে আস্তে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম। আজ চল্লিশ বছরে কত বিষয়ে কত কাজ করলেন অমর্ত্য, তার কোনটা কে ভাল বলল, কে তর্ক জুড়ল এ ভাবতে গেলে সেই হারিয়ে যায়। কিন্তু দেখুন মোটা গন্ধটায় কোনও ছেদ, কোন লাফ নেই। গোড়া থেকে আজ অবধি প্রশ্ন একটাই লোকের ভাল হয় কিসে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে যুক্তিই সূত্রে অনেকটা দূর আসতে হল। যাত্রার তো শেষ নেই, Jean Dreze অমর্ত্যর প্রিয় ছাত্র, তার সঙ্গে লেখা Hunger and Public Action দিয়ে শুরু করে আরও কিছু বই সম্পাদনা করে চলেছেন।

ভরসার কথা কর্তারাও আজকাল অমর্ত্য সেন কী বলেন জানতে চাচ্ছেন। □

প্রোফেসর দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান।

আনাবাজ (অন্তর্দেশে অভিযান)

সাঁ্যা-জন প্যার্স

মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ :
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় / অসীমকুমার রায়

বাংলা অনুবাদ সম্পর্কিত ভূমিকা

এক

১৯৬১–৬২ সালে কোনও পরিকল্পনা ছাড়া প্রায় খামখেয়ালবশত ফরাসি দুই কবি, জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো (জন্ম : ১৮৫৪, মৃত্যু : ১৮৯১) এবং পল ভের্লেন (জন্ম: ১৮৪৪, মৃত্যু : ১৮৯৬)-এর বেশ কয়েকটি কবিতা মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছিলাম। সেই অনুবাদগুলি পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ র‍্যাঁবো, ভের্লেন এবং নিজস্ব-র মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ফাদার পিয়ের ফার্লো ও ফাদার দাত্তিয়েন, উভয়েই বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ, তখন জীবিত। আমার অনুবাদ -পাণ্ডুলিপি তাঁদের দেখিয়ে নিয়েছিলাম।

এতদিন পর, সঠিক বলতে গেলে ১৯৯১ সালে, দ্বিতীয়বার ফরাসি দেশ ঘুরে এসে আবার কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই, স্যাঁ-জন প্যার্সের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করার বাসনা জাগল। ইঙ্কন জুগিয়েছিলেন আমার সেবারকার সহচর সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। তিনি এই কবির চার-পাঁচখানা কাব্যগ্রন্থ আমায় কিনে দিয়েছিলেন যার মধ্যে 'আমের'-ও ছিল, যেটি ১৯৬০ সালে নোবেল পুরস্কার পায়। আমি কিন্তু কবির 'আনাবাজ' কাব্যগ্রন্থে অধিক আকৃষ্ট হই কেননা পড়তে গিয়ে দেখি, এর মধ্যে বাইবেলের অনুষঙ্গ ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত রয়েছে এবং এর ভাষান্তর করেছেন স্বয়ং টি.এস. এলিয়ট। ১৯৩০ সালে প্রথমবার, তারপর ১৯৪৯ ও ১৯৫৮ সালে তিনিই করেছিলেন তার পরিমার্জন। সে-বই ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এলিয়ট ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। তিনিও সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৪৮ সালে। এলিয়ট এবং প্যার্স ছিলেন প্রায় সমবয়সী।

এলিয়ট আমার প্রিয় কবি। তিনি যাঁর রচনা অনুবাদ করেছেন অসীম শ্রদ্ধাসহকারে, সেই কবিও আমার মনের মানুষ হবেন—এমন আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাকে বলে ডুব দিয়েছিলাম অনুবাদ-কাজে। কিন্তু পদে পদে হাবুডুবু খেতে থাকি। ফরাসি দেশ কবিদের দেশ যারা বলে, তারা পুরো সত্য কথা বলে না। ফরাসিরা একাংশ আমুদে, আলাভোলা, বোহেমিয়ান হলেও সাধারণভাবে কূটনীতি, উপনিবেশস্থাপন, সাম্রাজ্যবিস্তার, অস্ত্রশস্ত্র বানানো—এসব কাজেও যথেষ্ট দক্ষ। স্যাঁ-জন প্যার্স নিজে একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন। হয়ত সেই কারণে তাঁর ব্যবহৃত ভাষা বক্রোক্তিময়, ইমেজারি বেশ জটিল, বাক্যগুলি—এই দীর্ঘ কাব্যটির ক্ষেত্রে—অসম্পূর্ণ এবং প্রায়শই ক্রিয়াপদহীন। এমন সব শব্দ তিনি নির্বাচন করেছেন যার একাধিক অর্থ হয়। আর প্রাচীন, অপ্রচল অর্থটি তাঁর কাম্য। আমি ভাবালু কবিতায় বীতশ্রদ্ধ। তাই এই সব অসুবিধাগুলি আমার পক্ষে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু খানিকটা খোঁচাখুঁচি করার পর এ-ও বুঝলাম যে ফরাসি যার মাতৃভাষা বা মাতৃভাষার মতো সড়গড়, এমন কোনও ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া এ-কাজ আমি উপযুক্তভাবে সম্পন্ন করতে পারব না। কলকাতায় বসে এমন সহৃদয় বিশেষজ্ঞ পাই কোথায়?

শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালে আমার এই প্রায়-অসম্ভব প্রকল্পে যুক্ত হলেন অসীমকুমার রায়। ঠাকুর জুটিয়ে দিলেন বলা যায়। তিনি আমাদের বন্ধু, বহুকাল প্যারিসে আছেন। তিনি বন্ধুবৎসল, পরোপকারী কিন্তু নিরাসক্ত স্বভাবের মানুষ। তিনি কবি নন, তাতে একটা সুবিধে হল এই এই যে, কাজটা তিনিও চ্যালেঞ্জের মতো নিলেন। এবং দু-বছর চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ একদিন ওই দুর্বোধ্য ফরাসি টেক্সট-এর আক্ষরিক বাংলা পুনর্লিখন কম্পুটার যন্ত্রে প্রস্তুত করে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। এবার আমার আর পালাবার পথ রইল না।

দু'জনে দু'জায়গায় থাকি। একসঙ্গে বসে আলোচনা করতে করতে অনুবাদ করা হয়ে ওঠেনি আমাদের। শীতকালে কলকাতায় এলে অসীম ক্বচিৎ এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। আমি যখন ভারপ্রাপ্ত হলাম, তখন আমার সামনে মূল ফরাসি ভাষার কাব্য একদিকে, অন্যদিকে এলিয়ট-কর্তৃক তার তর্জমা এবং অসীমকুমার রায় প্রণীত একটি অসম্বদ্ধ কিন্তু যথাযথ বাংলা ভার্শান। কাজ

করতে গিয়ে দেখি, অসীম এলিয়টের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। এলিয়ট নিজে একজন বড় মাপের কবি হওয়ায় মূল রচয়িতার কলাকৌশল উপেক্ষা করে স্থানে স্থানে স্বাধীনতা নিয়েছেন—হয়ত বৃহত্তর স্বার্থে। আমরা তা পারি না। আমরা মনে করতে চাই, অনুবাদকের দ্বারা কোনও মৌলিক অনুদান নিষিদ্ধ, এলিয়ট তার তোয়াক্কা করেননি। অসীম প্রায় পতিব্রতা স্ত্রীর মতো কবিকে বাংলা শব্দে অনুসরণ করে গেছেন। আমি একটা ত্রিমাত্রিক কাঠামো হাতে পেলাম। তা থেকে এই ক্ষুদ্র বইটি গড়ে উঠেছে।

দুই

আনাবেসিস নামে অন্য আর একটি বই আছে। সেই বইটিই বেশি প্রচলিত।

প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের এক জনপ্রিয় এবং অমূল্য সম্পদ এথেন্সবাসী জেনোফোনের গদ্যে লেখা সেই আনাবেসিস। খ্রিস্টপূর্ব চারশো সাল নাগাদ পারস্যের রাজপুত্র সাইরুষ তাঁর দাদাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য স্পার্টান ও ভাড়াটে গ্রিকদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ব্যাবিলনের দিকে অভিযান শুরু করেন। জেনোফোন, সক্রেটিসের শিষ্য, ওই দলে যোগ দেন। কুনাকসার যুদ্ধে গ্রিকেরা জয়ী হলেও অসতর্কতার কারণে সাইরুষের মৃত্যু হল। পারস্যরাজ সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। যুদ্ধবিরতির সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাঁচজন গ্রিক সেনাপতিকে হত্যা করা হল। নেতৃত্বহীন ও উদ্দেশ্যহীন ভাড়াটে সৈন্যদলের মনোবল গেল ভেঙে। জেনোফোন তখন নেতৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উত্তরদিকের অজানা পার্বত্যপথ দিয়ে অনেক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করে, অনেক নদী-পর্বত-গ্রাম-নগর অতিক্রম করে, অনেক বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ষড়যন্ত্র, অন্তর্ঘাতের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে, এশিয়া মাইনর থেকে দশ হাজার সৈনাকে তাদের দেশের কাছে ফিরিয়ে আনলেন। এই ঘটনার কুড়ি বছর পর সেই রোমাঞ্চকর ও বিপজ্জনক অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তিনি লিখলেন 'আনাবেসিস'—যার অর্থ উপরের দিকে অভিযান।

ফরাসি কবি স্যাঁ-জন প্যার্সের জন্ম ৩১ মে ১৮৮৭, মৃত্যু ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫। এটি তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম আলেক্সিস স্যাঁ-লোজে লেজে। জন্মস্থান গ্রীষ্মপ্রধান ক্যারিবিয়ন অঞ্চলের গুয়াদলুপ দ্বীপে। সেখানেই কেটেছে তাঁর বাল্যকাল, ছাত্রজীবন আপন দেশ ফ্রান্সে। সেখানে তিনি আইন, দর্শন, নৃবিদ্যা, প্রাচীন সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯১৬ সালে তিনি বৈদেশিক দপ্তরের সরকারি কাজে নিযুক্ত হন। পাঁচ বছর চিন দেশে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে কূটনৈতিক বিভাগের চাকরিতে তাঁর যথেষ্ট উন্নতি হয়, যার ফলে তিনি কালক্রমে বিদেশ দপ্তরের প্রধান সচিব পদ পর্যন্ত উঠেছিলেন।

১৯০৫-যে পল ক্লোদেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই। আর, ১৯১২ সালে পঁচিশ বছর বয়সের এই যুবকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথের। এক খণ্ড ইংরেজি গীতাঞ্জলি তিন আন্দ্রে জিদকে পাঠিয়ে দেন ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য। আমাদের তরুণ বন্ধু চিন্ময় গুহর দেওয়া তথ্য থেকে জানা গেল যে তাঁর উপরোধেই জিদ-এর মতো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক গীতাঞ্জলি অনুবাদে প্রবৃত্ত হন।

১৯৪০-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সৈন্য ফ্রান্স অধিকার করে নানারকম নির্যাতন চালাতে থাকে। বিঘ্নিত চাকরিজীবন পরিত্যাগ করে তখন নিরাপত্তার কারণে কবি আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি. শহরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। সাতাশ বছর প্রবাসে কাটিয়ে শেষ জীবনে আবার স্বদেশে ফিরে আসেন।

রাজনীতিঘেঁষা চাকরি করার পাশাপাশি স্যাঁ-জন প্যার্স কবিতা লিখে গেছেন অনিয়মিতভাবে। পিকিং বা বেজিং শহরের প্রান্তে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত মন্দিরে দিনের পর দিন বসে তিনি আনাবাজ দীর্ঘকাব্যটি রচনা করেছিলেন। সেই কাব্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। প্রথম ইংরেজি অনুবাদ টি. এস. এলিয়টের করা। বেরিয়েছে ১৯৩১ সালে, তিনবার সংশোধিত হয়ে যার নতুন সংস্করণ বেরোয় ১৩৩৮, ১৯৪৯ এবং ১৯৫৯ সালে। এই সব সংশোধনে অনুবাদকের সঙ্গে কবিরও হস্তক্ষেপ ছিল—এমন দাবি এলিয়ট নিজেই তাঁর ভূমিকায় করেছেন। ফরাসি ভাষাবিদদের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে প্যার্সের দুরূহ রচনা এলিয়টের মধ্যস্থতায় মুক্তি পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে এলিয়টের মৌলিক অবদানের মিশেল আছে। সে কাব্য সুশ্রাব্য কিন্তু অনুগত নয়। আমরা এখন ফরাসির সঙ্গে এলিয়টকৃত ইংরেজির যে ভাষাগত অসংগতি দেখতে পাই, তাতে মনে হয় মূল রচয়িতার যোগাসাঙ্গ ছিল। এমনও হতে পারে, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন এলিয়টের মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, এতে স্যাঁ-জন প্যার্স খানিকটা কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্যবশত বিশেষ বাধা সৃষ্টি করেননি।

আনাবাজ জার্মান, রুশ, ইটালিয়ন, স্প্যানিশ, গ্রিক ও রুমানিয়ান ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। কোনও ভারতীয় ভাষায় তর্জমা বোধ হয় এই প্রথম।

কবিতাটির বিষয়বস্তু ও শিল্পকৃতি বিষয়ে নানা মত আছে। কেউ কেউ বলে, এই পুরাণগন্ধী কাব্য এক আরোহণের ইতিবৃত্ত—সমুদ্র সৈকত থেকে মধ্য এশিয়ার ধূসর পার্বত্য মরুভূমি অবধি এর বিস্তার। কারুর মতে, এই অভিযান আসলে ছদ্মবেশে পাশ্চাত্য উপনিবেশীদের প্রাচ্য অভিমুখে ধনরত্ন সন্ধানে যাত্রা, কিন্তু যেতেতু সমস্তটাই ইঙ্গিতে বলা, তাই এলিয়ট এ বিষয়ে যা বলেছেন, এখানে তার কিছু কিছু পুনরুক্তি করাই বাঞ্ছনীয়

মনে করি। অবশ্য বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে কবির বকলমে একজন উপনিবেশিক নায়কের উপস্থিতি আমরা বারবার উপলব্ধি করেছি।

এলিয়ট বলছেন, আনাবাজ দীর্ঘকাব্যের মধ্যে যে দুর্বোধ্যতা বা আপাত অসংগতি আমরা লক্ষ করি, তা কবির ইচ্ছাকৃত। তিনি অর্থপরম্পরার জোড়গুলি ছিন্ন করে রেখেছেন যাতে পাঠশেষে কোনও খণ্ড উপলব্ধির পরিবর্তে এক বর্বর আদিম মানব সভ্যতার পূর্ণতর উপলব্ধি পাঠকের মনে জন্মে যায়। বস্তুত, শক্তিশালী প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ চাপের মধ্যে অসহায় মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাময় জীবনযাপন ও অন্তর্জগতের ক্রিয়াকলাপ এ কাব্যের উপজীব্য। এর একটা খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিক দিকও আছে। কিন্তু যেসব শব্দ ও চিত্ররূপ কবি ব্যবহার করেছেন, তাতে মুক্তিকামী মানুষের কোনও উদ্বেগ আপাতভাবে ধরা পড়ে না। এলিয়ট বলেন, এর জন্য পাঁচ-ছয়বার মনোযোগ সহকারে কাব্যটি পাঠ করতে হবে। যতখানি গভীর মনোযোগ সহকারে একজন ব্যারিস্টার কোনও জটিল মামলায় বিচারকের রায় অনুধাবন করে।

কবির লিখনভঙ্গিমা বিষয়ে এলিয়ট বলছেন, এটি গদ্যের চেহারায় অপরূপ কবিতার এক নিদর্শন। ছন্দোবদ্ধ রচনাকে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করি—কবিতা (পোয়েট্রি) আর পদ্য (ভার্স), —এই দুই অভিধায় গুরুত্বপূর্ণ আর অকিঞ্চিৎকর রচনাকে আলাদা করা হয়। কিন্তু গদ্যের বেলা উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্ট গদ্যের আলাদা নাম নেই। আমরা সাহিত্যকর্মের অভিজ্ঞতায় কাব্যময় গদ্যকে নিকৃষ্ট গদ্য হিসাবে শনাক্ত করতে শিখেছি। আনাবাজের গদ্য কাব্যময় নয়, ব্যঞ্জনাময়। তার বহুলাংশে দ্ব্যর্থক শব্দচয়ন। পংক্তি-বিভাজন, ছেদচিহ্নের ব্যবহার, স্থগনপদ্ধতি এবং চিত্রকল্প সবই সুপরিকল্পিত। কোথাও ভাবাবেগ তাড়নার বাষ্পচিহ্ন নেই। এর ফলে আমাদের অনুবাদের কাজ শক্ত হয়ে পড়েছে। তবু শেষ অবধি টেনে নিয়ে গেছে এক আকর্ষণ। ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করা মানব সভ্যতার প্রাথমিক স্তর, যার সুঘ্রাণ আজও মিলিয়ে যায়নি।

বিশেষ কয়েকটি ছোট সমস্যার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

বাংলা ভাষায় ক্যাপিটাল লেটারের ব্যবহার নেই। আমাদের মাতৃভাষায় বাক্যের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর বা নামবাচক শব্দের প্রথম অক্ষর আর সব অক্ষরের মতো। কবিতার বেলায় পংক্তির প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরও বৈশিষ্ট্যহীন। ইংরেজিতে বা ফরাসিতে তা নয়। কেন নয়, সে প্রশ্ন তুলছি না। আমরা বলতে চাই, এই কাব্যে কয়েকটি নির্বাচিত শব্দ, হয়ত ঝোঁক দেবার উদ্দেশ্যে, প্রায়শ ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করা হয়েছে। যেমন, এত্রঁজে, সোলেই, উয়েত্, গ্রঁ রোয়া বা রেইন। আমরা অনুবাদে এই শব্দগুলির প্রতি কোনওপ্রকার গুরুত্ব প্রদর্শন করতে পারলাম না।

ফরাসিতে 'ভু' শব্দের অর্থ তুমি হয়, আপনিও হয়। আমরা প্রয়োজনমতো এই সুবিধা গ্রহণ করেছি। মুশকিলে পড়েছি 'আম' শব্দটি নিয়ে যার আক্ষরিক অর্থ আত্মা। ইংরেজিতে সোল। বাংলায় আমরা আত্মা শব্দটি সংকীর্ণভাবে শরীরের বিরুদ্ধে অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করি। এর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ আছে। এই অসুবিধার মোকাবিলা করতে কোথাও কোথাও আমাদের অন্য বিকল্প শব্দ যথা প্রাণ, অন্তর বা মন, ব্যবহার করতে হয়েছে। মূল কাব্যের একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদ যথাসাধ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু প্রচলিত বাংলায় খটকা লাগলে তা অমান্য করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য, অনুগত থাকা, এবং দেখা যে অনুবাদেও যেন রচনাটি কবিতার মতো শোনায়।

এলিয়ট সুপারিশ করেছেন যে দশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত আনাবাজ দীর্ঘকাব্যকে পাঠক যদি এক-একটি নাম প্রদান করেন, তা হলে কবিকল্পিত অভিযানের ইতিবৃত্ত বুঝতে কিছু সুবিধা হবে। তিনি দশটি অধ্যায়নাম প্রস্তাবও করেছেন। আমরা তাঁর প্রস্তাব অনুসারে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শুরুতে একটি নামকরণ মেনে নিয়েছি।

মূল এবং ইংরেজি আনাবাজ-এ কিছু বিদেশি এবং অপ্রচলিত নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলির অর্থ যথাসাধ্য উদ্ধার করে জানানো হল।

জবাল—বর্তমান লেবাননের একটি পর্বতমালা। এখানে নির্মল জলের উৎস আছে।

ইলিয়ন—ট্রয় নগরের অন্য একটি নাম। নগরের প্রতিষ্ঠাতা ইলোস-এর নাম থেকে।

সাবেয়ান—সাবা বা শেবা রাজ্যের অধিবাসিনী।

মেমনন্—একজন গ্রিক পৌরাণিক বীর।

সেলুসিদ—সিরিয়ার রাজবংশ। প্রথম সেলুকাস দ্বারা স্থাপিত—খ্রি. পূ: ৩১২-৬২।

কোকুলুস—প্রায় দশ রকম ভেষজ গাছগাছড়ার সমষ্টিগত নাম।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

১. নগরপত্তনের জমিতে অভিযাত্রীর আবির্ভাব

তিন বিশাল ঋতু ধরে নিজেকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে যেখানে আমার বিধান প্রবর্তন করলাম, সেই ভূখণ্ডের সুলক্ষণ নিশ্চিত মনে করি।

সকাল বেলায় অস্ত্রগুলি সুন্দর, আর সমুদ্র। বীজমুক্ত ভূখণ্ড আমাদের ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে দেওয়ায়

পাওয়া গেল এই অদূষণীয় আকাশ। আর ওই সূর্যের নামও করা হয়নি কিন্তু তার শক্তি আমাদের মধ্যে

আর ওই সকালবেলার সমুদ্র আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মতো।

শক্তি, তুই আমাদের নৈশ ভ্রমণপথে গান গেয়েছিলি।

...সকাল বেলার বিশুদ্ধ অচেতনায় আমরা আমাদের স্বপ্নের কতটুকু জানি, আমাদের বয়স্কতার?

আরও একটা বছর তোমাদের মধ্যে। শস্যের অধীশ্বর, লবণের অধীশ্বর আর রাষ্ট্রের সম্পদ সমান পাল্লায়।

ওপারের জনতাকে আমি আর ডাকব না। প্রবালের গুঁড়ো দিয়ে আমি আর চিহ্নিত করব না

ঢালের ওপর অবস্থিত নগরের বিশাল অঞ্চলগুলি। কিন্তু আমি ভেবে রেখেছি, তোমাদের মধ্যে থাকব।

তাঁবুতে ঢোকার মুখে সমস্ত গৌরব। তোমাদের মধ্যে আমার শক্তি। লবণের মতো পবিত্র ভাবনা দিনের বেলায় তার বিচারসভা বসাল!

* * * * *

...এবার আমি তোমাদের স্বপ্নের শহরে যাতায়াত শুরু করলাম আর জনহীন বাজারে বাজারে বসিয়ে দিলাম আমার প্রাণের এই বিশুদ্ধ বাণিজ্য, তোমাদের কাছে

অদৃশ্য আর নিরন্তর যেন ভরাট বাতাসে কাঁটার আগুন।

শক্তি, তুই আমাদের ঝলমল পথে পথে গান গেয়েছিলি।
...'লবণের আহলাদে গাঁথা আছে অন্তরের সকল বর্শা... লবণ দিয়ে আমি বাঁচিয়ে তুলব বাসনার মৃত মুখগুলি!

পিপাসার প্রশংসা না করে যে হেলমেটে ভরে সৈকত থেকে জল খেয়েছে, প্রাণের কারবারে আমি তাকে সামান্যই মূল্য দিই...

(আর ওই সূর্যের নামও করা হয়নি কিন্তু তার শক্তি আমাদের মধ্যে।)

মানুষ, ধুলোর এবং নানারকম ধারার লোকজন, কারবারী আর বেকার লোকজন, সীমান্তের মধ্য আর ওপারের লোকজন, ও এই সব জায়গার স্মৃতিতে ধরা তুচ্ছ সব লোকজন, উপত্যকা আর সমতলভূমির, এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ উৎরাই থেকে আমাদের নিম্নতম উপকূলের লোকজন, সংকীর্ণ পথের আর ঋতুর অনুগামী, যারা ভোরের শিরশিরে হাওয়ায় শিবির তোলো ও যারা ভূপিঠের ছালের ওপর খুঁজে বেড়াও জলসূত্র, ও সন্ধানী, ও অন্যত্র প্রস্থানের হেতু নির্ণেতাগণ

তোমরা, সকালবেলায়, তিতকুটে লবণের চোরা লেনদেন কোরো না, যখন সাম্রাজ্যের আর পৃথিবীর ধোঁয়ায় উঁচুতে ঝুলন্ত মৃত জলের পূর্বলক্ষণের সীমানার নির্বাসনের দামামা

জাগায় বালুচরে হাইতোলা অনন্তকে।

...পবিত্র বস্ত্রে তোমাদের মধ্যে। তোমাদের মধ্যে আরও এক বছর। আমার গৌরব রয়েছে সমুদ্রগুলির ওপরে, আমার শক্তি রয়েছে তোমাদের মধ্যে।

অন্য সব উপকূল থেকে আসা বাতাসের নিশ্বাস আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে জড়িত, আর, অতিক্রান্ত সময়ের বীজ বহন করে, দাঁড়িপাল্লার শীর্ষে ঝকঝক করছে এক শতাব্দের মহিমা...

লবণসরে আটকে আছে গণিত। আমার ভুরুর স্পর্শকাতর বিন্দুতে, যেখানে জমে উঠেছে কবিতা, আমি লিখে রাখি এই সর্বমানবের গান, এই হর্ষোন্মাদনা,

অনন্ত পানিত্রাসগুলি টানতে টানতে আমাদের জাহাজঘাটায়।

২. নগর প্রাচীরের সীমানা নির্ধারণ

যে দেশে অনেক লোক যায় সেখানেই সবচেয়ে বেশি নীরবতা, যে দেশে অনেক লোক যায় সেখানেই দুপুরবেলায় ঝিঁঝিপোকা।

সুগন্ধ মলম গায়ে মেখে উঁচু চড়াইয়ের এক দেশে চলো আমি যাই, তোমরা চলো, যেখানে অভিজাতদের কাচা কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়।

আমরা টপকিয়ে যাই রানীর পোশাক, পুরোটা জালের কাজ করা, দুদিকে বাদামি ধূসর পটি দেওয়া (আহ্, কীভাবে অন্ন নারীদেহ পারে জামার বগলে ছোপ ধরিয়ে দিতে।)

আমরা টপকিয়ে যাই তাঁর মেয়ের পোশাক, পুরোটা জালের কাজ করা, দুদিকে চকচকে পটি দেওয়া (আহ্ কীভাবে বগলের কাছ থেকে পিঁপড়ে ধরতে জানে টিকটিকির জিভ!)

আর, সম্ভবত এমন দিন কাটে না যেদিন একই পুরুষ এক নারী আর তার কন্যার জন্য জ্বলেপুড়ে না মরেছে।

মৃতদের সর্বজান্তা হাসি, আমাদের জন্য এই ফলগুলি ছাড়ানো হোক! ...কী হে, পৃথিবীতে বুনো গোলাপের তলায় একটুও দয়ামায়া নেই?

আসছে, পৃথিবীর এই পারে জলের ওপর দিয়ে বিশাল বেগুনি অমঙ্গল। বাতাস উঠছে। সমুদ্রের বাতাস। শুকোতে দেওয়া কাচা কাপড়গুলো

ছড়িয়ে যাচ্ছে। যেন টুকরো করে ছেঁড়া হচ্ছে এক পুরোহিতকে...

৩. ভবিষ্যদ্বক্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা

লোকে জইফসল তুলতে বেরিয়ে পড়েছে। জানি না আমার ছাদের ওপর কে জোরে কথা বলল। আর এই তো আমার

দোরগোড়ায় রাজারা বসে রয়েছেন। আর রাজাদের টেবিলে বসে ভোজন করছে রাজদূত। (আমার অন্ন দিয়ে ওদের সেবা হোক!) প্রবল স্রোত বেয়ে নামছে ওজন-মাপের যাচাইকর, যত রকমের মরা পোকার জঞ্জাল

আর খড়ের কুচি তার দাড়ির মধ্যে।

আহা, তোকে দেখে অবাক হয়ে যাই, সূর্য। তুই আমাদের এত মিথ্যে কথা বলেছিস!... বিবাদ আর বিভেদের চক্রান্তকারী! নিন্দা আর কলঙ্কভুক, ও মারকুটে! আমার চোখের বাদাম ফাটিয়ে দে! চুনকামের চমৎকারিত্বের মধ্যে হৃদয় আমার ফুর্তিতে মুচমুচ করে উঠেছে, পাখি গাইছে, 'ও স্থবিরতা'। স্রোতগুলি শুয়ে আছে তাদের বিছানায় মেয়েদের কান্নার মতো আর পৃথিবী ক্রমশ

লাল রং করা ভেড়ার চামড়ার চেয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে!

হ্যা, স্বরূপদর্শার চেয়ে কত বেশি ছড়ানো আমাদের দেয়ালে দেয়ালে সেই সব পাতাগুচ্ছের গল্প আর কত বেশি পরিষ্কার সেই জল, ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ, দেওয়া হোক তাদের কেন না তারা স্বপ্ন নয়! মিথ্যায় ভরা আমার অন্তর, বচনকৌশল নামক বৃত্তির আড়ালে চঞ্চল আর বলবান সমুদ্রের মতো। উগ্র গন্ধ আমার চারপাশে। আর পদার্থের বাস্তবতার ওপর উঠে আসে সংশয়। তবে কারুর বিষাদ যদি বেশি পছন্দের হয়, তাকে দিনের আলোয় নিয়ে আসা হোক! এবং আমার অভিমত এই যে, হত্যা করা হোক তাকে, না হলে জেগে উঠবে রাজদ্রোহ।

উচিত কথা হল, আমরা তোকে গণনাতীত মুনাফার কথা জানিয়ে দিচ্ছি, বাচস্পতি! প্রণালীর মধ্যে দুরাচারী সমুদ্র এমন কড়া বিচারকের কথা ভাবেনি! আর মদে চুর হয়ে মানুষ তার পাশবিক মন নিয়ে কালো মাছির মতো ভনভন করতে করতে এই সব কথা শুরু করে: '...গোলাপ, বেগুনি-লাল আনন্দ আমার বাসনায় বিস্তৃত পৃথিবী, আর আজ সন্ধ্যায় কে তার সীমা নির্ধারণ করবে? ...জ্ঞানীর হৃদয়ে হিংসা, আর আজ সন্ধ্যায় কে তার সীমা নির্ধারণ করবে?...' আর একজন, একজনের ছেলে, দরিদ্র মানুষ,

এদের ওপর এসে বর্তাল সংকেত আর স্বপ্নের ক্ষমতা।

'সেই পথগুলি খুঁজে বার করো যেখান দিয়ে গোড়ালির হলুদ রং দেখিয়ে প্রস্থান করে সকল জাতির জনমানব: রাজকুমারেরা, মন্ত্রীরা, কর্কশকণ্ঠের নেতৃবৃন্দ যারা মহৎ কাজ করেছে আর যারা স্বপ্নে এটা-সেটা দেখে।... পশুদের প্রতি নারীদের লোভের বিরুদ্ধে যাজক বিধান দিয়েছেন। ভাষা নিয়ামক খোলা মাঠে একটি স্থান নির্বাচন করছেন তাঁর বিতর্কের জন্য। প্রাচীন বৃক্ষের গায়ে দর্জি টাঙাচ্ছে এক সুন্দর মখমলের নতুন পোশাক। আর গনোরিয়ায় কলুষিত লোকটি পরিষ্কার জলে তার কাপড় কাচছে। রুগ্ণ ঘোড়ার জিন খুলে পুড়িয়ে দেওয়া হল আর সেই গন্ধ গিয়ে পৌঁছল পাটাতনে বসা মাঝির কাছে,

ভালই লাগল তার।'

লোকে জইফসল তুলতে বেরিয়ে পড়েছে। উগ্র গন্ধ আমার চারপাশে, আর জবালের চেয়েও নির্মল জলে অন্য এক যুগের সংবাদ আসে... খরার বছরে দীর্ঘতম দিন ঘাসের নীচে ধরিত্রীর জয়গান করতে করতে, আমি জানি না কে সেই শক্তিমান আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। আর বালির নীচের মৃতদেহগুলি আর মূত্র ও মৃত্তিকার লবণ, এদের নিয়ে, যেমন ভূমি দিয়ে, তৈরি শস্য পাখিদের দেওয়া গেছে। আর আমার প্রাণ, আমার প্রাণ মৃত্যুর দরোজায় সশব্দে প্রহরা দিয়ে যায়— কিন্তু রাজপুত্রকে চুপ করতে বলো: বর্শার ফলকে গাঁথা,

আমাদের মধ্যে,

এই ঘোড়ার খুলি!

৪. নগরপত্তন

দুনিয়ার এই তো নিয়ম এবং এর প্রশংসা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার — নগরীর পত্তন। পাথর আর ব্রোঞ্জ।

ভোরবেলা কাঁটাঝোপের আগুন

বিরাট সবুজ পাথরগুলোকে করে দিয়েছে নিরাবরণ,

আর তেল-চুকচুকে, যেমন মন্দিরের গর্ভগৃহ আর পায়খানার মেজে,

আর সমুদ্রে স্থিত নাবিকের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আমাদের ধোঁয়া, সে দেখলো যে শিখর অবধি পৃথিবী তার আদল বদল করে নিয়েছে (দূর থেকে দেখা চাষের জন্য জঙ্গল পোড়ানো জমি আর পর্বতের ওপর জীবন্ত জলধারাকে বশে আনার কর্মকাণ্ড)।

এইভাবে এক নগরীর জন্ম হল আর তাকে রাখা হল প্রভাতবেলায় ওঠে এক পবিত্র নাম দিয়ে। পাহাড়ের ওপরে শিবিরগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর আমরা যারা ওইখানে কাঠের গ্যালারির ওপর বসে আছি,

খালি মাথায় আর খালি পায়ে পৃথিবীর অম্লানতার মধ্যে,

নিজেদের জায়গায় ঠায় বসে তা হলে আমাদের হাসির কী আছে, ছুঁড়ি আর খচ্চরদের তীরে নামা দেখে তা হলে এত হাসির কী আছে আমাদের?

আর কীই বা বলার আছে ওই লোকগুলোর কথা যারা ভোরবেলা থেকে পালে নীচে বসা? — ময়দার পৌঁছ সংবাদ! ...আর সাদা ময়ূরের মতো আকাশের নীচে ইলিয়নের চেয়ে উঁচু

জাহাজগুলো সীমান্ত ছাড়াবার পর থামল সেই বদ্ধ জলায় যেখানে একটা মরা গাধা ভাসছে। (এই বিবর্ণ অভাগা নদীর ভবিষ্যৎ আমাদের মীমাংসা করতে হবে — আপন রসে মজে যাওয়া ঝিঁঝিপোকার মতো তার রং)।

অনাতীরে বিপুল নবজাত কোলাহলের মধ্যে কর্মকারেরা তাদের আগুনের প্রভু! চাবুকের শব্দে অস্ফুট দুঃখবোঝাই ঠেলাগাড়িগুলি খালাশ হচ্ছে নতুন নতুন রাস্তায়। ও খচ্চর, তামার তরোয়ালের তলায় আমাদের ছায়া! হাতে-হাতে বাঁধা চারটে ছটফটে মুখু নীলের পটভূমির ওপর জীবন্ত এক স্তবক রচনা করে আছে। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাগণ উপযুক্ত জমি পছন্দ নিয়ে মতামত জানাতে গাছের নীচে জড়ো হয়েছেন। তাঁরা আমাকে গৃহগুলির উদ্দেশ্য আর অর্থ বোঝান: একদিক সুসজ্জিত, একদিক চাপা, লাল মাটির বারান্দা, কালো পাথরের ভেতরঘর আর গ্রন্থাগারের জন্য উজ্জ্বল প্রতিবিম্বময় সরোবর, ওষুধ-বিষুধ রাখার জন্য ঠাণ্ডা গৃহ। আর অমনি চাবিতে ফুঁ দিতে দিতে হাজির হয় তেজারতি কারবারিরা। তার আগেই একটা লোক রাস্তায় রাস্তায় একা গান গাইছিল, সেই দলের একজন যারা কপালে তাদের ঠাকুরের তিলক আঁকে। (এই জঞ্জালভরা জায়গায় অবিরাম পোকাদের কটকট শব্দ)... এটা অবশ্য তোমাদের কাছে বলার জায়গা নয়, কী করে ওপারের লোকেদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হল, মশকে ভরে জল দেওয়া, বন্দরের কাজে অশ্বারোহী বাহিনীর অবদান আর রাজপুত্রদের মাছ দিয়ে টাকা শোধ করার গল্প। (এক বালক — বাঁদরের জীবনাবসানের মতো বিঘ্ন — ভারি সুন্দরী ছিল তার দিদিটা — গোলাপি চকচকে রেশমের জুতোয় করে আমাদের জন্য এনে দিয়েছিল একটা তিতিরপাখি।)

...নিঃসঙ্গতা। বিপুলাকার সামুদ্রিক পাখির পেড়ে দেওয়া নীল ডিম, আর সোনালি লেবু ছড়ানো প্রভাতের উপসাগর! — সে ছিল গতকাল। পাখিটা চলে গেছে!

আগামীকাল অনেক উৎসব, ঢের হট্টগোল, প্রশস্ত রাস্তায় লাগানো খোসাওলা ফলের গাছ, আর ভোরবেলায় ঝাড়ুদারদের প্রকাণ্ড সব তালগাছের মরা টুকরো টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া, অতিকায় ছিন্ন ডানার মতো... আগামীকালের উৎসব,

বন্দর শাসকদের নির্বাচন, শহরতলির শোরগোল আর, ঝড়ের কবোষ্ণ শুশ্রূষার মধ্যে,

ছায়ায়, আধোঢাকা হলুদ নগরী, — তার জানলায় জানলায় ঝুলন্ত বালিকাদের ইজের।

• • • • •

...তৃতীয় চান্দ্রমাসে যারা পাহাড়চূড়া পাহারা দিত, তারা তাদের তাঁবু গুটিয়ে ফেলল। বালুতটে পোড়ানো হল এক রমণীর লাশ। আর, একজন পুরুষ এগিয়ে গিয়েছিল মরুভূমির সীমানা অবধি — তার বাপের পেশা: আতরের শিশি কেনাবেচা।

৫. নতুন ভূখণ্ড জয় করার আকাঙ্ক্ষা

দূরের ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল আমার মন, তাই কুকুরের ডাকে নগরীর একশো আগুন স্থলে উঠল আবার...

নিঃসঙ্গতা! দলের অমিত্যচারী সহকর্মীরা আমাদের আদব কায়দায় গর্বিত ছিল কিন্তু তৎক্ষণে আমাদের চিন্তাভাবনাগুলো অন্য দেয়ালের তলায় তাঁবু গেড়ে বসেছে:

'আমি কাউকে অপেক্ষা করতে বলিনি... আমি নম্রভাবে তোমাদের সবাইকে ঘৃণা করি... আর তোমরা যে গান আমাদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে গেছ, তা নিয়ে কী আর বলা যাবে?...

স্বপ্নে জনগণের নেতা — তাকে নিয়ে যাওয়া হল কিনা মৃত সমুদ্রে, কোথায় পাব সেই রাত্রিজল যা দিয়ে আমরা চোখ ধুতে পারি?

নিঃসঙ্গতা!... দলে দলে নক্ষত্রেরা পৃথিবীর প্রান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছিল, রাম্নাঘর থেকে এক গৃহস্থ-নক্ষত্রকে তুলে নিয়ে দলে ভিড়িয়ে দিল ওরা।

যূথবদ্ধ স্বর্গের অধীশ্বরগণ আমার ছাদের ওপর যুদ্ধ করছেন আর উচ্চপদের প্রভুগণ এইখানেই তাঁদের তাঁবু গাড়লেন।

রাতের নিশ্বাসের সঙ্গে আমায় এক চলে যেতে দাও, যে রাজপুত্ররা প্রচারপত্র ছড়াচ্ছেন তাঁদের মধ্যে, পতনশীল বিমোলিদদের মাঝখানে।...

মৃতদের আলকাতরা — তার নীরবতায় প্রাণের মিলন। ছুঁচ দিয়ে সেলাই করা আমার নেত্রচ্ছদ! আমাদের চোখের পাতার নীচে প্রতীক্ষার জয় হোক!

রাত্রি তার দুগ্ধ দান করছে, ও হে লক্ষ করো। এক আঙুল মধু উড়নচণ্ডের ঠোঁটে বুলিয়ে দাও:

'...নারীগাছের ফল, ও সাবেয়ান!...' যথেষ্ট সংযমী নয় যে

প্রাণ, তার বিশ্বাস হনন করে রাত্রির নির্ভেজাল মহামারী থেকে উঠে এলে,

আমি মনে মনে স্বপ্নের কাণ্ডকারখানার প্রতিবাদ করব, আমি বুনো হাঁসেদের সঙ্গে উড়ে চলে যাব সকালের বাসি গন্ধের মধ্যে!...

—আ! দাসীদের ঘরে যখন ওই নক্ষত্রের শ্লীলতামোচন করা হয়েছিল, তখন কি আমরা জানতাম যে তার আগেই অতগুলো নতুন বর্ষা

গ্রীষ্মের মরুভূমিতে বালুকা-অভিমুখে ছুটেছিল? 'উষাদেবী, আপনি বলছিলেন...' মৃত সমুদ্রদের উপকূলে অভিষেক!

যারা দীর্ঘস্থায়ী ঋতু জুড়ে উলঙ্গ হয়ে শুয়েছিল, তারা দলে দলে মাটির ওপর উঠে দাঁড়াক—দলে-দলে উঠে দাঁড়াক আর চিৎকার করে বলুক

যে এ এক উন্মাদ জগৎ! ...হলুদ আলোয় ওই বুড়ো লোকটা চোখ পিটপিট করছে, ওই নারী গা ছড়িয়ে দিয়েছে নিজের নখের ওপরে,

আর ওই পিচ্ছিল-দেহ ঘোড়ার ছানাটা এগিয়ে এসে বালকের হাতে তার লোমশ থুৎনিটা গুঁজে দিচ্ছে, যে, বালক তখন, স্বপ্নের মধ্যেও, তার একটা চোখ গেলে দেয়নি...

'নিঃসঙ্গতা, আমি কাউকে অপেক্ষা করতে বলিনি... আমার যখন ইচ্ছে তখন ওই দিকে চলে যাব...'—আর সেই পরদেশি

নতুন ভাবনায় সেজে, নীরবে, আরও অনেক সঙ্গী সংগ্রহ করে যাচ্ছে: এক রকম লালায় টলটল করছে তার চোখ,

তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আর এই সংসার তার শস্যের ডানায় ভর করে ভাবনায় মগ্ন কবির মতো, চলেছে...

৬. রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ও রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা

মহান ফৌজি প্রশাসনে সর্বশক্তিমান, আমাদের সঙ্গে হাওয়ার মতো সূক্ষ্ম রেশমি জালের পোশাক-পরা আমাদের সুগন্ধ মেয়েরা,

আমরা উঁচু-উঁচু জায়গায় আমাদের সুখের জাল পাতলাম।

প্রাচুর্য আর সুস্থতা, সুখ! আরও যতদিন আমাদের গেলাসে গেলাস চলতে পারে বরফের টুংটাং—মেমনের গানের মতো...

আর ছাদের কোণে নানাপ্রকার আলোর বিভ্রম, দাসীদের হাতে-ধরা বিশাল বিশাল সোনার থালা পৃথিবীর প্রান্তে মরুভূমির একঘেয়েমি মুছে দেয়।

তারপর এল এক পশ্চিমে হাওয়ার বছর, আর আমাদের ছাদের ওপর কালো পাথরের ভারে আটকানো যত ঝকঝকে বাণিজ্যবেলুন, সব পূর্বব্যাদিতের আনন্দ দানে বিসর্জিত হল। অন্তরীপের তীরে অশ্বারোহীরা উজ্জ্বল ঈগলদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আর বর্শাফলকে গাঁথা সুসময়ের বিশুদ্ধ সর্বনাশ ভোজন করে সমুদ্রের ওপরে এক জ্বলন্ত ইতিবৃত্ত প্রকাশ করে গেল:

অবশ্যই! ইতিহাস, সে মানুষের জন্য, শক্তির গান, সে মানুষের জন্য, যেন লৌহবৃক্ষের ওপর দূর-দূরান্ত থেকে ধেয়ে আসা প্রচণ্ড কম্পন! ...অন্য তীরে চালু হয়েছে বিধান, দুশ্চরিত্রজনের সমাজে অনূঢ়াদের জন্য শুরু হয়েছে ঘটকালি, সূর্যের স্ফীতির নীচে নিলাম হয়ে গেছে বিশাল সব ভূখণ্ড, উঁচু উপত্যকাগুলিকে শান্ত করা হয়েছে, আর গোলাপের গম্ভীর গন্ধে নির্ধারিত হয়েছে গ্রামাঞ্চলের মূল্য...

জন্মের সময় যারা এমত আগুনের তাপ একটুও অনুভব করেনি, আমাদের সঙ্গে তাদের কীসের সম্পর্ক? জীবিতদের বাণিজ্যে অংশ নিতে পারবে তারা? 'অনুপস্থিতির ওপর রাজত্ব করা—সে তোমার ব্যাপার, আমার কাজ নয়...' আমরা যারা ওখানে ছিলাম তারা সীমান্তে অপূর্ব সব দুর্ঘটনা ঘটিয়েছি, আর ঝাঁপিয়ে পড়েছি আমাদের কর্মকাণ্ডে শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত, তোমাদের মধ্যে থেকে আমাদের উল্লাস ছিল এক বিপুল উল্লাস:

'পর্বতের উপত্যকায় বসতি করেছে এই জাতি, আমি জানি, ঘোড়সওয়াররা সজীব শস্যক্ষেত্রের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছে। যাও, তাদের গিয়ে বলো, আমাদের সঙ্গে দৌড়বার বিপদ অনেক। অসংখ্য অপরিমিত কীর্তি, দুর্নিবার আর অবক্ষয়ী সংকল্প, এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জে দ্রাক্ষাগুচ্ছের মতো নেশার্ত মানুষ যেন... যাও, ভাল করে বুঝিয়ে বলো: আমাদের হিংস্র অভ্যাসের কথা, বিদ্রোহের বীজের ওপর দাঁড়ানো আমাদের সংযত আর ক্ষিপ্র ঘোড়াদের কথা, আর দিনের উষ্মায় আঘ্রাত আমাদের শিরস্ত্রাণগুলির কথা... নিঃশেষিত দেশগুলিতে যেখানে নতুন করে প্রচলন করতে হবে কুলপ্রথা, কত-না পরিবারকে গড়ে তুলতে হবে খাঁচায় শিস দেওয়া পাখিদের মতো, তোমরা আমাদের দিকে নজর রেখো, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে, বিশাল সব আচ্ছাদনের তলায় বহু জাতিকে জড়ো করার পদ্ধতিতে, উচ্চস্বরে ঘোষণাপত্র পাঠ করার কাজে, এবং আমাদের বিধান অনুসারে কুড়িটি জাতি সব ভাষায় কথা বলতে সক্ষম...

'আর তোমরা তো জেনে গেছ ওদের প্রিয় গল্প: মৃত্যুহীন পথে দরিদ্র সব অধিনায়কেরা আমাদের প্রণাম জানাতে এগিয়ে আসা দলবদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, তাদের লাঠির ডগায় যার যার

দেবতাকে নিয়ে যত শক্তিমান পুরুষের দল, আর উত্তরের বালুচরে হৃতরাজ্য সব রাজপুত্রগণ, তাদের গলগ্রহ কন্যারা আমাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তা, আর সেই প্রভু যিনি বলছেন: আমার ভাগ্যে আমার আস্থা আছে...

'তা নইলে তোমরা ওদের কাছে শান্তির অবদানগুলির বিবরণ দাও: সচ্ছলতা অধ্যুষিত দেশে বাণিজ্যকেন্দ্রের আর বিবাহযোগ্যা নারীদের ঘ্রাণ, তালপাতার নীচে আঙুল চেপে রাখা স্বর্ণমুদ্রার বিশুদ্ধ টংকার, উগ্র মশলার ওপর দিয়ে জনতার হেঁটে যাওয়া—ফৌজি অনুদান, নদীর মোহনায় গুরুত্বপূর্ণ সব পণ্যের বহর, আপন কন্যাসন্তানদের ছায়ায় বসা প্রভাবশালী প্রতিবেশীকে সংবর্ধনা, আর স্বর্ণপত্রে পত্রালাপ, মিত্রতা আর সীমান্ত নিয়ে চুক্তি, স্রোতধারা রোধ করার উদ্দেশ্যে জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্মেলন, আর উদামী অঞ্চলগুলির ওপর জরিমানা চাপানো! (জলাধার নির্মাণ, শস্যের গোলা, ঘোড়সওয়ারদের জন্য বাসগৃহ—উজ্জ্বল নীল রঙের চৌকো টালি আর গোলাপি রঙের ইঁটের রাস্তা—ধীরে সুস্থে মালপত্রের গাঁটরি খোলা, মধুগোলাপের মোরব্বা আর সেনাবাহিনীর মালপত্রের মধ্যে আমাদের জন্মানো ঘোড়ার ছানা—ধীরেসুস্থে মালপত্রের গাঁটরি খোলা—আর আমাদের স্বপ্নের আয়নায় সমুদ্র যা তরোয়ালে জং ধরিয়ে দেয়, আর, কোনও সন্ধ্যায়, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে অবতরণ, আমাদের নিদারুণ আরামের দেশ অভিমুখে যাত্রা, আমাদের সুঘ্রাণ মেয়েদের দিকে, যারা তাদের রেশমি জালের মতো নিঃশ্বাসে আমাদের তৃপ্ত করবে...')

—এইভাবে এক-একদিন আমাদের সীমা অদ্ভুত ভবিতব্যের চাপে আর, দিনের দ্রুত পদক্ষেপে, পৃথিবীর এই ধারে, সে অতি বিশাল, যেখানে প্রতি রাত্রে বিদায় নেয় ক্ষমতা, যেখানে যাবতীয় বিজয়গৌরবের বৈধব্য।

কিন্তু সন্ধেবেলা আমাদের স্ত্রীদের দাসীরা, তাদের হাতে বেগুনিফুল আর কাদার গন্ধ, আমাদের প্রতিষ্ঠা আর সৌভাগ্যের ছকে ঢুকে পড়ত

এবং মরুপ্রতিম উপসাগরের গভীরে এসে স্থান করে নিত শান্ত বাতাস।

৭. নতুন অভিযানের সিদ্ধান্ত

এই হলুদ প্রান্তরে আমরা চিরকাল থাকব না, আমাদের খুশি...

সাম্রাজ্যের চেয়েও বৃহৎ এক গ্রীষ্মকাল মহাকাশের স্তরে স্তরে বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহ ঝুলিয়ে রাখে। প্রকাণ্ড পৃথিবী তার উপরিস্তর নিয়ে গড়ায় যার ফলে ছাইচাপা নিবন্ত আগুনে ফুলকি ওড়ে—গন্ধকের রং, মকরন্দের, বিনাশহীন সামগ্রীর রঙ, গুল্মময় সমস্ত পৃথিবী গত শীতঋতু থেকে খড় তুলে আগুন ধরিয়েছে—আর একলা দাঁড়িয়ে থাকা গাছের সবুজ স্পঞ্জ থেকে আকাশ চুষে যাচ্ছে তার বেগুনি রস।

অভ্রের পাথরময় এলাকা! বাতাসের দাড়িতে এক কণাও খাঁটি শস্যদানা নেই। আর আলো যেন তেলের মতো।—চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে পাহাড়চূড়ার রেখা অবধি আমি নিজেকে যুক্ত করি, চিনতে পারি কানকোর দাগ-লাগা পাথর, আলোর মৌচাকে নীরবতার গুনগুন শব্দ, আর আমার অন্তর এক শলভ পরিবারের জন্য উদ্বিগ্ন হয়...

লোমকাটা কাঁচির নীচে শান্ত আর বাদামি ক্ষতচিহ্নে সেলাই-করা গা, মদ্দা উটেদের মতো পাহাড়গুলো এগিয়ে যাক কৃষি-আকাশের হিসেবের নীচে—নিঃশব্দে তারা চলতে থাকুক সমতলের বিবর্ণ আভায়, আর শেষে পা মুড়ে বসুক, স্বপ্নের ধোঁয়ার মধ্যে, সেই জায়গায় যেখানে মানবজাতি পৃথিবীর মৃত ধুলির মধ্যে নিজেদের ধ্বংস করে।

এই সেই মহান শান্ত রেখাগুলি যা অভাবনীয় দ্রাক্ষাবনের নীলাভায় মিলিয়ে যায়। এই ভূখণ্ড এখানে সেখানে ঝড়ের বেগুনি রঙকে পাকিয়ে তোলে, আর মৃত নদীপথে সেই বালি থেকে উঠে আসে ধোঁয়া যেন ভ্রাম্যমাণ শতাব্দের পুচ্ছ...

মৃতদের জন্য নিম্নস্বর, দিনমানে নিম্নস্বর। মানুষের অন্তরে এই যে মাধুর্য, তার পরিমাপ করা কি সাধ্যের বাইরে? 'তোমার সঙ্গে কথা বলছি, ও আমার মন!—ঘোড়ার গন্ধে আচ্ছন্ন আমার মন।' আর কতকগুলো বড় বড় ভূচর পাখি, পশ্চিমদিকে উড়তে উড়তে আমাদের সমুদ্রের পাখিদের মতো অবিকল একরকম হয়ে যায়।

পুবদিকের বিবর্ণ ওই আকাশ, যেন অন্ধজনের বস্ত্রে ঢাকা এক তীর্থস্থান, শান্ত ঘন মেঘ বিছিয়ে রয়েছে, সেখানে কর্পূরের আর শৃঙ্গের দূষিত আব নড়ে চড়ে... ধোঁয়ার সঙ্গে নিশ্বাসের কাজিয়া আমাদের। পৃথিবী তার কীটপতঙ্গের লোমসহ কাঁটা হয়ে অপেক্ষা করছে... তারপর ধরাধামে অত্যাশ্চর্য অবতীর্ণ হন।...

আর দুপুরবেলায় যখন সমাধিস্তম্ভের ভিত ফাটিয়ে দেয় বদরীগাছ, তখন মানুষ চোখের পাতা বন্ধ করে দেয় আর তার গ্রীবা অবধি মুখ শাশ্বতকালের মধ্যে ঢুকিয়ে শীতল হয়... মৃত ধুলির পরিবর্তে স্বপ্নের অশ্বারোহীদল, বাতাসে বিভ্রস্ত ওরে শূন্য পথ, আমাদের কাছে আয়! কোথায় পাব, কোথায় পাব সেই যোদ্ধাদের যারা নদীগুলিকে তাদের বিবাহবাসরে পাহারা দেবে?

পৃথিবীর সমস্ত লবণ স্বপ্নের মধ্যে কেঁপে ওঠে যখন মাটির ওপর দিয়ে বিশাল জলরাশি বহে যাওয়ার শব্দ হয়। আর অকস্মাৎ, আঃ অকস্মাৎ ওই শব্দ কী চায় আমাদের কাছে? নদীবক্ষের অক্ষিক্ষেত্রে আয়না-বসতি গড়ে দাও, শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে ওরা আবেদন করে যাক! প্রস্তরফলক বসাও আমার গৌরবে, প্রস্তরফলক বসাও নীরবতায় আর এই স্থানগুলি পাহারা দিতে বিশাল জাঙ্গালের ওপর সবুজ ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ারদের শোভাযাত্রা!...

(অতিকায় পাখির ছায়া আমার মুখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল)।

৮. শূন্য মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা

মাদী ঘোড়া বিক্রির নিয়মাবলি। যাযাবর-প্রণীত নিয়মাবলি। আর আমার নিজেরা। (মানুষের মতো গায়ের রং)।

ওই উঁচু চলমান জলোচ্ছ্বাসগুলি আমাদের সঙ্গী, ভূমণ্ডলের ওপর চলমান জলঘড়িগুলি,

আর ওই আনুষ্ঠানিক ধারাবর্ষণ, আশ্চর্য বস্তর, ধুলো আর পোকা দিয়ে বোনা, আমাদের দলের পেছনে পেছনে বালির ওপর দিয়ে মাথাপিছু শুষ্কের মতো চলেছে।

(আমাদের অন্তরের অনুপাতে কত না অনুপস্থিতি পেয়েছিল পরিপূর্ণতা।)

• • • • •

এই পর্ব যে বৃথা হয়েছিল তা নয়, যূথমুক্ত পশুদের পদক্ষেপে (প্রবীণদের মতো চক্ষুবিশিষ্ট আমাদের কুলীন ঘোড়াগুলি) আত্মার অন্ধকার বিষয়ে অনেক কিছুই শুরু করা হল — আত্মার সীমান্ত বিষয়ে গড়িমসি করে অনেক কিছুই দুনিয়াকে ব্যাখ্যার কাছে তুলে দিয়ে গুলতির শোঁ-শব্দ শুনতে শুনতে সেলুসিদদের অপূর্ব ইতিহাস...

উপরন্তু: ওই ছায়াগুলি — পৃথিবীর বিরুদ্ধে আকাশের সত্য-গোপনজনিত ষড়যন্ত্র...

এইরকম মানবসংসারের মধ্য দিয়ে ঘোড়সওয়ার সৈনিকগণ, যাদের মনে কখনও সখনও বাঁধানো ময়নাদের মতো গান তুলেছিল ঘৃণা, তা বলে আমরা কি সুখের নপুংসক শব্দের

ওপর দিয়ে আমাদের চাবুক তুলব? — মানুষ, গমের সঙ্গে মিলিয়ে তোর নিজের ওজন নে। এই দেশ, এ তো আমার নয়। তৃণগুচ্ছের আন্দোলন ছাড়া এ-পৃথিবী কী দিয়েছে আমায়?...

ঠিক সেই জায়গা পর্যন্ত যার নাম নীরস তরুবর:

আর ক্ষুৎপীড়িত বিদ্যুৎ পশ্চিমের সেই প্রদেশগুলির স্বত্ব আমাকে ন্যস্ত করে দিল।

কিন্তু ওই দূরে আছে ততোধিক অবসর, আর স্মৃতি নেই এমন এক বিশাল ঘাসের দেশে, সম্পর্ক নেই, বার্ষিকী নেই এমন সব বছর, ভোর আর দিব্য অগ্নি দিয়ে মাখা (সকালবেলায় একটা কালো ভেড়ার হৃদপিণ্ড উৎসর্গ করা হয়েছে)।

পৃথিবীর পথ, কেউ তোমাদের অনুসরণ করছে। কর্তৃত্ব, পৃথিবীর সমস্ত দিকচিহ্নের ওপর।

ও হলুদ বাতাসের মধ্যে অভিযাত্রী, আত্মার আস্বাদ।... আর সেই বীজ (তোর মতে) ভারতীয় কোবুলুসের, বেঁটে নিলে, পাওয়া যায় নেশা ধরানোর দ্রব্যগুণ।

হিংসার এক মহান তত্ত্ব আমাদের আচরণ নির্দেশ করেছিল।

[কাব্যটির শেষ দুটি পরিচ্ছেদ স্থানাভাবের কারণে প্রকাশ করতে পারছি না বলে আমরা মার্জনাপ্রার্থী। সম্পূর্ণ কাব্যটির দ্বিভাষিক সংস্করণ গ্রন্থ আকারে অবিলম্বে প্রকাশিত হবে — সম্পাদক]

চক্রব্যূহে

সিদ্ধেশ্বর সেন

ব্যূহে তো পড়েছ ঢুকে
নির্গমন পথ কিবা রেখে॥ কথিত

১.
নেই কী সে-চরমের ক্ষান্তি,
ঘোর দুঃসময়ও যাকে মানি!

দিবসে-নিশীথে উদ্‌ভ্রান্তি
বেড়ে যায়, প্রাণের অশান্তি
আকস্মিক-ই, মরুর আসনে ব'সে মৃত্যুতান্ত্রিক

২.
এরা নয়ক' ঠুনকো অভিলাষী,
অভিপ্রায়ে, আয়োজনও লুকোতে জানে

বরং অভ্যুগ্রে ধর্মধ্বজী
বাড়িয়ে নিলে ছায়াযুদ্ধ, মারণে —
ডেকে আনবে শঙ্কিত পরিণামে

মানবতা কী দুঃস্থের গ্লানিতে, তবু মনে-প্রাণে —
বুদ্ধের, মহাত্মার সত্যমেব শরণে
তবে কেন ঘুরে আসি?

যখন পোখরান-ই তাকে হানে
চাগাই-ও সে অনুসরণে —
বিস্ফোরণে উড়ে যায়, পায়ও না শ্রেয় শান্তি

৩.
ঊর্ধ্বে ঘুরছে সর্বগ্রাসের চক্র, সর্বনাশের —
সংহার চেয়ে ঘুরছে

আমিও ঘুরছি, তুমিও
ত্রিপাদ উঠেছে মাথার উপরে
পাতালও পায়ের তলায়, ডুবছে

ঊর্ধ্বে ঘুরছে
'বিনাশ' মন্ত্র-চক্র

৪.
বাণ-ফোঁড়া মারণাস্ত্রে
ভস্মবেশে —
আণবিক বিভাজনে
সংশ্লেষে

মৃত্যু-শ্বসিত বাতাসে
মরু-পাহাড়ের ধূম্রাকাশে

অবলোপের-এ ধ্বংস-চক্র থামাও
আত্মঘাতী,
মন্থন-বিষ নামাও

'নীলকণ্ঠ'-যে উপমা,
জেনো তা মানুষেই বিশ্বাসে॥

কবিতা লেখার যোগ্য পৃথিবী এখন

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কবিতা লেখার যোগ্য পৃথিবী এখন।
কেউ যদি হেসে ওঠে এই ভেবে—
স্বপ্নচারিতার দিন এসে গেছে উড়িয়ে রুমাল;
এখন পৃথিবী কূট দর্শনে হচ্ছে নাজেহাল;
মঙ্গল গ্রহের মাটি ছুঁয়ে ছেনে, জেনে,
অদ্ভুৎ চোখের কোণে তাজ্জিল্যের
তীক্ষ্ণ শর হেনে
ফের বলে—প্রয়োজন ফুরিয়েছে কবিতার, কাল—;
নক্ষত্রবিলাসী হতে কেন লেখো?
আজ স্বপ্নজীবীর আকাল।
আমি বলি: কবিতার এমন সুন্দর শুভক্ষণ
আগে তো আসেনি। আজ স্বপ্ন দেখা বেশি প্রয়োজন।
মানুষ পাথুরে চোখে দেখে মানুষেরে,
নিজের ছায়াকে ভাবে খুনি; ওরা
পিছে পিছে ফেরে,
আতঙ্কিত পায়ে চলাফেরা।
অনিশ্চিত জীবনের অনুভবে যখন
বিভ্রান্ত যুবকেরা,
যুবতীরা আর স্বপ্ন হয়ে নেই যুবকের মনে।
পণ্যজীবী সভ্যতার রূঢ় আক্রমণে
মানুষ যখন হন্যে হয়ে ছুটছে পড়িমরি,
ত্রস্ত দিশেহারা;
সমুদ্র-আকাশ-নদী-পাহাড়-অরণ্য আর সাড়া
দেয় না তেমন ক'রে; শ্বাসরুদ্ধ জটিল পৃথিবী;
একার বিচ্ছিন্নবোধে পীড়িত সাহেব কিংবা বিবি;
সন্তান, সাফল্য পেতে রূঢ় হতে পারে সীমাহীন।
আজ তাই কবিতার দিন—
মৃত্যুকে সরিয়ে কবি আকাশ নক্ষত্র চুঁড়ে
পরিশেষে মেসের আস্তানা
খুঁজে নিতে পারে: তার আবেগ
মেঘের মতো পরিশ্রুত জল
দিতে পারে পৃথিবীকে; শুকনো বালিতে পুঁতে
বীজ, শস্যদানা—
তুলে দিয়ে মানুষের হাতে, নিয়ে লোটা ও কম্বল
হা হা করে হেসে উঠে চাঁদ থেকে খুবলে নিয়ে আলো
দিতে পারে তার চোখে যার দৃষ্টিশক্তিই হারাল!
কবিতায় আছে শূন্যগর্ভ এই জীবনের মানে।
কবি, জীবনের অর্থ পুড়ে খাক হতে হতে জানে—
কেউ তো থাকে না পাশে—মধ্যমাঠে
অনাথ একাকী;
উপরে ব্যথিত শুকনো মায়াময় চাঁদ
শুধু একা জেগে থাকে।
জয়ী তো লেখে না, লেখে বিষণ্ণতা কুরে খায় যাকে।
তবুও সুস্থিত সত্তা, চোখে তবু নির্দ্বন্দ্ব বিস্ময়;
মুগ্ধতাও অন্তহীন; বুকে জ্বলে লাখো লাখো চিতা—
নেভে নাভে না, —সেই আগুনের ফুলকি দিয়ে
লেখে সে কবিতা;
সিসমোগ্রাফের কাঁটা বুকে তার, মৃদু অভিঘাত
পেলে, নড়ে ওঠে; আর
উজান সাঁতরে যদি ভেরে যায় হাত,
মৃত্যুকে দেখেও, দেখে শ্মশানেও পোড়া গাছপালা,
ভাবে—মৃত্যু? নেই। খড়ে উড়ে গেলে চালা
মানুষের ছায়া পেলে ঢুকে পড়ে ছায়ার ভিতরে।
যদি
দরজায় বিকট শব্দে ঝড় আছড়ে পড়ে,
দেখেও সে ঝড়কেই, 'এসো' বলে করি আমন্ত্রণ;
সে যদি কবিতা লেখে, তাকে আজ বড় প্রয়োজন।

প্রাণমন মাতানো অন্ধকার

মেঘ মুখোপাধ্যায়

প্রাণমন মাতানো অন্ধকার আবার এল

আবার এল প্রাণমন মাতানো অন্ধকার
আমার ভর সন্ধের জানালায়
খোলামেলা হাওয়ায় তার চুল উড়ছে মাঠময়
যতদূর চোখ যায়

ওলো এলোকেশী আঁধার,
তোকে কি কখনও বলেছি, সব্বোনাশী?
তবে কেন এলি, কেন এলি
আমার প্রাণে মাতন এনে দুঃখ-দিনের শেষে
ফুরিয়ে দিলি দিনের কান্না গ্লানি

আমি কি এই চেয়েছিলাম? এই কী?
চেয়েছিলাম দুঃখ ভুলে যেতে এতই তাড়াতাড়ি?
যে-যুবারা আলোয় মুখ ধুয়ে দৌড়ে গিয়েছিল
আলোকের ওই ঝর্ণাধারায় চান করবে বলে
আমি তাদের সঙ্গ নিইনি সেদিন

খোলামেলা হাওয়ায় দুরন্ত চুল উড়িয়ে
শরীরময় মত্ত থই থই ঢেউ তুলে
আদিম-গন্ধে পুরা-মানবীর মতো
ঘর ভাসিয়ে দিয়ে আবার এল

আমার পরিতাপের অনুতাপের উচ্ছ্বাসে জল ঢেলে
ক্লেশ বেদনা থিতিয়ে দিয়ে এল অমল অন্ধকার
আমার শরীর সত্তার অন্তঃপুরে
আমার সমস্ত হাহাকারে

দল উপদল

সিদ্ধার্থ সিংহ

কখনও পুকুরের কাদায়, কখনও পানার ঝাঁঝরিতে খলবল করছে
কুচোকাচা মাছ
সেই সব মাছের খোঁজে গোটা পুকুর দাপিয়ে মরছে
মহাশোল আর রাঘব বোয়াল।
আবার বড় মাছেদের জন্য বঁড়শি ফেলে
ক'হাত দূরে দূরে পাড় জুড়ে বসে আছে কত লোক!

সেই লোকজনদের জন্য কোনও বাঘ ওত পেতে নেই
কোনও জ্ঞানবৃক্ষ তার টুকটুকে ফল ডালে করে নুইয়ে দেয়নি নাগালে
কোনও মুনি অপেক্ষা করে নেই যে সামান্য ভুলচুক হলেই অভিশাপ দেবে।

পাড়ে বসা মানুষদের জন্য তাদের ঠিক পেছনেই ঘাপটি মেরে আছে
আরেক দল মানুষ
সেই মানুষদের পেছনে মুখিয়ে আছে আবার আরেকটা দল।

মানুষ এখন এত ব্যস্ত,
শুধু সামনেটাই দ্যাখে, ফিরে তাকানোর ফুরসত কই!

পিছু টান

কিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়

মাটিতেই গেঁথে ফেলি পা দুটি তোমার,
বুকের ওপরে ওঠে, বৃন্ত দুটি দলে-মুচড়ে
ঘাম রক্ত স্নেহ, টেনে টেনে আনি।
রাত্রে পেঁচা ডাকে, চকিত চোরের আনাগোনা,
বিছানা ভিজিয়ে শুয়ে ও আমার সোনা।
দু' চোখের পাতা ছিঁড়ে আগুন-ঝালিয়ে করো ভোর,
নিয়মের প্রত্যূষ জাগে অলস আবেশে খোলে দোর।
হেমন্তে শিউলি ফোটে রাতচরা পাখিদের মতো
আমিও অমনি করে খুঁজে যাই যা হয়েছে গত।
তুমি দ্যাখো কালের ভেতর থেকে আড়ভেঙে
স্বাধীনতা জাগে,
যেমন করে বীজতলা থেকে ধান,
উত্তপ্ত জন্মায়ু থেকে সদ্য ফোটা নবীন শরীর
সমুদ্র-দিগন্ত থেকে ঘাই মেরে উঠে আসে ভোর;
কিন্তু তখনও তুমি প্রসবের লোভে আপ্রাণ....

মাটিতেই গেঁথে যায় পা দুটি তোমার।
এগোতে দেয় না ওই মাটি,
মাটিতেই জন্ম আর মৃত্যু বারবার।

একটি পাতা তোমার

মৌলিনাথ বিশ্বাস

একটি পাতা সমুদ্র-বালি ছোঁয়
একটি পাতা ঝড়ের সাথে দোলে
একটি পাতা ঘূর্ণিবায়ু আনে
একটি পাতা বন্ধুর কথা বলে

একটি পাতা বুকের মাঝে থাকে
একটি পাতা ঋণা হয়ে ভাসে
একটি পাতা পথের 'পরে ঝরে
একটি পাতা অবুঝ, ভালবাসে

একটি পাতা মনের মাঝে সুর
একটি পাতা সূর্য খেয়ে বাঁচে
একটি পাতা শূন্য দিনলিপি
একটি পাতা পোড়ে চুলার আঁচে

একটি পাতা সীমান্ত গান গায়
একটি পাতা বিপন্ন মধুমাস
একটি পাতা তোমার, তুমি নাও
একটি পাতা পরম সর্বনাশ।

আজকের দিন

সন্দীপ চক্রবর্তী

আজকের থেকে কিছু তুলে রেখে কালকের কথা ভাবার
অভ্যাস গড়ে ওঠেনি
যৎসামান্য গোলাপ বাগানে ফুটিয়ে
যতটা তৃপ্তি পেয়েছি ততটা আকাশ কুসুমে জোটেনি।

এ বয়সে ভারী অন্যায় হবে যদি
রাজা হতে চাই ইচ্ছার বিপরীতে
কত নির্দয় আগুনে পুড়েছে স্মৃতি
অনেক পাথর পথ চেয়ে আছে হেলায় গুঁড়িয়ে দিতে।

কী পেলে পূর্ণ হতে পারে সাধ তাও যদি কেউ জানত
তা হলে বোধহয় প্রতিপদে থেমে বাঁচাতে হত না পুঁজি
কিছুটা পাবার আনন্দে লোকে ভেবেই পেত না কেন
সোনার হরিণ পাবার জন্য প্রাণপণ খোঁজাখুঁজি।

আজকে তো আছি, জানি না কালকে থাকব কি না
ঠুনকো সময় আঁকড়ে ধরার মতো কিছু দিতে পারেনি
জীবনযাপন নেশায় জড়িয়ে রেখে
সম্পর্কের দখল নিয়েছে জুয়াড়ি
ভালবাসা কড়া নাড়েনি

বেড়ে ওঠা ক্ষতচিহ্নগুলিকে না দেখার ভান করে
চাই না ভাল থাকতে
নতুনের পা পড়ে যদি পথ আবার দেখাবে স্বপ্ন
তার আগে চাই বর্তমানকে সুন্দর করে রাখতে।

শান্তিনিকেতনের দিনগুলি

গৌরী আইয়ুব

[গত সংখ্যার পর]

প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে জেনেছিলাম, বকুল ফুল একবার ফোটে বর্ষায়, একবার শীতে। আর যে ছাতিম ফুল বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে প্রায় প্রতীকী ভূমিকায় আছে, সেই ছাতিমপাতা নাকি প্রাচীন গ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ভাবে ব্যবহার করা হত।

আমার সেই অধ্যাপক, অসমবয়সী বন্ধু আমার জীবনে যে চারিত্র্যমাধুর্য, বিশ্বচেতনা, আর রসবোধ দান করেছিলেন, তা স্মরণ করলে আজও অভিভূত হই। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু প্রশ্ন করে মনটাকে ভরিয়ে দিতেন। একদিন তাঁর বাড়িতে পা দিতেই প্রশ্ন করলেন, 'গৌরী, সুখ আর আনন্দের তফাতটা কী?'

একটা আনন্দের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। সেবার গরমের ছুটিতে দেবীপদদা — অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতনে এলেন প্রবোধ সেন মশাইয়ের বাড়িতে। তিনি বহু বছর আগে প্রবোধবাবুর ছাত্র ছিলেন। সে সময় থেকে এই অধ্যাপক তাঁর পিতৃতুল্য এবং তাঁর সংসারটি দেবীদারও যেন নিজের বাড়ি বলে মনে হত।

এই সময় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। একদিন প্রস্তাব করলেন, রেবাদি ও আমাকে এলিয়ট পড়াবেন, যাতে আধুনিক ইংরেজি কবিতা সম্পর্কে আমাদের ভুল ভেঙে যায়।

আমরা প্রথমে পড়লাম: The love song of Alfred Prufork—প্রথমটায় এর ভাষা, এর উপমা সবই যেন কেমন দুর্বোধ্য অদ্ভুত ঠেকত। কোনওদিন তো শুনিনি যে সন্ধ্যাটাকে মনে হচ্ছে কোনও 'etherised patient on the operation table' আর কবিতার প্রবীণ নায়ক যেন জীবনটাকে Coffee Spoon দিয়ে মেপে চলেছেন।

একে একে আরও দু-তিনটি কবিতা পড়া হয়ে গেল। এই আনন্দসংবাদ যখন আবু সয়ীদ আইয়ুবকে জানিয়েছিলাম, তখন তিনি কিন্তু একটু আহত হয়েছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল। লিখেছিলেন, 'আমিও কিন্তু ভালই পড়াতে পারতাম তোমাকে।'

ওদিকে দেবীপদদা কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় জেনে গিয়েছিলেন যে অধ্যাপক আইয়ুব আমাদের দর্শন পড়াচ্ছেন এবং আমাদের প্রিয় অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। দেবীপদদা তখন যাকে বলা হত প্রগতিপন্থী বা মার্কসপন্থী তাই ছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব তখন তাঁদের চোখে প্রগতিবিরোধী বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন। তাই অধ্যাপক আইয়ুব সম্বন্ধে তাঁর মন বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। দেবীপদদা কলকাতা ফিরে যাওয়ার পরে খুব সুন্দর হাতের লেখায় একটি চমৎকার চিঠি লিখেছিলেন।

আমি তার উত্তর দিতে গিয়ে কি এক প্রসঙ্গে, আজ আর মনে নেই, আইয়ুবের ব্যবহৃত একটি শব্দবন্ধ 'মহৎ বেহায়াপনা' ব্যবহার করেছিলাম। সেটা পড়ে দেবীপদদা বেশ রুষ্ট হয়ে লিখেছিলেন, 'আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রভাব তোমার উপর কতখানি পড়েছে, তা বুঝতে পারলাম ওই শব্দ ব্যবহারে।'

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল যখন মিলাডার টাইফয়েড হল। সে তো নিজের ঘর ছেড়ে 'সিক রুমে' এসে পড়েছিল, তখন তাকে দেখাশুনা করার মতো বিশেষ কেউ ছিল না হসটেলে। তাই ছোটদের বিভাগের সুধাদিকে সাহায্য করবার জন্য আমি দায়িত্ব নিয়েছিলাম মিলাডাকে স্পঞ্জ করা, পথ্য তৈরি করে খাওয়ানো, তাকে কিছুটা সঙ্গ দেওয়ার জন্য। ফলে সে সময় ওকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ ঘটেছিল। এদেশ ছেড়ে ওর চলে যাওয়ার পরও কোনওদিন আমাদের সেই বন্ধুত্বের বাঁধন আলগা হয়ে

যায়নি। আমি উত্তর দিতে পারি বা না পারি, সে আমাকে সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখেই চলেছে।

নির্জন আশ্রমের জীবন আরও পূর্ণ হয়ে উঠল যখন 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকায় অভিনয় করার সুযোগ পেলাম।

বউঠান (প্রতিমা ঠাকুর) কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' করাবেন বলে ঠিক করলেন। আমি ছিলাম মালতীর ভূমিকায়। অভিনয়ের দিনে লক্ষ্মীবেশী লাল টুকটুকে বেনারসী পরা গীতু হাতে ঝাঁপি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে ক্ষীরো দাসীকে বর দিলেন, যেন সে রানী হয়। লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হলেন। সিংহাসনে বসে ক্ষীরো 'রানী' মালতীকে হুকুম করল, 'শেখাও কায়দা।'

মালতী সেদিন সগর্বে তার পাঞ্জাবী বান্ধবীর উৎসাহে তার বেনারসী কুর্তা আর গারারা পরেছিল। পোশাকটা এখন বেশি কেউ পরে না। বেশ ফোলা ফোলা পাজামা, আর হাঁটুর কাছে আরেক থাক কুঁচি দেওয়া ঝুল। ওটাকে পাজামা বলে মনে হত না, মনে হত যেন ঘাঘরা। তখনকার দিনে ওই পোশাক পরে বেগম লিয়াকাত আলী বিলেতেও যেতেন। অচিরেই তাঁর স্বামী নিহত হওয়ার পরে সেই সদা-হাস্যময়ী সুন্দরীর কী হয়েছিল জানিও না। আর কোনওদিন তাঁর ছবি খবরের কাগজে দেখতে পাইনি।

আমার সেদিনের সেই সজ্জা বিশেষ কেউ দেখল না বলে দুঃখ হচ্ছিল। বিশেষ মানুষটি তখন গরমের ছুটি উপভোগ করছেন কলকাতায়। সখেদে ভেবেছিলাম, বেশ হয়েছে। কিন্তু কার যে বেশি 'বেশ হয়েছিল,' সে হিসেব-নিকেস করা কোনওদিন সম্ভব হয়নি।

পরদিন কিন্তু অবাক করে দিল প্রথম বর্ষ কলাভবনের অং সো। সে যে দর্শককুলের পেছনে বসে বসে স্কেচ করেছিল কে জানত। আমি দেখে তাকে বললাম, 'আমাকে দাও না।'

সে বলল, 'এখন না, আগে ওটাকে ফিনিস করতে দাও।'

সে অল্প কথার মানুষ ছিল। তা ছাড়া আমি কোনওদিন কোনও কিছু আদায় করার জন্য কারুর উপর চাপ দিইনি। ক'দিন পর সত্যিই যখন ছবিটাকে ঘষে মেজে এনে দেখাল, আমি লোভীর মতো বলতে চাইছিলাম, 'আমাকে দেবে?'

কিন্তু সে কথা না বাড়িয়ে বলল, 'এটা আমার।' ও খুব ভালই বুঝতে পারছিল, আমি কাকে ছবিটা দেখাবার জন্য পাগল হচ্ছিলাম।

প্রায়ই ওর সঙ্গে মাটির বাড়ি ব্ল্যাক হাউসের সামনে জাম গাছের তলায় পা-ছড়িয়ে বসে অল্প কথায় অনেক গল্প হত। আমার মনে হয় বর্মীরা এমনিতে কম কথা বলেন, হাত চালান বেশি। অং সো বেচারা কোন ভাষাতেই বা গালগল্প করবে! সে বাংলা শেখেনি। অল্প কিছু ইংরেজি সম্বল। কাজেই ভাষার অভাব নানারকম নাটকীয় স্বরক্ষেপণ দিয়ে খানিকটা পুষিয়ে দিত। বেচারা খানিকটা সংসার-বৈরাগ্য নিয়েই চলে এসেছিল কারণ সে ছিল বিবাহিত। ওদের দেশের প্রথানুযায়ী সে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। প্রথম প্রথম শাশুড়ি খুবই জামাই আদর করতেন, 'বা অং সো' 'বা অং সো' (বাবা/বাছা) করতেন। কিন্তু অল্পদিনেই শাশুড়ির স্বর ভারি ও কর্কশ হয়ে গেল, তখন তিনি হাঁক দিতেন, 'অং সো—'। জামাতার অভিনয়ে আমার কাছে ছবিটা স্পষ্টই হয়ে গিয়েছিল।

একটা সরকারি স্কলারশিপ লাভ হওয়ায় বিশ্বভারতীতে কলাচর্চা করতে সুযোগ পেয়েছিল। সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে হালকা তন্ত্রিতল্লা বগলদাবা করে দমদমে এসে নেমেছিল।

শান্তিনিকেতনেও খুব বেশি বন্ধু তার হয়নি। আমি অল্প একটু বন্ধুত্ব করাতেই সে বর্তে গিয়েছিল। আমার বিকেলের সঙ্গিনী রেবা সেনকেও তার খুব পছন্দ হয়েছিল। এক আধ দিন আড়ালে বলেছিল, 'রেবাদিকে আমার বেশ ভাল লাগে, মনে হয় যেন আমাদের দেশের মেয়ে।'

বছর দুয়েক পরে সে মস্কো চলে গেল। পথে করাচিতে খানিকক্ষণ থেমেছিল। সেই অভিজ্ঞতা এয়ার লেটারে দু-পৃষ্ঠায় কয়েকটি ছোট ছোট স্কেচ এঁকে জানিয়েছিল। সেই চিঠি আজও খুঁজলে আমার ছিন্নপত্রের ঝাঁপিতে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু এখনই খুঁজে এই কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই এই রোগজীর্ণ দেহে। তাই দু-একটি অক্ষম শব্দে সেই আশ্চর্য চিঠির বর্ণনা করি। প্রথম পৃষ্ঠার স্কেচে একটা বেঞ্চে তার তন্ত্রিতল্লা কালের উপর নিয়ে বাঁ হাতের উপর মুখ রেখে সে ভাবছে কেমন এই দেশটা। তার সামনে একটা সুন্দর বোরখা এসে দাঁড়াল। সে সোল্লাসে বোরখার তলায় যে মুখখানি দেখবে তা কল্পনা করাই। পরের পৃষ্ঠার স্কেচে বোরখার নেকাব উঠে গেল। বেরিয়ে এল একটা দাঁত বার করা বুড়ির মুখ ভাঙাচানি! অং সো বগলের তলায় তন্ত্রিতল্লা নিয়ে ঝুঁকে অবাক হয়ে ভাবছে, এ কী হেরিলাম!

আমার কাছে তার খুব বেশি স্মৃতি নেই। একটা অটোগ্রাফ খাতায় দু-পৃষ্ঠা জুড়ে বর্মী ভাষায় কী সব লেখা ছিল। যখন জিগ্যেস করেছিলাম, 'কী লিখেছ?', সে বলেছিল, 'অত তোমার জানবার দরকার নেই। যদি সত্যিই জানতে চাও, একদিন না একদিন কেউ তোমাকে পড়ে বুঝিয়ে দেবে।' এখনও পর্যন্ত কাউকে পাইনি যাকে বলতে পারি, 'দে পড়ে দে আমায় তোরা....'

আমার চোখে আজও যা ভাসে, সেটা স্মৃতি নয় কল্পনা। আমি মনে মনে দেখি যেন অং সো সেই তন্ত্রিতল্লা বগলদাবা করে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ক্লান্ত পায়ে মস্কোর ট্রেনের উদ্দেশে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সেই অলৌকিক আকাশযান তাকে কোথায় নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল, আমার জানা নেই।

সেদিনকার শান্তিনিকেতনে আর একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ছিলেন এটা ঘোষ। 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন নাকি কান্তিচন্দ্র ঘোষ। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-এর সম্ভবত প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর সেই ছোট্ট বইটির কবিতা লোকের মুখে মুখে ফিরত। সে বইয়ে কোনও ছবি ছিল না, যেমন কিনা ছিল পরবর্তী নরেন্দ্র দেব, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি অনেক অনুবাদকের বইয়ে। কিন্তু কান্তিচন্দ্রের ভাষার যাদুতে আমাদের মনে কত যে ছবি আঁকা হয়ে যেত।

এই কান্তিচন্দ্র ঘোষকে বিবাহ করে হাঙ্গেরির কন্যা এটাদি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তার কয়েক বছর আগেই তাঁর স্বামী কান্তিচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের শোবার ঘরে দুটি বড় বড় ছবিতে এটাদি আর কান্তিচন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ হতাম। ছবি দুটির বাঁধাইও ছিল দেখবার মতো। চওড়া পালিশ করা আবলুশ কাঠের ডিম্বাকৃতি ফ্রেমে।

তখনও সেই সুসজ্জিত ঘরের প্রায় প্রতিটি জিনিসে যেন কান্তিচন্দ্রের সজীব উপস্থিতি ছিল। এটাদি এমন করেই তাঁর স্বামীর কথা বলতে পারতেন। খাবার ঘরের একটি দেওয়াল জোড়া সরু সেলফের উপরে রকমারি গেলাসের প্রদর্শনী ছিল। আমার কাছে সেটা অভিনব ঠেকত। ক্রমে জানতে পেরেছিলাম, প্রমথ চৌধুরী-গোষ্ঠীর এই মানুষটিও পৃথিবীর যাবতীয় বিশেষ করে ফরাসি আসবাব বিষয়ে অত্যন্ত সুরসিক সুপণ্ডিত ছিলেন।

এটাদি তাঁর বৈধব্যের নিঃসঙ্গ জীবনকে ভরে রেখেছিলেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের দিয়ে। আর উত্তরায়ন। বৌঠান, বিবিদি এঁদের কাছে তিনি ছিলেন ঘরের মানুষ। নানা রকম আনন্দ অনুষ্ঠান কত সহজেই তিনি সাজিয়ে তুলতে পারতেন। আমাদের মতো চোদ্দ পনেরোটি মেয়েকে নিয়ে একবার তিনি হাঙ্গেরিয়ান ফোক ডান্সের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

উত্তরায়নের বড় হল ঘরে যখন তিনি আমাদের তালিম দিতেন, আমরা যে কী আনন্দ পেতাম, বলার নয়। বেশির ভাগ সময় উনি নিজেই পিয়ানো নিয়ে বসতেন। কিন্তু কয়েকবার বিবিদিও পিয়ানোয় বসেছিলেন, মনে পড়েচে। তখন এটাদি আমাদের Wallze-এর ধীর সুন্দর পদক্ষেপও শিখিয়েছিলেন। তাঁর সেই তালিম দেওয়া আমরা যত উপভোগ করতাম, তিনি তার চেয়ে কম করতেন না। গোলগাল মানুষটি ঘেমে নেয়ে উঠতেন, কিন্তু আমাদের ভুল শুধরে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।

তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে বিকেলের চায়ে বা রাত্রের অনাহারে কিংবা কোনও কোনও বিশেষ সন্ধ্যায় ধ্যানের আসরে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তাঁর মোরাম-ঢালা পিছনের বারান্দায় বসলে তখন দিগন্তব্যাপী খোয়াই দেখা যেত। ওঁর সুন্দর বাড়িখানি ছিল উত্তরায়নেরও উত্তরে, তবে গোয়ালপাড়ার পথের অন্য ধারে। কিন্তু আজ সেই উজ্জ্বল ঝলমলে বাড়িখানি ঘিঞ্জি পাড়ার মধ্যে নিজের হতশ্রী মুখখানি লুকিয়ে ফেলেছে। আর খোয়াই লুপ্ত হতে হতে কোথায় চলে গেছে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

তাঁর সহজাত পরোপকারী স্বভাবের জন্য তিনি আইয়ুবের নিজাম ভবনটিকেও গুছিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। মাঝে মাঝে ফরাসিনী মাদমোয়াজেল বুর্দাকে নিয়ে আলাপচারী করতে যেতেন আইয়ুবের কাছে। মাদমোয়াজেল বৌদ্ধ দর্শনের মৈত্রেয়াণ শাখা বিষয়ে গবেষণায় রত ছিলেন। এটাদি মনে করেছিলেন, যেহেতু বিষয়টা দর্শন, তাই আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁকে খুব সাহায্য করতে পারবেন এবং দু-জনের মধ্যে বন্ধুত্ব সহজেই সম্ভব হবে। কিন্তু মাদমোয়াজেল ছিলেন ইংরেজি-বাক্যহীনা। কয়েকবার একটুখানি আলাপচারীর চেষ্টা করে আইয়ুব অসহায় ভঙ্গিতে এটাদিকে বলেছিলেন, 'এভাবে কী করে কথাবার্তা চালানো যাবে ?'

এটাদি আইয়ুবের কথাটা বুর্দাকে ফরাসিতে অনুবাদ করে দিতেই মাদমোয়াজেল গভীর কালো চোখে আইয়ুবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষ কি কেবল কথা দিয়েই পরস্পরকে বোঝে ?' তাঁর ওই ফরাসি বাক্যটি আইয়ুব বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারেননি। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে যথাযোগ্য উত্তর দেবার মতো যথেষ্ট ফরাসি তাঁর জানা ছিল না। অন্য কারণগুলি না-ই বা ব্যাখ্যা করলাম।

একদিন এটাদির বাড়িতে কয়েকজন বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে সন্ধ্যায় চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেটা কোনও একটা দেশের নববর্ষের দিন ছিল। কিন্তু কোন দেশের তা আজ মনে পড়ছে না। তুর্কি গুর্ভা, ফরাসিনী বুর্দা, কয়েকটি আমেরিকান ছেলেমেয়ে, জনা কয়েক সিংহলী এবং ভারতীয় আমরা পাঁচ-ছ জন ছিলাম। তবে এই হইচই-এর মধ্যে আইয়ুবকে সেদিন ডাকেননি। বিদেশিরা বেশ নাচ গান শুরু করে দিয়েছিল। আমরা ভারতীয়রা তখনও এ-বিষয়ে জানতাম না বলেই বোধহয় পরে এটাদি আমাদের নৃত্যশিক্ষা দিতে আগ্রহী হয়েছিলেন। সেদিন আমরা দর্শকের ভূমিকাতেই ছিলাম। কিচেনে খাওয়ার ঘণ্টা পড়লে আমরা ক'জন চলে এসেছিলাম। কিন্তু অন্যদের তখনও আনন্দোৎসবের জের কাটেনি।

দুয়েকবার তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে আইয়ুবকে এবং আমার মতো দু-চারজন ছাত্রছাত্রীকে তাঁর বাড়িতে ডেকেছিলেন। তখন নানা বিষয়ে সুন্দর কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। মাঝে মাঝে আইয়ুব উৎসাহ দেওয়াতে এটাদি নানা দেশের লোকসঙ্গীতও গেয়ে শোনাতেন। ইউরোপের নানা দেশের লোকনৃত্য সম্বন্ধেও

তখন তাঁরই মুখে নানা কথা শুনতাম, কিন্তু সঙ্গী না থাকায় তিনি তার নমুনা বিশেষ পেশ করতে পারেননি, তবে নিজে অল্প স্বল্প নেচে দেখাতেন।

পরে যখন আইয়ুব শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে এসেছিলেন, এবং আমিও শ্রীভবন ছেড়ে মা এবং বোনেদের নিয়ে একটি বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিলাম, তখন আইয়ুবের চিঠি এটাদির ঠিকানাতেও মাঝে মাঝে গিয়ে পৌঁছত — বিশেষ করে তেমন 'সেন্সেরবল' কিছু থাকলে। এটাদি নিজেই সাগ্রহে তার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। উনি যখন কলকাতায় আসতেন, সময় পেলে আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করে আমাকে গিয়ে খবর দিতেন। একদিন সেইসব কথা বলতে বলতে এটাদি বলেছিলেন, 'গৌরী, তুমি তো নিরামিষ খাওয়া পরিবারের মেয়ে, মুসলিম রান্নার কিছুই জানো না। তোমাকে কিন্তু সেসব ভাল করে শিখে নিতে হবে। আমিও হয়ত অল্পস্বল্প শিখিয়ে দিতে পারব।'

কথাটা যখন অধ্যাপককে চিঠিতে জানালাম, তিনি মজা করে লিখলেন, 'এটাদিকে বল যে — The road to my heart is not through my stomach.'

যাই হোক, এটাদির সঙ্গে এক অসমবয়সী সখ্যতা হয়েছিল, যা আমার বিষণ্ণ দিনগুলিকে অনেকখানি শান্ত করে রাখত। মাঝে মাঝে আমার মায়ের অনুমতি নিয়ে রাত্রে তাঁর কাছে থাকতে বলতেন। তিনি নিজেও কত নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন, তা তখন বুঝতে পারতাম। আমরা জ্যোৎস্নারাত্রে বাগানে খাট নিয়ে বিছানা পেতে ঘুমোতাম। হাসিখুশি মানুষটির অন্তরে অশ্রুর যে ফল্গুধারা ছিল, তার পরিচয় পেতে বিলম্ব হয়নি। দুঃখিনী মানুষটি পরবর্তীকালে খানিকটা যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত খুব অসুস্থ শরীরে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন নিষ্কপর্দক অবস্থায়।

আমাদের বিয়ের পরে যখন দেখা করতে এলেন, নিজের মণিপুরী তাঁতে বোনা দুটি শান ব্যাগ উপহার দিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর পরেও সেগুলি কী করে আমার কাছে অমর হয়ে রইল !

তিনি যখন আমাদের সঙ্গে বসে নানা রকম আনন্দের কথাও বলতেন, তখনও মাঝে মাঝে তাঁর জীবনের বঞ্চনার সত্যটা যেন ঝিলিক দিয়ে যেত। কাউকে তিনি সরাসরি দোষারোপ করতেন না। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জেনেছিলাম যে তাঁর প্রবীণ স্বামী তাঁর ইচ্ছাপত্রে জানিয়ে রেখেছিলেন, এটাদি যদি দেশত্যাগ না করেন এবং পুনর্বিবাহ না করেন, তবেই ওই গৃহটির উত্তরাধিকারিনী হতে পারবেন। নয়ত এক ধর্মীয় সেবা প্রতিষ্ঠান লাভ করবে। ফলে শেষবার দেশে ফিরে যাওয়ার পাথেয় নাকি তাঁর মা এবং ভগ্নীরা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে অনেক বন্ধুবান্ধবী পেয়েছিলাম। তাদের অনেকের সঙ্গে আইয়ুবেরও পরিচয় হয়েছিল। একদিন বলেছিলেন, 'তোমার অনেক ছেলে বন্ধু থাকবে এতে আমি অবাক হইনি। কিন্তু তোমার যে এত সব চমৎকার বান্ধবী আছে, তাতে আমার তোমার সম্বন্ধেই আগ্রহ আরও বেড়ে যাচ্ছে।'

আমার পরম সৌভাগ্য যে আজও বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণ স্বাস্থ্যে আমি বন্ধু এবং বান্ধবীদের অকৃপণ ভালবাসা পেয়ে চলেছি। নইলে বেঁচে থাকাই কঠিন হত। সাধারণত বলা হয়, বেশি বয়সে আর গভীর বন্ধুত্ব হয় না। সেটাও ভ্রান্ত বলেই মনে হচ্ছে।

মাস খানিক পরে পুজোর ছুটি সেরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে প্রকৃতিকে অন্য রকম দেখাল। সেই আমলকি ডাল সাজল কাঙাল ঘুচিয়ে দিল সে পল্লবজাল...

একদিকে পড়াশুনা অন্যদিকে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান — দিনগুলিকে একেবারে ভরিয়ে রেখেছিল।

ততদিনে অধ্যাপকদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁদের কাছে আব্দার করাও সহজ হয়েছে। একদিন প্রবাসজীবনদার শেষ বেলার ক্লাস হয়ে যাবার পর তাঁকে আমরা অনুরোধ করলাম, পরদিন বুধবারেই মন্দিরের পরে আমাদের সঙ্গে সারাদিনের জন্য বেড়াতে যেতে হবে। উনি তো এক কথায় রাজি। তখনও আমি জানতাম না গানে গল্পে আবৃত্তিতে কেমন মাতিয়ে রাখতে পারেন তিনি।

রবিদাকে বলে মাখন-লাগানো রুটি, কলা এবং প্রত্যেকের জন্য দুটি করে সেদ্ধ ডিম পেয়ে আমরা তো মহা খুশি। প্রত্যেকের কাঁধে একটি করে ঝুলি। তাতে যাবতীয় বহনযোগ্য জিনিস। আমরা দশ-বারো জন সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেটাও রেললাইন পার হয়ে, তবে মোটামুটি রেললাইন ধরেই উত্তর-পুবের দিকে। সারাদিন ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে একটি গরুর গাড়ি দেখতে পেলে হিচ হাইক করা কঠিন ছিল না। তবে 'হিচ হাইক' কথাটাই তখনও জানতাম না। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় টোকা ছিল।

সেদিন প্রবাসজীবনদার হাতে ছিল এক কপি 'Leaves of Grass,' তিনি হাঁটতে হাঁটতে পড়ে শোনাচ্ছিলেন হুইটম্যানের সেই সব আশ্চর্য কবিতার লাইন —

I believe a leaf a grass is no less than the
journey-work of the Stars,
And the pismire is equally perfect, and a grain of sand,

and the egg of the wren,...

তবে তার আগেই যথাবিহিত 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' গাওয়া হয়ে গিয়েছে। তারপর কখনও গান, কখনও পড়া, কখনও মজার মজার গল্প।

হঠাৎ অনীশ দরাজ গলায় গাইতে শুরু করেছিল, 'নয় এ মধুর খেলা, তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা...'

বেলা দুপুরে যখন রোদ চড়ে উঠল, একটা পুকুর ধারে গাছতলায় বসে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারা হল পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে। আমরা কিন্তু কেউ তখন কাঁধে জলের বোতল নিয়ে পথ চলতাম না। তবে কি ওই পুকুরের জলই খেয়েছিলাম? কারোর তো তাতে কোনও বিকৃতা বোধ হয়নি।

ঘণ্টা দুয়েক পরেই আবার এক সময় আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে যখন আমেদপুর স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন হেমন্তের নিষ্প্রভ সূর্য ঢলে পড়েছে।

স্টেশনের বাইরে মাঠের মাঝখানে বসে প্রবাসদা বললেন, এই সেই জীবনানন্দের ধান কাটা মাঠ। মৃদু স্বরে আবৃত্তি করছিলেন—

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গেছে ক্ষেতে—রোদ গেছে পড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত সাদা পথ ধরে;
তখন গিয়েছে থেমে অই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড়;
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার সাদা মরা শেফালীর বিছানার পর;
মদের ফোঁটা শেষ হয়ে গেছে এ-মাঠের মাটির ভিতর!
তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে সাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চলে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড় মেয়েদের দল!...

সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় প্রবাসদা যখন বলছিলেন, 'এই হল আমাদের হেমন্তের দিন,'—সেই সময়ে আমার মনে অতি সঙ্গোপনে অন্য একটি বিপদ বিন্দু বিন্দু করে জমে উঠছিল। বুঝতে পারছিলাম, এই ধরনের আনন্দযাত্রায় আইয়ুবকে কোনওদিন সঙ্গী পাওয়া যাবে না। সেইখানে চির হেমন্ত। যতই কেন তিনি মনে মনে এবং স্বভাবেও এই আনন্দময় পৃথিবীর একনিষ্ঠ প্রেমিক হন, তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁর অন্তরে যে বৈরাগ্যের সঞ্চার করেছে, তাতে তাঁর মনে হত যেন এই আনন্দ-যজ্ঞে তাঁর কোনও অধিকার নেই। শুধু লোভীর মতো সেই সব গল্প শুনতেন।

কিন্তু অন্যদিকে আমি এও অনুভব করছিলাম, যে এই হেমন্ত মোটেই ধানকাটা মাঠের মতো রিক্ত ছিল না, বরং কণা কণা সোনার ফসলে আমার হৃদয়কে তিনি দিনে দিনে পূর্ণ করে তুলছিলেন।

খানিকক্ষণ পরে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে যখন ট্রেন এসে পৌঁছল, আমরা হুড়মুড় করে একটি কামরায় উঠে পড়লাম। ট্রেন তখন বোলপুরের দিকে যাচ্ছিল। দিনটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল, সেই একটি কথাই সবার মুখে মুখে মনে মনে ফিরছিল।

বোলপুরে পৌঁছতে দেরি হল না।
সেদিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই॥
... আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলীবিলীন, ভূষণবিহীন...

গাইতে গাইতে ডাকবাংলোর মাঠ পেরিয়ে ভুবনডাঙার পাশ দিয়ে বাঁধগোড়ার দিঘি বাঁয়ে রেখে, ক্রমে আমরা নিচু বাংলায় এসে পৌঁছলাম।

হঠাৎ একটা আম গাছের সরু ডাল একটু লাফ দিয়ে নামিয়ে প্রবাসদা দেখালেন আকাশে বড় চাঁদ। তারপর গান শুরু করলেন—

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধু পারের পাখি তারা, যায় যায় যায় চলে।
আলোছায়ার সুরে অনেক কালের সে কোন দূরে
ডাকে আয় আয় বলে।...

অনীশ এবং মাধবীও গলা মিলিয়েছিল। ওই গান অমন করে আর তো শুনলাম না। □

অনুলিখন: কামাল হোসেন

[এই লেখাটি গৌরী আইয়ুবের জীবনের অন্তিম পর্বে লেখা অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা 'আমাদের দু'জনের কথা'-র অংশ। গত সংখ্যা থেকে লেখাটি ধারাবাহিকভাবে 'চতুরঙ্গ'-এ প্রকাশিত হচ্ছে। বাকি অংশ আগামী সংখ্যায়। —সম্পাদক]

গৌরী আইয়ুব — ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে

মন্দার মুখোপাধ্যায়

জানতাম তিনি একজন বড় মাপের মানুষ। কিন্তু কত বড় তা জানতাম না। তাঁকে ঘিরে কাজ করত এক অদম্য কৌতূহল। তখনকার স্টাফরুমে দেওয়ালের দিকে একটা কোণ ঘেঁষে বসতেন। ব্যাগ নামাতেন। রেজিস্টারগুলোও থাক দিয়ে একপাশে রাখা থাকত। শুধু ওই বিভাগেই, ওঁর কথা ভেবে। যেহেতু চলা ফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না তাই সমস্ত স্টাফরুমটাই যেন গৌরীদির কাছাকাছি ঘুরে বেড়াত। বিনা আয়োজনে এমন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, রুচিসম্মত সাজ আর সৌন্দর্য্য—শঙ্খ ঘোষের স্ত্রী প্রতিমা ঘোষ ছাড়া আর বোধ হয় দেখিইনি।

তখন বেশ কয়েক বছর আইয়ুব চলে গেছেন। একমাত্র ছেলে পুষন-চম্পাকলির সংসারও অনেক দূরে—মুম্বাইতে। গৌরীদির জীবন বলতে বাড়ি, কলেজ, খেলাঘর, আর কিছু এদিক ওদিক যাতায়াত, সময় করতে পারলে তবেই। একদিন বিকেলের দিকে দু-একজন সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর পার্ল রোডের বাড়িতে গেলাম। ভেতরের ঘরটা দেখিয়ে বললেন—'ওইটে আমাদের ঘর।' প্রেমের সেই চকিত বিদ্যুৎ যেন আজও ছুঁয়ে আছি। আইয়ুবের মৃত্যুর পরও তাঁর সংস্পর্শে এমন অবিকল একভাবে বেঁচে থাকা, সাহচর্যের সম্পদে বেঁচে থাকা—এমন তো আর দেখিনি। কখনও গৌরীদিকে বলতে শুনিনি—আইয়ুব নেই, চলে গেছেন বা আইয়ুব ছিলেন। যে-মেয়ে মৃত্যুপথযাত্রীকেই বিয়ে করে, বিদ্রোহীর প্রেমে যে অশক্ত শরীরে আঁকে চিরায়ুষ্মানের প্রতিশ্রুতি তাদেরই গৌরী নাম মানায়। সেই সব গৌরীরা সম্পদ মানে না, তারুণ্য মানে না, প্রতিষ্ঠা মানে না। শুধু জানে ভালবাসা।

এই গৌরীদিকে আমি পেয়েছিলাম সহকর্মীর দূরত্বে (নিজের কানেই কেমন আস্পদ্দার মতো শোনায়।) কোনও দিন তাঁকে ক্লাসে দেরি করে যেতে দেখিনি। রাশি রাশি খাতা দেখে দিতে ক্লান্তি প্রকাশ করেননি। কখনও কোনও ছাত্রী সহকর্মী বা অশিক্ষক কর্মীদের অবহেলা করেননি। মেধা ও পাণ্ডিত্যের বিচারে এ কলেজ তাঁর যোগ্য ছিল না। কলেজেরই বিশেষ পরিচিতি ছিল গৌরীদির নামে। তবু তিনি যেন ছিলেন সব কিছুর ঊর্ধ্বে একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষিকা মাত্র।

প্রবল অভিমান এবং তেজ তাঁকে এমন এক বিশিষ্ট মাপ দিয়েছিল যে আমরা কখনও বলতে সাহস পেতাম না—গৌরীদি আপনাকে একটু ধরব! কোনও সাহায্যে লাগব কি? চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটি তাঁর অপটু কব্জিতে ঝুলিয়ে বুকের কাছে রেজিস্টার নিয়ে ডান হাতে সিঁড়ি ধরে ধরে উপরের ক্লাসে যেতেন। তখন লিফট চালু হয়নি। একতলা থেকে তিনতলা ভাঙতে তাকে কেউ কোনও হা-হুতাশ করতে শোনেনি। শোনেনি কোনও বিশেষ সুবিধা নিতে। বিভাগীয় প্রধান হিসাবেই তো তা তিনি পারতেন।

এক অনুজ সহকর্মীর পায়ে চোট পেয়ে টেনে টেনে হাঁটা দেখে বলেছিলেন 'তুমি গৌরী আইয়ুবের স্টাইলটা নিলে কেন?' প্রতিদিন বিকেলবেলা ব্যাগ বই গুছিয়ে একটা হাতটানা রিক্সায় বাড়ি ফেরা—এ আমাদের নিত্য দেখা ছবি। এরই মধ্যে কোনও ছাত্রীর থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে, কোনও সহকর্মী ডিভোর্সের পর মেয়েকে নিয়ে একা কষ্ট পাচ্ছে, কারও অগতানুগতিক বিয়েতে গিয়ে একবার দাঁড়াতে হবে, কার রিসার্চের কাজ আটকে যাচ্ছে, কে কোথায় অসুস্থ হল—এসবেই ছিল তাঁর অনায়াস শ্বাস-প্রশ্বাস। অবসর গ্রহণের পর কোনও একটা অনুষ্ঠানে কলেজে আসতে না পেরে লিখেছিলেন, "তবু যে আমি যাচ্ছি না, সে শুধু যেতে পারছি না বলেই। এর জন্য আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না তোমরাই আমার জন্য

একটু দুঃখ কর বরং। সেটাই বেশি উপযুক্ত হবে। আবার দেখা হবার আশায় রইলাম।" (তারিখবিহীন)

গৌরীদির সঙ্গে যে আমার প্রতিদিনের একটা গাঢ় ওঠাপড়া ছিল এমনটা বললে ভুলই বলা হবে। যোগাযোগের সূত্র ছিল মনে, অভিমানে, চিন্তায়। একটা অদ্ভুত গ্রহণযোগ্যতা ছিল দু'জনের মধ্যে। অনেক অনুষ্ঠানেই গৌরীদি সময়মতো জানাতে পারেননি। আবার অনেক সময় আমিও কথা দিয়ে যেতে পারিনি। অসুস্থতার খবর পেয়েও নয়। সে সময়কার চিঠিপত্রগুলো ভয়ানক ভারাক্রান্ত করে। মনে হয় এখনই ছুটে যাই— কিছুই কি অবশিষ্ট থাকে না!

"কি হল? এত উৎসাহ করে জানালে যে শিগগিরই আসছ— তারপর এমন উদাসীনতা কেন? আশা করছি কোনো অঘটন ঘটেনি"— ৮.৬.৯২

কিছুতেই মনে করতে পারি না আমার না যাওয়ার কারণ। সত্যিই কি গৌরীদিকে এতটাই সহজ আয়ত্বে পেয়েছিলাম যে তাঁর আমন্ত্রণকেও উপেক্ষা করতে পেরেছি। যাকে তাঁর উদাসীনতা বলেই মনে হয়েছিল? "নববর্ষে তোমার স্বরচিত কার্ডে শুভেচ্ছা জেনে খুবই খুশি হয়েছি বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে লজ্জাও পেয়েছি।

এপ্রিলের প্রথম থেকেই তোমাকে একটা চিঠি লেখার জন্য মনে মনে পাঁয়তারা কষছি। ৪ঠা আমাদের বসন্তোৎসব ছিল। আমি বলতে চেয়েছিলাম, আবার সপরিবারে এসো। তারপরে আর চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করার সময় ছিল না।

খেলাঘরে আমরা ১৪০০ সালকে বরণ করার অঙ্গ হিসেবে বাংলা নিয়ে একটা প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা করছিলাম— সামাদই আসল উদ্যোক্তা। সেদিন তোমাকে ডাকতে পারলেও ভালো লাগত। কিন্তু যথাসময়ে ভেবেচিন্তে প্ল্যান করে কাজকর্ম করা, সবটুকু মনের মতো গুছিয়ে নেওয়া এসব আর পারি না। একদিক হয় তো একদিক হয় না।" ৭.৫.৯৩

"তোমার দুটি চিঠি হজম করে বসে আছি এবং তা সত্ত্বেও আশা করছি যে তুমি আমার আচরণে অপ্রসন্ন হওনি, এটা হয়ত একটু বেশি প্রত্যাশা। যাইহোক এর ফলে আমি যে প্রায় প্রতিদিনই নিজেকে তিরস্কার করছিলাম সেটা কিন্তু সত্যি।" ১০.৪.৯২

ছাত্রীসংসদ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে লিখেছিলেন—

"I am deeply touched by your invitation. However much I would have enjoyed going back to the institution full of old memories for me, it is just not possible for me to accept the invitation at present due to my physical handicap. Please forgive me for that." ১৬.৭.৯১

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ঘিরে তাঁর যে কত মমত্ব আর স্বপ্ন ছিল। ছিল কত আনন্দের মুহূর্ত—

"আপাতত ৬ই মে কলকাতা ফিরবার আশা রাখছি। নিজের শরীরের এবং সমাজ সংস্কারের এত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে ঠিক মতন বাড়িতে পা না দেওয়া পর্যন্ত ভরসা হচ্ছে না যে পৌঁছতে পারবো। যদি পারি তাহলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে আর দেরী হবে না মনে হয়। ইতিমধ্যে পদ্মাদি এবং ভারতীর কাছ থেকে অদিতির বিয়ের খবর পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে বিয়ের পরে আমার বাড়িতে ডাকার ইচ্ছা ছিল। হয়নি। এবার যদি দুই নব-দম্পতিকে একসঙ্গে একদিন আমার ঘরে পাই তবে খুব ভালো লাগবে। অদিতির এই সম্পর্কটাও কি অনেকদিন থেকে ঘটে উঠেছিল না একেবারেই সাম্প্রতিক? ওকে বোল যে এই বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের জন্য আমি খুব আনন্দিত। ও নিশ্চয়ই সেটা জানে। কিন্তু এর পরে ওরা কলকাতাতেই থাকবে তো?

আশাকরি এতদিনে কলেজের আবহাওয়া খানিকটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে। এবং তোমরা সুস্থির চিত্তে পড়াশোনার কাজকর্ম করতে পারছো। এখন তো বোধহয় Plus 2 এর পরীক্ষা চলছে কলেজে এবং slack season শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা লিখতেই কলেজের staff room কে ভীষণ miss করতে শুরু করেছি। বেশ জমিয়ে আড্ডায় এবং coffee আর চিঁড়ে ভাজার আসরে কোনদিন শামিল হতে পারব কিনা জানি না। এখনও তো দুটি লাঠি নিয়ে চলাফেরা করি। দুটিকেই ত্যাগ করতে না পারা পর্যন্ত ভদ্রসমাজে নিজেকে উপস্থিত করার যোগ্য বলে মনে হবে না আমার। অগত্যা তোমাদেরই আসতে হবে পর্বতের কাছে।

শীলাকে একবার জিজ্ঞেস কর তো যে ওর বাড়ির ঠিকানায় আমি যে চিঠি দিয়েছিলাম সেটি পেয়েছে কিনা। আশাকরি ওর পারিবারিক পরিস্থিতি একই রকম, নতুন কোনো বিপত্তি দেখা দেয়নি।...

আজ এবার শেষ করি। ওঃ সুশীল পাঞ্জাবী এখন কেমন আছে? ওর অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা জানার পর থেকে মাঝে মাঝেই ওর কথা ভাবি। আর সব বন্ধুদেরও আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিও। রূপাকে বল যে ওর চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। পরে লিখতে চেষ্টা করব— অথবা গিয়ে ফোনেই গল্প হবে।" ১০.৪.৯২

আর একটি তারিখ বিহীন চিঠিতে লিখেছেন— "আজ ৮ই জুলাই, কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে মনে হচ্ছে মৈত্রেয়ী তুমি নন্দিতা সেই নৃত্যানুষ্ঠানটি করছো যার এত প্রশংসা শুনেছিলাম।" অন্য চিঠিতে লিখেছেন— 'উমাদির accident এর পরে কি দেখা হয়েছে'— ৭.৫.৯৩

সহকর্মী উমা ঘোষ ছিলেন ঘটনাচক্রে আমার মায়ের সহপাঠী। স্কুল জীবনের। আবার শিক্ষাসংক্রান্ত নানা ভাবনায় কাজকর্মে শিক্ষিকা হিসাবে গৌরীদি এবং আমার মায়ের মধ্যেও একটা স্বচ্ছন্দ সেতু ছিল। কোনও যাতায়াত না করা সত্ত্বেও। উমাদিকে কেন্দ্র করে আমার মা এবং সহকর্মী হিসাবে আমাকে নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে সব সময় একটা বৃত্ত ভাবনা থাকত। মা এবং উমাদি প্রসঙ্গ তাই হাত ধরে এসেছে 'আশাকরি আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে আনন্দে শান্তিতে আছ। মা কি আগের চেয়ে নিরুপদ্রব আছেন?"— ৭.৫.৯৩

'তোমার জননীর ঘরবাড়ি এবং স্কুল নিয়ে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল 'তার কি কিছু সুরাহা করা গেল কিংবা তিনি কি নিজেকে ঐ সব থেকে সরিয়ে এনে নিজের মনে শান্তিতে থাকতে পারছেন আজকাল?' ১০.৪.৯২

সংসার-স্বজন ছাড়াও আমার যে একটা উদ্বৃত্ত ব্যক্তিসত্তা আছে তাকে বারে বারে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সে যত সামান্যই হোক আমার আয়োজন।

"নববর্ষে তোমার স্বরচিত কার্ডে শুভেচ্ছা জেনে খুবই খুশি হয়েছি বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে লজ্জাও পেয়েছি।" ৭.৫.৯৭

"কাশফুলের সমারোহ নিয়ে তোমার শারদীয় শুভেচ্ছা যখন এসেছিল তখন সত্যিই খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই সময়টায় আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তায় মনটা এত বিচলিত ছিল যে শরৎকালের ঐ স্পর্শটুকু খানিকক্ষণের জন্য কিছু সুন্দর স্মৃতিতে ডুবিয়ে রেখে দিতে পেরেছিল" ১০.৪.৯২

"তোমার চিঠি আমাকে অপ্রত্যাশিত আনন্দ দিয়েছে। তোমরা কেউ কেউ আমার অভাব একটুও বোধ কর ভাবতে কী ভাল লাগে। পরবর্তী প্রজন্মের ভাবনায় ও স্মৃতিতে একটুখানি ঠাঁই পেলেও সে এক মস্ত লাভ" ৯.১০.৯১

"তোমাদের কথা লিখো— মা কেমন আছেন? কর্তা ও কন্যার খবর নিশ্চয়ই ভাল। আমি যদি শিগগির চিঠি না দিতে পারি তাহলে দুঃখিত হোয়ো না। কলেজের খবরও জানতে ইচ্ছা করে।" ৯.১০.৯১

"কবে আসবে সপরিবারে— একবার ফোন কর— " ৮.৬.৯২

"ওঃ দেশ-এ তুমি নিয়মিত পুস্তক সমালোচনা করছ দেখে ভাল লাগল। আমার বন্ধু ডঃ সুনীল সেনের বইয়ের সমালোচনাটা বিশেষ করে আগ্রহ নিয়ে পড়লাম কারণ বইটা পেয়েও পড়ে দেখা হয়নি বলে অপরাধী বোধ করছি। ম্যাক্লাস্কিগঞ্জের উপর একটা বড় লেখা কিছু কাল আগে দেশই ছেপে ছিল, দেখেছিলে কি? খুব করুণ লাগে এই সব স্বপ্নের সমাধি। sociology-র পাঠক হিসাবে আমার মাঝে মাঝেই খুব অবাক লাগে দেখে যে কি করে কোনও কোনও জায়গায় নতুন বসতি চেষ্টা করেও তৈরি করা যায় না— কোথাও আবার উৎখাত করবার চেষ্টা করলেও শিকড় গেড়ে বসে।

'কল্যাণী'কে নিয়ে বিধান রায়ের স্বপ্নও তো সফল হল না। ছোট্ট একটা প্রতিষ্ঠান বিধান শিশু উদ্যানকেও যে বাঁচিয়ে রাখা গেল না এটা যে কলকাতার নাগরিকদের পক্ষে কতখানি লজ্জার! ভাবলে অবাক হতে হয় যে আমাদের জাতীয় চারিত্রে কিসের অভাব আছে যার জন্য এরকমটা হয়।

গতকাল বিষ্ণু দে'র পুত্র জিষ্ণু দে এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, ওরা কয়েকদিনের জন্য Theoretical Physics এর একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছে সরকারি বাধা অগ্রাহ্য করে। এখানে Tata Institute এর মতো একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র যদি তৈরি হয়ে চলতে থাকতে পারে তাহলে কলকাতার বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির এমন দীনহীন এবং কলহজর্জরিত অবস্থা কেন। বাঙালির বুদ্ধি আর প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটু চরিত্রের জোর থাকত। এক আধজনের মধ্যে যদি বা পাওয়া যায়, তাঁর সেই কাজকে ধরে রাখবার মতো পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের মধ্যে আর পাওয়া যায় না কেন? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কী দুর্দশা!

এখানে বসে মাঝে মাঝেই এই সব কথা কেন মনে হয় জানো কারণ মারাঠীদের মধ্যে এই চারিত্র্য বোধহয় আমাদের চেয়ে একটু বেশি দেখতে পাই— তাই।" ১০.৪.৯২

ব্যক্তিকেও কীভাবে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অতিক্রম করে তার সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হয় তা তিনি জানতেন। তিনি জানতেন, পরিবার আর কলেজের চাকরি— এ দুটির সঙ্গে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে আমার লেখালেখির সামান্য আয়োজন, বিধান শিশু উদ্যানের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকা আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর অন্ধকার পাঠকক্ষে সময় কাটানোর আকুতি। আমার মনের গঠনে অনেকখানি পরিসর নিয়েছে এইসব গণ্ডি-উদ্বৃত্ত ভাবনা। এই সব উদ্বৃত্ততায় যখন আর পাঁচজন ভয় পেয়েছেন আমার আটপৌরে মাপটা ছিন্ন হচ্ছে ভেবে, গৌরীদির কাছে তখন মূল্য পেয়েছে আমার এই সময় নষ্ট করবার আগ্রহ। তাঁর কাছে অবাধে যাতায়াতের একমাত্র সেতু।

অনুভূতি বর্জিত এই সমাজকে নিয়ে তাঁর যে নিরন্তর ওঠা পড়া তার অনেকখানি রূপ পেয়েছিল 'খেলাঘর'কে ঘিরে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে। বারবার চেয়েছেন আমরাও সেই ছোট্ট কুটিরে যেন যে যার সময় ও সামর্থ্য মতো গিয়ে দাঁড়াই। একেবারেই যে এ বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম তা নয়। তবে আরও আরও উজাড় করে দিতে পারিনি নিজেদের— যে পরিমাণ প্রত্যাশা তাঁর ছিল।

নানা প্রসঙ্গেই 'খেলাঘর' এসেছে।

"But I will appreciate very much if some of you

pay a visit to Khelaghar at your convinience or during some festival" ১৫.৭.৯১

"তোমরা সপরিবারে (বরং পরিবারের একটা ভগ্নাংশ সহ) খেলাঘরে যাওয়ায় আমার খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু তোমাদের আদর আপ্যায়ন হয়ত ঠিক মতো হয়নি। তাছাড়া দিনটাও তো একটু খারাপ ছিল তাই খানিকটা অব্যবস্থা ঘটেছিল প্রথম থেকেই। খেলাঘরের জন্য সব সময়ই মনে একটা ভাবনা রয়ে গিয়েছে। কতদিন পরে যে ফিরতে পারবো কিছুই জানি না।" ৯.১০.৯১

একটি বাংলা দৈনিক খেলাঘরকে আক্রমণ করে অপমানকর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সে প্রসঙ্গে লিখেছেন—"আমি তো ভালই গুছিয়ে বসছিলাম নিজের ঘরে এবং কাজে। এর মধ্যে '....' অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছে 'খেলাঘর'কে। তাই নিয়ে বিব্রত আছি, কলকাতার রাস্তার কাদার ছিঁটে কাপড় থেকে তুলতে যে রকম নাজেহাল হতে হয় আর কি! জয়ললিতারা বা বালক ব্রহ্মচারীরা প্রেসকে অত্যাচার করলে তার তবু প্রতিবাদ প্রতিকার সম্ভব। প্রেস যখন ব্যক্তিমানুষ বা প্রতিষ্ঠানকে অত্যাচার করে তখন তার প্রতিকার প্রায় অসম্ভব। ওরা যে-পরিমাণ ক্ষতি করে সে পরিমাণে ক্ষত পূরণ করে না, এই তো সৎ সাংবাদিকতা।" ৮.৬.৯২

এই যে প্রতিবাদী সামাজিক মানুষটি তাঁর একটি ব্যক্তি-জীবন ছিল। তীব্রতায় মোড়া ছিল সমস্ত প্রোথিত শিকড়। সেই অবস্থানে প্রধান প্রতিবন্ধকতার কারণ ছিল তাঁর শরীর। ক্রমেই যা দীর্ণ হয়ে আসছিল। পৃষনের কাছে মুম্বাই গিয়েছিলেন দু'বার বিশেষ অস্ত্রোপচার করাতে। সে সময় লিখেছেন—

"আমার দুই হাঁটুতেই knee joint replacement এর কথা হচ্ছিল সেই খবর হয়ত পেয়েছ। কিন্তু urinary infection এর জন্য ব্যাপারটা পিছিয়ে গিয়েছিল। এবার মনে হচ্ছে ২৫শে হাসপাতালে ভর্তি হব এবং প্রথম operation টা ২৯শে হবে। তার ফল কী হয় দেখে পরবর্তী operationটা করা হবে সপ্তাহ তিনেক পরে।" ৯.১০.৯১

কয়েকমাস বাদে আবার লিখেছেন—

"... একে একে দু'চারজনকে চিঠি লিখছি এবং তার থেকে হয়ত জেনেছ যে আমি প্রথম আধখানা সেরে উঠেছি।

অর্থাৎ একটা পা মেরামত করা হয়েছে এবং সেটার উপর আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার তপস্যা চলেছে। দৃশ্যত তোমরা খুব একটা তফাৎ বুঝতে পারবে না। তবে operation করা পায়ের কষ্টটা গিয়েছে এবং ওটা সোজা হওয়ায় আমিও মেরুদণ্ডকে আগের চেয়ে একটু সোজা করতে পেরেছি মনে হচ্ছে। তবে অন্য পায়ের অবস্থা আগের মতোই। তবু তার কাছ থেকে যে service পাচ্ছি তা এখনও তো মেরামত করা পায়ের কাছ থেকে পাচ্ছি না, তাই সেটিকেও ডাক্তারবাবুর হাতে তুলে দিতে ভরসা পাইনি এখনও। হয়ত বছর খানেক পরে দিতেই হবে।" ১০.৪.৯২

এই ব্যথা বেদনা আর খেলাঘরের জন্যে উদ্বেগ—এরই সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর এক দিকে আনন্দ উপচে পড়ছিল। তার উৎস একমাত্র নাতনিশ্রী। 'এই যে অহনা' বইটি লেখার যে আয়োজন তাঁর মনের মধ্যে চলছিল তার প্রস্তুতিপর্বের কিছু টুকরো পড়ে আছে চিঠির ভাষায়। "গত বছর এই রকম সময়েই তো তোমরা খেলাঘরে গিয়েছিলে নানা উপহারসামগ্রী নিয়ে। খেলাঘরের জন্যও উতলা বোধ করি। কিন্তু এখন মনটা দিনে দিনে বিষণ্ণতর হচ্ছে নাতনীকে ছেড়ে যাবার ভাবনায়। আবার যে কতদিন পরে তাকে দেখব।" ১০.৪.৯২ এর আগের চিঠিতেই লিখেছিলেন—

"অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে এবং সেই সময়টা নাতনীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো এটাই ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। ওর সঙ্গে সারাদিন গল্প করে খেলা করে অভিনয় করে চমৎকার কাটছে। আপাতত রামায়ণ তাকে আবিষ্ট করে রাখে। পথে ঘাটে এক খণ্ড পাথর পেলে তাতে চেপে দাঁড়ায় এই প্রত্যাশায় যে সেও যদি কোনও অহল্যাকে বাঁচিয়ে বা জাগিয়ে তুলতে পারে রামের মতো। তবে তার নিজের মধ্যেই একটি অহল্যা জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। অসংখ্য প্রশ্ন করে, নানারকম মজার মজার কথা বলে। 'অনুতাপ' 'অভিশাপ', 'আশীর্বাদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে সাড়ে তিন বছরেই যে রকম বাক্য বিন্যাস করছে তাতে ঠাকুরমা তো মুগ্ধ। বালীকে অন্যায়ভাবে বধ করা, জটায়ুকে হত্যা করা ইত্যাদি ব্যাপারে তার মন এখনই বেশ বিচলিত, বারবার একই প্রশ্ন করে নিজের ভাবনাচিন্তাগুলিকে গুছিয়ে নিচ্ছে।

তবে kindergarten থেকে যখন ফেরে তখন বয়স কমে যায়। নেচে গেয়ে দেখাতে শুরু করে তার অম্বিকা 'টীচার' কি কি শিখিয়েছেন। ক্লাসের বন্ধুদের নাম শুনলে (অপেক্‌ষা = অপেক্ষা, মীমান্‌সা = মীমাংসা, প্রপঞ্চ, নাতাশিয়া, হাসকিষণ = হরকিরণ) দাঁত কপাটি লাগে। ও সব সময়েই আমাকে শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাচ্ছে।" ৯.১০.৯১

এ চিঠি পড়ে আমার মাথা কুটতে ইচ্ছে করেছিল। দুভার্গা এই শিক্ষাব্যবস্থা, দুভার্গা এই মেকি সমাজ যেখানে আইয়ুব-নাতনিকেও প্রবাসে গিয়ে ইংরেজিতে মাতৃভাষা শিখতে হয়। বাবা মায়ের প্রয়োজনে এমন আনন্দদিশারী নদীর মতো ঠাকুমার কাছ থেকে তাকে অসময়ে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। বিদ্রোহীর মতো মনে হয়েছিল ওই পার্ল রোড আঁকড়ে থাকলেই তো শ্রেষ্ঠ শিক্ষার সূচনা হত। আইয়ুবের পড়ার ঘর, কত মানুষের আসা যাওয়া, গৌরীদির প্রেমের সিংহাসন—এর বাইরে আর

কোন শিক্ষালয় আছে যারা আইয়ুবের নাতনিকে শিক্ষিত করে তোলবার স্পর্ধা দেখায়!

সব অবস্থানে এই যে গৌরীদি—এ তো এক অবিনাশী সম্মোহন। প্রতিবাদ আর প্রেম একই সঙ্গে তাঁকে এমন এক অভিজ্ঞতা দিল যে তিনি হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ সচেতন এক নারী। আমাদের জীবনে প্রতিবাদ আছে প্রতিকার আছে, জীবনযাপনে আঁকড়ে রাখা আছে, সহানুভূতি আছে, উদারতাও আছে কিন্তু প্রেম এমন করে সামান্য স্পর্শেও আমাদের ধন্য করে না। যেখানে করে সেখানে গৌরীরা অনন্ত মাধুর্যে লীন হয়ে যান। গৌরীদি যদি তাঁর পিতার দেওয়া অন্য নাম 'মৈত্রেয়ী'ও ব্যবহার করতেন তাতেও তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানে চলে যেতে হত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বনবাস যাত্রায়। নরনারীর যথার্থ প্রেম বিবাহ—সহাবস্থান সন্তানপালন পরিজন সেবা—সমাজকে যে কত ফসল উপহার দিতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত এই আইয়ুব দম্পতি আর তাঁদের পার্ল রোডের 'রোগাভোগা' সম্পন্ন সংসার—যেখানে সতত সুস্থতারই পরিচর্যা হয়েছে।

চলে যাবার পরও প্রায় দু' দশক অতিক্রান্ত, আইয়ুবের বইয়ের পাতার বাইরে ঘর বাড়ি পর্দা কুঁজো—তুচ্ছাতিতুচ্ছ 'সুখ দুঃখে', চর্যায়, ধর্মে বেঁচে থাকা—এ তো সম্ভব হয়েছিল গৌরীদির সাধনায়। আইয়ুবকে আরও গভীরভাবে জেনেছি গৌরীদির চোখের থমকানো বিদ্যুতে।

গৌরীদিকে অনুধ্যান করে আমার মনে হয়েছে ব্যাপক অর্থে তিনি একজন সাম্প্রদায়িক মানুষ। এই সাম্প্রদায়িকতা কোনও ধর্মধ্বজী সাম্প্রদায়িকতা নয়। কোনও সংস্কারপন্থী অবজ্ঞাও নয়। প্রচারসর্বস্ব সমাজযাপনে প্রতিনিয়ত যে কোটি যিশুকে আমরা ক্রুশবিদ্ধ করছি সেই সব সম্ভাবনার মুহূর্তগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যও একটা জীবন চাই। চাই কিছু সহমর্মী মানুষ। চাই একটি নিজস্ব আত্মজাত সম্প্রদায়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্ত্যজ অবস্থা—মুসলিম পরিবারে অন্দরমহল থেকে দোরগোড়া অবধি দেখে তাঁর মনে এক বৃহত্তর বোধের উন্মেষ হয়েছিল। পার্থিব জগতের মাপকাঠিতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সচেতন মানুষের অসহায়তা তাদের একটি নিজস্ব সম্প্রদায়ে বৃত্তমুখী করে। রবীন্দ্রানুসারীদের অযথা পীড়ন, মার্ক্সীয়দের শিকড়হীন সংস্কার আর তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রত্যহের দূরত্ব—এসব কিছু ছাপিয়ে তিনি চেয়েছিলেন এমন এক ধ্রুপদী জীবন যেখানে স্বতঃস্ফূর্ততাই শেষ কথা। মানুষ সেখানে 'মানুষের মতো' নয়, যথার্থই মানুষ।

খুব অনায়াসে যেমন ঘর গড়েছেন, আতিথ্য দিয়েছেন—আচার কাবাব খেলাঘরের ব্যাগে আমাদের বেঁধে রেখেছেন—তেমনই অনায়াসে বজায় রেখেছেন পাণ্ডিত্যের চর্চা। লেখালেখি করে গেছেন নিয়ম করে। কিছু হওয়ার জন্য নয়, মানুষের মতোই বাঁচা। তাই তাঁর সমস্ত পরিচিতি এবং ব্যক্তিচিহ্ন ছাপিয়ে তিনি এমন একটা অতিরিক্ত কিছু যার নাম—গৌরী আইয়ুব। এক অনন্য যাপিত জীবন। অনন্ত প্রেমের মুগ্ধ সহবাস॥ □

মানুষ মানুষ সবাই বলে

সুধীর চক্রবর্তী

একজন আধুনিক মানুষকে পুরোপুরি বুঝতে গেলে তাঁর বাড়ি যাওয়া দরকার। সম্ভব হলে একটা গোটা দিন আর রাত কাটাতে পারলে আরও ভাল। মুশকিল যে কলকাতার মতো শহরে সেটা হওয়া কঠিন কেননা সেখানকার বেশিরভাগ পরিবারে একটা ছক আছে—জীবিকা আর গৃহবাসের সুপরিকল্পিত নকসা। ঘুম থেকে ওঠা, দুধ আনা, কাগজ পড়া, বাঁধা সময়ে বাথরুম সারা ও স্নান, খাবার টেবিলে প্লাস্টিকের কভার পেতে খেয়ে নেওয়া, তারপরে টিফিন নিয়ে ব্যাগ হাতে বেরনো—কাজের দিনে এর কোনও এদিক ওদিক নেই। এর মধ্যে পরিচারিকা এসে ঘড়ি ধরে কাজ করে যায়, জমাদার এসে বাথরুম ধোয়, বাঁশি বাজিয়ে এসে একজন নীচে দাঁড়ায়—তাকে সারা বাড়ির বর্জ্যপদার্থ দিয়ে দিতে হয়। খেয়াল রেখে পাম্প চালিয়ে নিতে হয়, পাঁউরুটি আর ডিমওয়ালার কাছ থেকে নগদে কিনতে হয় সেই খুচরোটা যেন মজুত থাকে, অতিথির জন্য কিছু বিস্কুট-ডালমুট-সন্দেশ রাখা জরুরি। ফিল্টারে পরিশুদ্ধ জলের জোগান, ভোরে সাবান কাচার জিনিসগুলি ঠিক করে রাখা, ছেলেমেয়ের হোমটাস্কের দিকে নজর। ওরই মধ্যে সময় করে টিভির সিরিয়াল দেখে নেওয়া, টেলিফোনে সাড়া দেওয়া এবং কোনও না কোনও কারণে বিরক্ত হয়ে নিজের শহরকে ও দেশকে, গভর্নমেন্টকে অন্তত একবার গালি দেওয়া। এই তো জীবন। তার মধ্যে উটকো একজন তৃতীয় ব্যক্তির স্থান, সসম্মানে, থাকা কঠিন। মফস্বলে এই ব্যাপারটা অনেক শ্লথ। সময় আর পরিসর একটু বেশি, ছোটাছুটিটা কম, সবই পায়ে হাঁটা দূরত্বে, এখনও বাড়িতে সবসময়ের পরিচারিকা জোটে, বাড়ির সবাইকে এক সঙ্গে বেরোতে হয় না, রাতের শোবার ঘরকে ভোরে উঠেই বসবার ঘর বানাতে হয় না। খবরের কাগজ বেলায় আসে। গ্রামে এর কোনওটাই লাগে না। প্রথমত তারা নিজেরা যা খায় হঠাৎ-এসে-পড়া মানুষটাকেও তাই খাওয়ায়। বালিশের ওয়াড় পালটানো, বেডসিট বদল, অতিথির জন্যে তোয়ালে সাবান বার করার দরকার নেই। রান্না খাবারই বা তাড়া কই? হবে সব আস্তে আস্তে। আগে একটু মুড়ি নারকোল খান, গাছের দুটো পাকা কলা। দেখি লোক পাঠাই মাছ জোগাড় করতে পারে কি না। না পেলে ডাল আছে, বড়া হবে। একটা মোচা কাটো দিকি, ঘণ্ট করো। ওই দ্যাখো ওই উঠোনের এক টেরে কটা কাঁকরোল ধরেছে, ভেজে দিও। তারপরে ওবেলা দেখা যাবে। না হয় একটা মুরগি কাটা যাবে। আহা, উনি তো আর ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসেননি। থাকুন না ক'দিন। নদীতে স্নান করুন, ঘুরুন একটু মাঠেঘাটে, আমাদের ওই ময়রাপাড়ায় একটা পোড়ামাটির কাজ করা মন্দির আছে দেখবেন। আর হ্যাঁ, ইসমাইল ফকিরের গান শুনবেন। আমাদের গাছের পেয়ারা খাওয়াব, খুব মিষ্টি। আজ বেস্পতিবার সিন্নি হবে।

তা তো হবে কিন্তু শুতে গিয়ে দেখছি বিছানায় তেলচিটে গন্ধ, গামছায় মুখ মোছা যায় না—এত তেল। গুচ্ছের কাঁঠাল এমন জোর করে বাড়ির গিন্নি খাওয়ালেন যে খিদে পায় না। চুড়ো করে বেড়ে দেওয়া ভাত, জামবাটিতে করে ঘন ছোলার ডাল, একগাদা বড়িভাজা আর ডেঙ্গোডাঁটার চচ্চড়ি এক খাবলা। মাছের তরকারিতে এত মালমশলা যে বদন বিগড়ে যায়। 'খান খান, সব বাড়ির জিনিস, আপনাদের শহরের মতো ভেজাল নয়। ভেজাল নয় বলেই তো আরও সমস্যা।

স্যুপ আর স্ট্যু খাওয়া পেটরোগা মানুষ—ওই বিপুল পরিমাণ খাদ্য দেখেই ভড়কে যেতে হয়, তারপরে শেষ পাতে আছে বাড়িতে পাতা দই আর গোকুল পিঠে। আতংকিত মুখ না দেখিয়ে বিপন্নতা ফোটাতে হয়—এই অ্যাতো? 'না না, কী আর এমন? খেয়ে নিন। গ্রামদেশ আমাদের—কিছুই পাওয়া যায় না। সে গ্রাম কি আর আছে? সব জিনিস শহরে চলে যাচ্ছে। ওকি ওকি? সবই যে তুলে দিচ্ছেন? আরে খান খান, খাওয়ার জন্যেই তো বাঁচা, নাকি? ও বুঝেছি আমাদের রান্না আপনার ভাল লাগছে না। তাই না?'

এ সবই মানুষের বেঁচে থাকার গল্প। কিংবা যাপনের এক একটা ধরন, যার যেমন যেখানে থাকা। শহর-নগর-গ্রামের ছক কেবল গড়ে দিচ্ছে আলাদা আলাদা স্বভাব। ব্যক্তির দাম বা তার নিজস্ব রুচির দিকটা ক্রমেই গুটিয়ে নিতে হচ্ছে। আমাদের সময় নেই। শুনেছি আমাদের বাবা কাকারা চণ্ডরাগী ছিলেন। খেতে বসে দেখলেন দুয়েকটা বড়ি ভাজা একটু পুড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাতের থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। আবার সব গুছিয়ে নিখুঁত করে তাঁদের ডেকে আনতেন পিসি বা ঠাক্‌মা 'বাবা বাছা' করে। তাঁরা খেয়ে উদ্ধার করতেন। তার পাশে আমাদের দাম্পত্যটি কেমন? ভোরে উঠে এক চিলতে বারান্দায় বসে স্বামী-স্ত্রী চুপিচুপি ঠিক করে নেওয়া গেল—দু'জনকেই বেরোতে হবে সাড়ে নটার মধ্যে। তাই একটা বার্নারে ভাত আরেকটা বার্নারে মাংস, ব্যাস ঝামেলা চুকে গেল। সে মাংস অবশ্য তুলতুলে বিস্বাদ, বেশি স্টিম হয়ে গেছে। 'ওই যে ছেলেটা আবদার করছিল! তাকে ছোটবেলার মতো বিছানা থেকে কোলে করে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দাঁত মেজে দিতে হবে... যা দুষ্টু হয়েছে না!'

সবাই যে এমন আঁটোসাঁটো ছকে বন্দি তা অবশ্য ভাবার কারণ নেই। যেমন আমার ছাত্র শুভব্রত। সে ষাটের দশকে আমার ছাত্র ছিল। এখন দায়িত্বশীল, সাংবাদিক। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। তার স্ত্রী মর্নিং স্কুলে চলে গেলে আয়েস করে বাজার যায়, নিজের হাতে গৃহকর্ম করতে ভালবাসে, বই গুছোয়, আলমারি মোছে, ফুলের টবে রোদ লাগায়, রবার গাছের পাতা মুছে ঝকঝকে করে। তার বাড়িতে বইগুলি বিন্যস্ত, জামাকাপড় শুকোতে দেবার ক্লিপগুলো একটা বাক্সে পাওয়া যায়, বাথরুমের গামছা তোয়ালে পরিষ্কার, পায়খানার প্যান নিত্য মার্জনায় উজ্জ্বল, সেখানে গন্ধনাশক উপাদান টাঙাতে ভুল হয় না। বিছানায় সুন্দরভাবে বেডকভার পাতা, টানটান। সেন্টার টেবিলে এক মাসের খবরের কাগজ তারিখ অনুযায়ী সাজানো, সাপ্লিমেন্টগুলো আলাদা। জার্নাল একপাশে, পরিষ্কার টেবলক্লথ, টেলিফোন গাইড। ঘরের এককোণে লম্বা টুলে সুন্দর একটা অ্যান্টিক ভাসে রজনীগন্ধা। অথচ ও বাড়িতে সচরাচর কেউ আসে না। শুভব্রত মিশুক নয়। তার বন্ধুবান্ধব নেই। সে ধূমপান করে না—কিন্তু ছাইদান রাখে।

এটা খুব আশ্চর্য যে যার বাড়িতে বড় কেউ একটা আসে না তার গৃহকোণ চমৎকার ভাবে সাজানো-গোছানো থাকে। পরিপাটি করে বাঁচা শুধু নিজেদেরই তাগিদে এ আমরা আজকাল ভাবতে পারি না। ব্যাপারটা আর একটু ফলিয়ে বলি তা হলে সুবিধে হবে বুঝতে। একদিন শুভব্রতর বাড়ি গেলাম সস্ত্রীক, আগে জানিয়ে। সেখানেই খাব দুপুরে, বিকেলে চলে আসব এটাই প্ল্যান।

শুভ প্রথমেই বলল, এখন আটটা। দুপুরের খাওয়া বারোটায়। তাই এখন খান একটা ভেজিটেবল প্যাটিস আর একটা রাজভোগ। টাটকা এনে রেখেছি সকালে। বাজার থেকে জ্যান্ত পার্শে মাছ এনেছি, হাল্কা করে রেঁধে দেব। হ্যাঁ বৌদি, রাঁধতে আমার ভাল লাগে। মৌসুমী খাওয়াবে তার ইচ্ছেমতো রান্না করা পদ।

প্যাটিস আর রাজভোগ খাওয়া শেষ হতে শুভ প্লেট আর গ্লাস তুলে নিয়ে গিয়ে বেসিনে ধুয়ে, মুছে তুলে রাখল। এবারে ট্রে-তে ট্রে-ক্লথ পেতে আনল দুটো ছোট, দুধ, চিনি, চামচ, দুটো লম্বা কাপ। পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলল, ভাল দার্জিলিং পাতা-চা। দু'পটে দু'জনের জন্যে ভিজিয়েছি। কেন, ভাবছেন তো? আপনাদের দু'জনের স্বভাব আর স্বাস্থ্য যে আলাদা। আপনারটা হবে একটু কড়া, বৌদিরটা হবে একেবারে হালকা। না, আমি চা খাব না। আমি ভোরে এক কাপ খাই।

আমরা হতভম্ব দু'জন চায়ে চুমুক দিই, ভাবি, এটাও একজনের স্বনির্বাচিত জীবনযাপনের নকসা।

আমার সহকর্মী শচীনবাবু নিরীহ মানুষ। কলেজে আসবার সময় হাতে ফোলিও ব্যাগ আর কাঁধে সাইড ব্যাগ সর্বদা থাকত। ব্যাগে বইখাতা, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে টিফিন-বাক্স আর এক বোতল ফোটানো জল। নবদ্বীপ থেকে চন্দননগর রোজ এই খাবার জল বয়ে আনতেন। কখনওই বাইরের জল খান না, এত ভয়। টিফিন-বাক্সে থাকত মুড়ি মুড়কি, কিংবা চিঁড়ে ভাজা-বাতাসা। সঙ্গে কিছু শশার টুকরো। এর ব্যতিক্রম দেখিনি। প্রতিদিন চারাপোনা মাছের ঝোল খান। একদিন তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন।

—ওরে বাবা, ইলিশ মাছ খাবেন? খুব বিপজ্জনক।

—কেন?

—বদহজম না হয় অম্বল হবে। খাবেন না। অবশ্য গেলাম এবং খেলামও ইলিশ। শচীনবাবুর স্ত্রীও খেয়ে বললেন, ভাগ্যিস আপনি এলেন তাই কতদিন পরে ইলিশ মাছের ভাপানি খেলাম। শচীনবাবু কিন্তু চারাপোনাই খেলেন। বললেন, ইলিশ আর সরষে বাটা ডেনজারাস কম্বিনেশন। শরীরে বিপাক হয়। বললাম, কোনওদিন খেয়ে দেখেছেন সহ্য হয়েছে কি না?

—ছোটবেলায় খেয়েছি। ঝুঁকি নেবার দরকার কি? ইলিশকে বলা চলে মৃত শব, কারণ নদী থেকে তুলে বরফ দিয়ে রাখে। বাংলাদেশের যে ইলিশ খাচ্ছেন তা তো সাতদিন আগে ধরা। গলিত শব। আর একটা ডেন্‌জারাস জিনিস ওই চিংড়ি। ওটা তো মাছই নয়, পোকা। সত্যি, মানুষ কী না খায়।

এমন একটা জীবনদর্শন নিয়ে মানুষটি দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন। বিয়ে পৈতে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন—কোনও নেমন্তন্নে যান না। ওঁর স্ত্রী রক্ষা করেন সামাজিকতা। ওঁর বাড়ি গিয়ে সেদিন খাওয়াদাওয়ার পরে বললাম, আপনার কালেকশানে কী কী আছে দেখান। দুপুরে ঘুমনো অভ্যেস নেই।

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বললেন, কিন্তু আমি তো ঘুমোব। আমার সিডিউল কোনও কারণে পাল্টায় না। ছুটির দিনে দুপুরে একটু ঘুমনো স্বাস্থ্যকর। আপনিও শুয়ে পড়ুন একটু, গড়িয়ে নিন। মশারি টাঙিয়ে দেব?

—মশারি? এই দিনের বেলা?

—হ্যাঁ, আমি তো তাই শুই। নইলে মাছিতে বিরক্ত করবে।

এ রকম আশ্চর্য লোক কখনও দেখিনি। অগত্যা শুয়ে পড়ি। শচীনবাবু বলে গেলেন ঠিক এক ঘন্টা পরে আড়াইটের সময় এসে দেখাবেন তাঁর কালেকশন। শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠের ছাদ দেখি। চোখ আটকে যায় ঘরের তাকে। পর পর স্যুটকেশ সাজানো। সব ক'টি পলিথিন দিয়ে সযত্নে ঢাকা, দড়ি দিয়ে বাঁধা। শচীনবাবুর স্ত্রী মশলা দিতে এলে বললাম, এমন সুন্দর করে স্যুটকেশ বাঁধাছাদা। আপনি রেখেছেন এমন করে?

—না না, সব আপনার বন্ধুর কাজ। খুলে রাখলে নাকি পোকায় কাটবে। ভেতরে আছে ন্যাকড়ার পুটলিতে কালোজিরে। পোকা ধরবে না। আসলে ওঁর খুব বেড়ানোর নেশা। প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতে ছেলেমেয়ে আর আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তখন ওই স্যুটকেশ খোলা হবে। কোন স্যুটকেশ নিয়ে কোথায় কোথায় গেছেন ভেতরে কাগজ সেঁটে লিখে রেখেছেন।

—তার মানে স্যুটকেস খুলে দেখা যাবে হরিদ্বার বা এলাহাবাদ?

—উঁহু, অত সংক্ষিপ্ত নয়। হরিদ্বার-হৃষিকেশ-লছমনঝোলা-দেরাদুন-মুসৌরি। এই হল একটা সিরিজ। ভাবছেন এতেই শেষ? তা নয় তাহলে শুনুন। বেড়াতে যাবার তিনমাস আগে যেখানে যাবেন তার গাইডবুক, ম্যাপ, ইতিহাস জোগাড় করে পড়বেন। আমাকে আর ছেলেমেয়েকে পড়াবেন। তারপরে ক্যামেরা পরিষ্কার হবে। ফিল্ম নেবেন চার পাঁচটা। ওষুধ-বিস্কুট-কাজুবাদাম-কমপ্ল্যান। যাওয়া নয় তো অশ্বমেধ যজ্ঞ। তার ওপর ডাইরি লেখার বাই।

বাপরে, সচকিত হয়ে বলি, এবারে শেষ হল?

—না। আসবার সময়ে সঙ্গে আনবেন প্রত্যেক জায়গার কিছু একটা স্মৃতি। সেবার নৈনিতাল থেকে কিছু আনতে না পেরে আনলেন কটা নুড়ি। ওই দেখুন আলমারিতে রয়েছে। লেখা আছে নৈনিতাল ২১.১০.৭২। আরও আছে, শুনবেন? যেখনে যেখানে গেছেন তার টিকিট বা রিজার্ভেশন টিকিট অন্তত একটা জমানো আছে।

—বলেন কি? আপনাদের বিরক্ত লাগে না? প্রতিবাদ করেন না?

—করে লাভ কি? মানুষটাই ওই রকম। তবে আসলে তো ভাল মানুষ, নিরীহ। যেদিন শুনতে পায় কলেজে ঝামেলা হবে বা ছাত্ররা ঘেরাওটেরাও করবে সেদিন কলেজেই যাবেন না। এবারে প্ল্যান করেছেন যাবেন গোয়া-অজন্তা-ইলোরা। পড়াশুনা শুরু হয়ে গেছে। নারায়ণ সান্যালের 'অপরূপা অজন্তা'। রাতে শোবার আগে আমাকেও আধঘন্টা করে পড়তে হচ্ছে।

এবারে বলি, কিন্তু আপনার মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে খুব একটা খারাপ তো আপনারও লাগে না? বেশ সবকিছু মেনে নিয়েছেন।

শচীনজায়া বলেন, তা নিয়েছি। তাতে কষ্ট কিছু নেই। আপনার বন্ধু এতো গুছনো যে বেশি খাটতে হয় না, মাথা ঘামাতেও হয় না। যেমন ধরুন, মেয়ে আর আমার ব্যাপার আমি সামলাই। শাড়ি শায়া ব্লাউজ প্রসাধন সব কিছু আমি কিনি। উনি কেনেন নিজের আর ছেলের যা কিছু। তা ছাড়া এক সঙ্গে বারো মাসের বারোটা পেস্ট, বারো প্যাকেট ব্লেড, ছ'টা শেভিং ক্রিম, তিনটে ডেটল, ছ'টা টুথব্রাশ, দু'ডজন গায়ে মাথার সাবান, চারটে পাউডার, চারটে গামছা, বারোটা ভিম বার, কুড়িটা ব্ল্যাংক ক্যাসেট এই রকম সব জানুয়ারিতে কিনে রাখেন। পাইকারি দামে সস্তা হয়, অনেক গিফ্‌টও পাওয়া যায়। হিসেব করে দেখেছেন সারা বছরে নাকি সাতশো ঘন্টা এতে বাঁচে। নিন, এবারে শুয়ে পড়ুন।

—না না। শোবার ইচ্ছে নেই। শচীনবাবু সামনে থাকলে তো এসব জানা যাবে না। বলুন। খুব ইন্টারেস্টিং। আর কী করেন উনি?

—কৌটোয় খুচরো জমান। একটাকা আর পঞ্চাশ পয়সার কয়েন। পাঁচটাকা আর দু'টাকার ফর্সা নোট পাঞ্চ করা। দশ বছর আগেকার, পাবেন। কলেজ যাবার সময় সর্বদা কুড়ি টাকার খুচরো থাকে। ব্যাগে থাকে গেলাস। কোথাও অন্যের গ্লাসে জল খান না। ডেলি প্যাসেঞ্জার তো, তাই ব্যাগে আছে স্যাভলন, বোরোলিন আর এন্ট্রোজাইম। একটা টর্চ। খানিকটা তুলো। একটা ঝাড়ন। একটা পুরনো খবরের কাগজ। লাল

ডট পেন। একটা কাগজে নাম ঠিকানা টেলিফোন নম্বর আর রক্তের গ্রুপ লিখে ইনসাইড পকেটে রাখেন। অ্যাক্সিডেন্ট হলে অন্যের কাজে লাগবে।

শচীনবাবুর জীবনযাপন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানসম্মত কিংবা ব্যবহারতত্ত্ব বিষয়ক একটা গবেষণার উপাদান পাওয়া সম্ভব। এমন তো নয় যে, তাঁর সম্পর্কে এই প্রথম জানলাম। অনেক দিনের সহকর্মী তাই জানি ছাত্রজীবনে পড়তেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, তার নাকি বাষট্টিটা সিঁড়ি। তাঁর মেজদা রঞ্জীন পড়তেন মেডিক্যাল কলেজে, সেখানে আছে বেয়াল্লিশটা সিঁড়ি। চাকরি করেছেন কৃষ্ণনগর কলেজে, আঠাশটা সিঁড়ি। চন্দননগর কলেজে বাইশটা। সত্যি? ওসব জায়গায় আমার যাতায়াত ছিল কিন্তু গুনিনি কখনও বা গোনার কথাও ভাবিনি। নিজের বাড়ির দোতলায় উঠতে যে চোদ্দ আর সাত মোট একুশটা সিঁড়ি টপকাই রোজ কয়েকবার, খেয়ালই করিনি। শচীনবাবুর কাছে তাঁর সিঁড়ি গোনার ঘটনা শুনে তারপরে গুনে দেখেছি। তার মানে এই নয় যে নতুন কোথাও গেলে সিঁড়ি গুনি। সেদিন শচীনবাবুর স্ত্রীর কাছে সারা বছরের জিনিস ডজন দরে কেনা শুনে প্রশ্ন করেছিলাম, এতে কি শুধু শ্রম বাঁচে না টাকাও বাঁচে?

—উনি বলেন সব ভোগ্যপণ্যের দাম তিনমাস অন্তর বাড়ে আমরা টের পাইনা। বছরের গোড়ায় যে-পেস্ট পনেরো টাকায় পাওয়া যায় বছরের শেষে দেখবেন সেটা বাইশ টাকা।

—আচ্ছা, ওঁর কেনাকাটার ব্র্যান্ডও কি নির্দিষ্ট? যেমন অনেকে শুধু ক্যাপস্টান বা চার্মিনার খান, স্টেটসম্যান বা আনন্দবাজার পড়েন, ওঁর কি তেমনই নির্দিষ্ট পেস্ট বা সাবান আছে?

—না, এ ব্যাপারে ওঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট। কোন এক ডেনটিস্ট ওঁকে বলেছেন প্রত্যেক পেস্টে একটা না একটা উপাদান আছে। কাজেই এ মাসে নিম তো ওমাসে কলগেট। তারপরে বাবুল, কলিনস্‌, ক্লোজাপ, পেপসোডেন্ট পর্যায়ক্রমে। সাবানেও তাই। উনি সঞ্চয়ী কিন্তু কৃপণ নন। পোশাকআশাক, খাওয়া দাওয়া, বেড়ানো, অতিথি সৎকারে দু'হাতে খরচ করেন। আমরা যে বেড়াতে যাই তা কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে। আপনার ভাবতে হয়ত অবাক লাগবে কিন্তু উনি সবচেয়ে খরচ করে বানিয়েছেন বাথরুম আর রান্নাঘর। নিজে খান না পেট খারাপের ভয়ে কিন্তু আপনার জন্যে রাবড়ি এনেছেন।

শচীনবাবুর স্ত্রী চলে গেলেন কিন্তু আমাকে ফেললেন মহা ভাবনায়। মানুষের বিহেভিয়াল প্যাটার্ন কেমন হবে? কোনটা আদর্শ? শচীনবাবু একবার কলেজে বলেছিলেন, প্রত্যেক বছর সরকার আমাদের যে ইন্টারেস্ট-ফ্রি পুজো অ্যাডভান্স দেয় তা কি নেন?

—না। কী হবে ওই সামান্য টাকায়?

—কিন্তু সুদ লাগে না। আর কমই বা কি? প্রথমে দিত চারশো টাকা, এখন তো দু'হাজার উঠেছে। আমি গত পঁচিশ বছরে কি করেছি জানেন? পুজো অ্যাডভান্স আমার এমনি দরকার নেই কিন্তু সরকারি সুযোগ নিতে আপত্তি কি? কাজেই পঁচিশ বছর ধরেই আমি অ্যাডভান্স ড্র করি আর সেভিংস সার্টিফিকেট কিনি। ছ'বছরে ডবল। এটা কিন্তু একটা ভদ্রভাবে অর্জিত রোজগার, যাকে বলে প্রপার প্ল্যানিং।

এহেন কথা শুনে তখন খুব চমকে গিয়েছিলাম, খানিকটা হীন ধারণাও হয়েছিল। শচীনবাবুর বাড়ি এসে ওঁর সম্পর্কে একটা সঙ্গতিপূর্ণ ধারণা হল। কোনও মানুষের সঠিক বিচার করতে হলে তাঁর নিজ পরিবেশে তাঁকে দেখতে হবে। এ বাড়িতে এসে বুঝেছি শচীনবাবুর কতকগুলি স্পষ্ট চিন্তা আছে, যাপনের ধরন আছে। সবটাই পূর্বকল্পিত এবং একটুও লোক দেখানো নয়। ওঁর জীবনযাপনের দৈনন্দিনে একটা পরিতৃপ্তি আছে। উনি কখনও কারুর কাছে কিছু চান না।

আপন মনে বিছানায় শুয়ে আছি ছায়াচ্ছন্ন একতলার ঘরে। ভাবছি নানা কথা। হঠাৎ মনে পড়ল শচীনবাবু আর আমি একবার শ্যামনগর স্টেশন হয়ে কলকাতা গিয়েছিলাম। তখন দু'জনেরই চন্দনগর কলেজে পোস্টিং। এক নম্বর থেকে দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেতে ওভার ব্রিজ পেরোতে পেরোতে উনি বললেন, এখানে বোধহয় সাঁইত্রিশটা সিঁড়ি। অন্যান্য ওভারব্রিজে থাকে ঊনচল্লিশটা, শেয়ালদায় একচল্লিশটা। আমি বলেছিলাম, ট্রেনে যাতায়াত বহু লোক করে কিন্তু এই খবরটা নতুন। উনি বলেছিলেন, এটা একটা প্রবণতা। সেটা গড়ে ওঠে কম্পালশ্যানে। আমার ছোটবেলা এত দারিদ্র্যে কেটেছে যে বহু বই কিনতে পারিনি। মুখস্থ করে ফেলেছি। একটা কথা জানেন তো? ব্রেনের চর্চা করলে তার ক্যাপাসিটি বাড়ে। আমার স্মৃতিশক্তি খুব বেশি। সেটা আমি তৈরি করেছি। নানাভাবে।

বলেছিলাম, হ্যাঁ। এটা একটা প্রবণতা। আমার বন্ধু অমিয় বাগচির একটা ক্ষমতা দেখেছি। পরিচিতদের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ তাদের ফোন নম্বর এর মুখস্থ। আমার মুখস্থ শক্তি নেই।

—কে বলল? আপনি নিজেই জানেন না আপনার ক্ষমতা। শুনবেন? আপনি যে এত গান করেন—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, দিলীপ রায়, আধুনিক, সংস্কৃত স্তোত্র—কই কখনও তো বই-খাতা দেখেন না? তার মানে অন্তত পাঁচশো গানের বাণী আর সুর আপনার কণ্ঠস্থ। সেটা কি কম কথা? তুলনায় বহু বাজে জিনিস আমার মনে আছে।

—যেমন?

—যেমন ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি হয়েছিলাম। তার তারিখ আর রোল নম্বর মনে আছে। তার পরে যতদিন পড়েছি এম.এ. পর্যন্ত সব ক্লাসের রোল মনে আছে।

আমি আমূল রোমাঞ্চিত হয়ে বলেছিলাম, বলেন কি? আর কী কী মনে আছে? আপনি তো সাংঘাতিক লোক?

শচীনবাবু বললেন, আমি সাংঘাতিক লোক? তাহলে ত্রিপুরারী চক্রবর্তী কী? মহাভারত যাঁর কণ্ঠস্থ ছিল? ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি সীতারাম শাস্ত্রীকে। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। বেদ পড়াতেন আমাদের, বই দেখতেন না। শম্ভু মিত্র? কোনও দিন থিয়েটারে প্রম্পটিং নিতেন? আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প তো আপনার কাছেই শোনা। তবু বলুন না আর একবার।

—হ্যাঁ। এম. এ ক্লাসে আমাদের দুর্গেশনন্দিনীর গদ্য মুখস্থ বলতেন। তার চেয়েও আশ্চর্য, একবার চেকভের গল্প নিয়ে সেমিনারে বলেছিলেন। মোট চব্বিশ রকমের গল্পের কাহিনী নিয়ে তুলনা করেছিলেন এবং অন্তত ষাট সত্তরটা চরিত্রের বিদেশি নাম অনায়াসে করেছিলেন।

শচীনবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন, তবে? এসব ক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন? প্রফেশ্যানালিজম? তাহলে সেটা অন্যের নেই কেন? আমাদের স্যার নির্মলকান্তিবাবু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যারা যারা কমপিট করেছিল তাদের নাম বলতে পারতেন। আর আমাদের চন্দননগর কলেজের ভূগোলের সতীশ শাসমল?

—তাঁর আবার কী?

—গেজেট মুখস্থ। ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে কে কার সিনিয়র, কে কাকে সুপারসিড করেছে। শিবনেত্র হয়ে বলে দেবেন। অবশ্য মিটিমিটি হাসবেন।

শচীনবাবুকে আমি সেদিন আর একটু ঘাঁটিয়ে আরও কিছু খবর জোগাড় করেছিলাম। যেমন জানা গিয়েছিল ক্লাস সেভেনে পড়বার সময়ে তিনি ওয়ারেভার বলে একটা কলম উপহার পেয়েছিলেন পৈতে উপলক্ষে। তার আগে তিনি নিবের কলমে লিখতেন, পরীক্ষার সময়েও। ওয়ারেভার কলমে মাধ্যমিক পর্যন্ত দিয়ে ধুয়েমুছে তুলে রেখেছেন। তারপরে জলপানির টাকায় কিনেছিলেন শেফার্স। আই.এ.-র পর সেটা তুলে রেখেছেন। বি.এ. দিয়েছেন এভারশার্পে, এম.এ. পার্কারে। সবই সাজানোগোছানো আছে। পঁচিশ বছরের চাকরিজীবনে প্রতি বছর একটা করে নতুন কলম কিনেছেন। গোছানো আছে। 'পর পর দেখে বলে দিতে পারি কোনটা কোন সালের।'

ব্যাখ্যাতীত এই মানবস্বভাব সম্পর্কে কী বা বলবার থাকতে পারে? এতটা মমতা, এত সংরক্ষণপন্থী প্রবণতা কী এর কারণ? মানুষ স্ট্যাম্প জমায়, দেশ বিদেশের মুদ্রা জমায়, ফার্স্ট ডে কভার, গণেশমূর্তি। আমার এক বড়লোক বন্ধু জমিয়েছে দেশ বিদেশের নানা রকম মদ্যপাত্র—পেগ। শচীনবাবু কলম জমিয়েছেন কারণ কলমই তাঁর বিদ্যাবত্তার প্রচার। স্বভাবত যে প্রশ্ন ওঠে এরপর সেটাই করেছিলাম, ডট পেন ব্যবহার করেন না?

খুব তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, পেন যারা ভালবাসে তারা ডটপেন কী করে সহ্য করতে পারে? গঙ্গা জল আর পুকুরের জল কি এক? তবে হ্যাঁ ভেবেচিন্তে পেন আর ডটপেনের দুটো নাম বার করেছি।

—কী রকম?

—অন্তঃসলিলা হল পেন, আর ডট পেন হল অন্তঃসত্ত্বা, কেমন?

জীবনরসিক মানুষটি কিন্তু সতর্ক ও স্বনির্ভর। চন্দননগর কলেজে কাজ করবার সময় বলেছিলেন, ওঁর আরেকটা নিজস্ব অভ্যেস হল চেনাপরিচিতদের কারুর ভাল লেখা কাগজে বা জার্নালে পড়লে সেটা জেরক্স করে রাখেন। এতে সুবিধে কী জানেন? বই বা ম্যাগাজিন রাখতে জায়গা লাগে। জেরক্স কপি ফাইলে রাখা যায়, বিষয় অনুযায়ী। আর একটা লাভ হল ধরুন কারুর একটা লেখার কথা মনে পড়ল। খোঁজাখুজিতে সময় নষ্ট না করে বিষয় অনুযায়ী ফাইল ঘেঁটে তাড়াতাড়ি বার করে পড়ে নিলাম। আমার বিষয়গত ইনটারেস্ট খুব সীমিত। লোকাল হিস্ট্রি, সঙ্গীত, চিত্রকলা, মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য। শুনলে খুশি হবেন, আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের আগেই আপনার লেখা পড়ে জেরক্স করে রেখে দিয়েছি। পাঠকরা যে লেখকদের কতটা ভালবাসে, ভালবাসে কিন্তু বিনাস্বার্থে, তা লেখকরা জানেন না।'

আমাকে বলতে হয়েছিল, আমি অন্তত জানি। চিঠিপত্র পাই পাঠকদের কাছ থেকে। কেউ কেউ বইতে সই করিয়ে নেন। এর মধ্যে একজন সত্যি চমকে দিয়েছিলেন। প্রায়ই চিঠি লিখতেন আর বলতেন তাঁর বাড়ি একদিন নিয়ে যাবেন। উত্তরপাড়ায় বাড়ি, মধ্যবয়স্ক।

—তারপর?

—তারপর একদিন সত্যিই নিয়ে গেলেন, সমাদর করে খাওয়ালেন। দেখালেন আলমারিতে রাখা আমার সব বই। তাতে আমার বিভিন্ন বইতে পড়া তাঁর পক্ষে অজানা যেসব শব্দ তার তালিকা দেখালেন। জানতে চাইলেন ওই বিশেষ শব্দ প্রয়োগের কারণ, তার ব্যুৎপত্তি আর গূঢ় অর্থ।

শচীনবাবু বলেছিলেন, এইটাই তো অমার বলার কথা। প্রত্যেকের নিজের একটা জীবন আছে। তার রুচি, গতিপ্রকৃতি আর উপভোগ তার নিজস্ব।

শচীনবাবুর নিজের জীবনে আত্ম-উপভোগের এই উল্লাস খুব সহজে গড়ে ওঠেনি। তিনি যখন জন্মেছিলেন তখন দেশ বিভক্ত। তাঁর বাবা তিনটে সন্তান, স্ত্রী আর বিধবা মাকে নিয়ে

প্রায় একবস্ত্রে এসেছিলেন ফরিদপুর থেকে। অজানা দেশ, অসহিষ্ণু মানুষ চারপাশে। বাবার নাম ছিল সদানন্দ ভট্টাচার্য। শচীন তাঁর ছোটছেলে। বড় দুই দাদার নাম ব্রতীন আর রঞ্জীন। উঠেছিলেন প্রথমে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে। তারপর নানা ঢেউয়ে ওঠানামা করে পণ্ডিত বংশটি স্থিতু হয় নবদ্বীপে। সেখানে তাঁদের ভদ্রাসন, মাদারিপাড়া গ্রামের বেশ ক'টি পরিবার এসেছিল। তাদের সুবাদেই নবদ্বীপে আসা আর বসবাস। সদানন্দ যজমানী করে, টিউশ্যানি করে অশেষ কষ্টে সংসার চালাতেন। শচীন তখন ছোট, ঝড়ঝাপ্টা তাই বাবা-মা আর দুই অগ্রজের ওপর দিয়ে গেছে। আবছা মনে পড়ে তাঁর কিছু কিছু।

চন্দননগরে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করার সময় একেক দিন আমি আর শচীনবাবু একসঙ্গে বহুক্ষণ কাটাতাম, কোর্টের ধারে জগদ্ধাত্রী হোটেলে খেতে খেতে নানা গল্প হত। সে সময়েই তাঁর জীবন সংগ্রামের গাথা আমার শোনা। সদানন্দ শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন পণ্ডিতের চাকরি স্বরূপগঞ্জের স্কুলে। ফরিদপুরের মাদারিপাড়া বৈদিক ব্রাহ্মণপ্রধান জায়গা—সংস্কৃত পাঠের পরম্পরা বহুদিনের। সদানন্দ ছিলেন সেখানকার স্মৃতিতীর্থ। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাই খুব সহজেই গৃহীত হয়েছিলেন। কিন্তু বুঝেছিলেন যুগোপযোগী বিদ্যা না অর্জন করলে ছেলেরা প্রতিষ্ঠা পাবে না। তাই ব্রতীন হল ইঞ্জিনিয়ার, রঞ্জীন ডাক্তার। তাদের নিয়ে সদানন্দের লড়াই উদয়াস্ত বেশ মনে আছে শচীনের। তারা সকলেই মেধাবী তাই বৃত্তিলাভ ছিল স্বাভাবিক। সদানন্দের আর্থিক অবস্থা তখন এমন ছিল যে উদরান্নের সংস্থান আর বাড়িভাড়াতে সব চলে যেত। স্কুল থেকে ইংরাজি খবরের কাগজ এনে লণ্ঠনের আলোয় ওই ছেলেকে পড়াতেন, অনুবাদ শেখাতেন। ব্রতীন আর রঞ্জীন যখন বি.ই. কলেজ আর মেডিকেল কলেজে তখন সংসারের দারিদ্র্য চরমে পৌঁছায় আর ঠিক সেই সময় শচীন মাধ্যমিক দিচ্ছেন।

শচীন বলেছিলেন, উঃ ভয়াবহ সে সব দিনের স্মৃতি। দিনের পর দিন অখাদ্য খেয়েছি কচু ঘেঁচু, মাছ খেতে পাইনি, পাঠ্য বই টুকে নিয়েছি, বাবাও টুকে দিয়েছেন। সেই সময় থেকে আমার স্মৃতিশক্তির বাধ্যতামূলক চর্চা, মুড়ি বাতাসা খাওয়া আর সব কিছু সঞ্চয়ের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। বাবা ছিলেন প্রচণ্ড সময়নিষ্ঠ আর দুরন্ত আশাবাদী। শেষ পর্যন্ত ওঁর জয় হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার-অধ্যাপক তিন ছেলেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত দেখে গেছেন। কেবল একটা খেদ ছিল। পরিবারের বহু দিনের সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা সন্তানদের মধ্যে রাখতে পারেননি। আমাকে ইংরেজি পড়ালেন, কলকাতা গিয়ে টিউশ্যানি করে বি.এ. এম.এ. পড়তে পারব ভেবে। অবশ্য পাশ কোর্সে সংস্কৃত ছিল আমার। নম্বরও ভাল পেতাম। কিন্তু মাদারিপাড়া থেকে বয়ে আনা বাবার পুথিগুলো শেষ পর্যন্ত নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগারের হিমঘরে দিতে হয়েছে সে দুঃখ যাবার নয়। হিমঘর মানে এয়ার কণ্ডিশনড্ রুম নয়। পুঁথিশালা, যেখানে কোনও আগ্রহী কোনওদিন আসবে না।

সত্যি সত্যি আমাদের লেখাপড়া শেখা আর শচীনবাবুর পড়াশুনোর লড়াইয়ে কোনও তুলনা হয় না। যখন তিনি কলকাতায় বি.এ. পড়ছেন তখন একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি থাকা খাওয়ার বিনিময়ে দু'বেলা পড়াচ্ছেন তিনজনকে। রাত জেগে অনার্সের পড়া করতে গেলে গৃহস্বামী আলো নিবিয়ে দেন, তখন বাতি জ্বালা। সদানন্দ নবদ্বীপের প্রেস থেকে 'ছাত্রছাত্রী পড়াইতে চাই' শিরোনামে সস্তায় হ্যান্ডবিল ছেপে দিয়েছিলেন। শচীন নিজের হাতে নানা স্কুলের পাঁচিলে, হাসপাতালে, শিয়ালদা স্টেশনের দেওয়ালে, গ্যাসপোস্টে সেগুলি সেঁটে অপেক্ষা করেছেন চিঠির। এই ভাবে টিউশ্যানি পেয়ে বাড়ি বাড়ি পড়িয়ে মেসের খরচ তুলেছেন। এম.এ. পড়ার সময় দমদমের এথেনিয়াম ইন্সটিটিউটে সকালে পড়াতেন আশি টাকা বেতনে। স্কুল ছুটির পর ঊর্ধ্বশ্বাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটা। এই পর্যন্ত বলে শচীনবাবু চন্দননগরের জেটিতে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করেছিলেন, বুঝলেন, যে-রকম মেধা আর স্মৃতিশক্তি ছিল আমার, একটু আনুকূল্য পেলে ফার্স্ট ক্লাস পেতাম নিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়ে আমার দৌড় থামল। জানেন বিদ্যার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অভিমানের। অভিমানের জন্যে আমি পিএইচ.ডি. করিনি। কিন্তু জীবনটা তো কোনও দোষ করেনি। তাই নিজের মতো জীবন আমি গড়তে চেয়েছি। সেখানে কোনও কম্প্রোমাইজ নেই। বাবা-মা দীর্ঘজীবী হননি। দাদাদের একজন আমেরিকায়, একজন বোম্বেতে। আমি নবদ্বীপে সেট্‌ল্ করললাম কেন জানেন? বাবা সেটা চেয়েছিলেন বলে। প্রায়ই বলতেন, "ভাটপাড়া থেকে নবদ্বীপ। গঙ্গার তীরবর্তী এই পুণ্যভূমি সংস্কৃত ভাষাচর্চার পীঠস্থান। এই আওতায় বসবাস কোরো। দেশের স্পর্শ পাবে।"

শচীনবাবুকে সেদিনই ভালবেসে ফেলেছিলাম। বয়সে আমার চেয়ে অনেকটাই ছোট, তবু ধীমান নিরীহ এই সহকর্মীর সঙ্গে একটা আলাদা বন্ধুতা গড়ে উঠেছিল। তাঁর বাড়ি আসা সেই বন্ধুতার একটা তাপময় প্রকাশ।

নবদ্বীপে শচীনবাবুর নিজের মতো জীবনযাপনের যে-ছক সেই মতোই করেছেন ঘরদোর। বড় বড় রুজু রুজু জানলা, দক্ষিণের বারান্দা, প্রায় ষোলো ফুট উঁচু ছাদ। হাওয়া খেলছে চমৎকার। এখনকার মতো ঢালাই ছাদের গোঁজামিল না দিয়ে কড়ি বরগা লাগিয়েছেন দ্বিগুণ খরচে। রান্নাঘর আর বাথরুমে অসিলেটিং পাখা আছে—তাঁর নজর সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে। ভাবছি তাঁর সম্পর্কে এই সব নানা কথা, এমন সময় শচীনবাবু এলেন। আমি খাটে আধশোওয়া। উনি বসলেন একটা আরাম কেদারায়। বললেন, একটু ঘুমোলেন না—সন্ধ্যের আগেই

চলে যাবেন? আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে যাব বৈকালিক ভ্রমণে। সকালে গঙ্গাস্নান আর বিকালে হাঁটা আমার অবেস। অবশ্য কলেজ না থাকলে। চা খাবেন? করতে বলব?

—তা খেতে পারি, আপনি খাবেন তো?

—না। বিকেল পাঁচটায় হবে আমার চা। আপনার সঙ্গে খেতে পারি একটু চা, কিন্তু কেন খাব? ওটা দুর্বলতা।

—এই দুর্বলতা তো স্বাভাবিক।

—না, খানিকটা শো-অফ করার মতো। যেন আপনাকে সম্মান করা। আপনাকে সম্মান করব কেন? আপনি তো আমার সহকর্মী বন্ধু, আপনাকে ভালবাসি। ভালবাসা, বন্ধুত্ব এসব অনেক বড় জিনিস। ভদ্রতাবশত সঙ্গে চা খাওয়া ঠিক নয়। যাকে মন খুলে সব কথা বলা যায় সেই হল বন্ধু। আমি জানি একসঙ্গে চা না খেলে আপনি কিছু মনে করবেন না। দাঁড়ান, মেয়েকে বলে আসি চা করতে।

চায়ের শুকুম দিয়ে ঘরে আসতেই বললাম, ছেলেমেয়েরা আপনার মতো গুছনো? তারা কি আপনার কথা মতো চলে?

—তারা স্বাধীন। স্বাধীনতা আমারই দেওয়া। ছেলে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে কলকাতায়। হস্টেলে থাকে। মেয়ে এখানকার কলেজেই ইতিহাস পড়ে। বিষয় ওরাই বেছেছে। ওদের জীবনের ছক ওরাই করে নেবে, আমি কেন আমারটা চাপাব? তবে জীবনের শৃঙ্খলা বাড়ি থেকেই পাবার কথা।

জানতে চাই, জীবনের শৃঙ্খলা বলতে আপনি কী বোঝেন?

—খুব সোজা উদাহরণ দিচ্ছি। কোনও বাড়ির বাথরুমে দেখবেন প্রথমে টুথপেস্টের টিউবটা। যদি দেখেন মাঝখানটা টেপা, ডি-সেপড্, বুঝবেন সে বাড়ির সবাই বিশৃঙ্খল। যদি বাড়িতে মেয়ে বা বউ থাকা সত্ত্বেও অতিথিকে চা-খাবার এনে দেয় কাজের লোক তবে বুঝবেন বাড়িটিতে শ্রী নেই। যদি দেখেন একতলার ঘরে হলদে রঙের পর্দা বা সোফাকভার বুঝবেন বাড়ির লোকরা একটু আপস্টার্ট। ভাল খাদবস্তু খাবার সময় যদি কেউ তার দামের কথা বলে তবে জানবেন তাদের বনেদিয়ানা নেই, এক পুকুরের টাকার গরম। কারুর বাড়ি গেলে যদি গৃহকর্তা বা গিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা না করেন বুঝবেন তাঁরা আত্মমর্যাদাহীন। আবার দেখবেন কোনও বাড়ি গেলেন, ফেরবার সময় বাড়ির কর্তা বা গিন্নি দরজা পর্যন্ত এসে আপনাকে বিদায় দিচ্ছেন। বুঝবেন প্রকৃত ভদ্র পরিবার। আমার ছেলেমেয়েদের কথা জানতে চাইছিলেন তো? ওরা এসব ব্যাপারে সতর্ক, সচেতন।

—আপনার অবজারভেসন চমৎকার। দেখে দেখে শিখেছেন?

—বলতে পারেন! তবে দু-একজন লোকের কাছেও শিখেছি। যেমন কৃষ্ণনগর কলেজে যখন পড়াতাম তখন বয়স কম, ছাব্বিশ-সাতাশ! তখন বিয়ে করিনি! সেদিন কলেজ বেরোতে দেরি হয়ে গেছে। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাট পেরিয়ে কৃষ্ণনগরের বাসে উঠতে হবে। তাড়াতাড়িতে খেয়াল করিনি পাঞ্জাবির হাতে বোতাম নেই, মানে ঝিনুকের বোতাম ধোপার বাড়িতে ছিঁড়ে গেছে। কী আর করি, হাত গুটিয়ে নিলাম। কলেজে এসে গোটা তিনেক ক্লাসও করা হয়ে গেছে। তারপরে টিফিনে ধরলেন ইতিহাসের অগ্রজ অধ্যাপক সুনীল চট্টোপাধ্যায়। স্টাফরুমের একপাশে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'হাত গুটিয়েছেন কেন? এটা মোস্ট অন-আকাডেমিক। বোতাম ছিঁড়ে গেছে বলছেন? সেটা কলেজে বেরোবার অনেক আগে দেখতে হত। এডুকেশানিস্ট হওয়া সহজ নয়। ইউ মাস্ট বি ভেরি অ্যালার্ট অ্যান্ড সিনসিয়ার।'

—সুনীলবাবু বললেন একথা?

—হ্যাঁ বললেন। তখন ষাট সত্তর দশকে এ ধরনের খবরদারির চল ছিল। আমি তো অন্তত কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। এ ভুল কোনও দিন আর হয়নি। প্রতিদিন কলেজে আসার ঘণ্টা কয়েক আগে ব্যাগে বইখাতা ভরি যখন, তখন পোশাকটাও চেক করি। ভাগ্যিস সুনীলবাবু রিটায়ার করেছেন নইলে এখন দেখতেন কোনও কোনও অধ্যাপক কলেজে আসছেন লাল গেঞ্জি আর টাইট প্যান্ট পরে।

কথা পালটানোর জন্য শচীনবাবুকে বললাম, আপনার কী কালেকশান আছে দেখাবেন বলেছিলেন? অনেক জায়গায় গেছেন বেড়াতে তার ফটোগ্রাফ?

—না। দেখাব আমার ডিকসেনারির কালেকশান আর একটা গীতবিতান। আসুন পাশের ঘরে। ওইখানে আছে।

সত্যিই একই সঙ্গে চমকিত আর চমৎকৃত হবার মতো দৃশ্য। অন্তত পঞ্চাশ রকমের ইংরেজি অভিধান। ল্যাটিন টু ইংলিশ গোটা পাঁচেক। মনিয়ের উইলিয়ামস থেকে আপ্তে সিরিজ পর্যন্ত সংস্কৃত অভিধান। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত সব ক'টি বাংলা অভিধান। মৃদু হেসে শচীন বলেন, এই ঘরটাতেই আমার সময় কাটে। সবচেয়ে প্রিয় অভিধান কোনটা জানেন? এই যে এইটা। অক্সফোর্ড ডিকশানারির ছোট এডিশনটা। কেন প্রিয় বলুন দিকি?

—আপনার বাবা কিনে দিয়েছিলেন। তাই না?

শচীনবাবু উঠে আমার হাত চেপে ধরেন। এতক্ষণ পরে মানুষটির ভিতরকার ভাবাবেগ বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ দেখলে যাকে ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট-ম্যান মনে হয়, সব কাজে অতিরিক্ত মনস্কতা থেকে যাকে যান্ত্রিক ভাবা যেতে পারে— সে আসলে খুব নরম মানুষ হতে পারে। ফরিদপুরের মাদারিপাড়া গ্রামের সদানন্দ ভট্টাচার্যের ভাগ্যতাড়িত সংগ্রামী জীবনের স্বপ্ন একজন শচীন ভট্টাচার্যকে কেমন করে নির্মাণ করে তা বোঝা সহজ

নয়। একদিক থেকে শচীনের জীবন যেন এক অভিধান। শব্দের সঞ্চয়ের মতো তাতে আছে স্মৃতির সঞ্চয়। অভিধানের শব্দ গুলো নিয়ে যেমন নাড়াচাড়া করতে হয়, শচীনের জীবনের স্মৃতিকণাগুলি তেমনই সর্বদা চঞ্চল, সচল। তাতে ধুলো জমে না। এবারে শচীনবাবু অভিধানের তাকের পাশ থেকে টেনে আনেন দু'খণ্ড গীতবিতান। আমার হাতে দিয়ে বলেন, দেখুন। আমি আসছি।

গীতবিতানের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে কয়েক পৃষ্ঠা উলটে চমকে যাই। এ কী কাণ্ড! যে গান যবে প্রথম শুনেছেন রেডিও রেকর্ডে বা সভায় বা কারুর কণ্ঠে— সেই শিল্পীর নাম, গান শোনার তারিখ ও মাধ্যম লেখা আছে গানের পাশে। যেমন 'কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা' গানটির পাশে লেখা আকাশবাণী। ১৩.৫.৬৫। তড়িৎ চৌধুরী। এই রকম শত শত গান সম্পর্কে প্রথম শোনার স্মৃতি ধরা আছে। গান আমরা অনেক শুনি। অনেকগুলির প্রথম শোনার স্মৃতি মনে থাকে বা থাকে না। কী আসে যায় তাতে? শচীনবাবুর এসে যায় দেখা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকে শচীনবাবু বললেন, দেখছেন? এই গানগুলো আমার সোর্স অফ সাসটিনেন্স। ১১৬ পৃষ্ঠা খুলুন প্রথম খণ্ডের, কী দেখছেন?

দেখলাম: 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে' কৃষ্ণনগর কলেজে পুনর্মিলন উৎসবে মহুয়া সেনের কণ্ঠে প্রথম শোনা ১২.৬.৭৩। চেয়ে দেখি মিটি মিটি হাসছেন ভদ্রলোক, এবারে খুলুন প্রথম খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠা। 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে' কৃষ্ণনগর কলেজে পুনর্মিলন উৎসবে মহুয়া সেনের কণ্ঠে প্রথম শোনা ১২.৬.৭০।

পরিতৃপ্ত মানুষটি হেসে বলেন, খুঁজলে মহুয়া সেনের কণ্ঠে গান শোনার এন্ট্রি অনেক পাবেন। কেন বলুন তো?

—আপনার প্রিয় গায়িকা? কিন্তু নাম শুনিনি কখনও। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রী ছিলেন সত্তর সালে তাই না? তারপর?

—তারপর মহুয়া ভট্টাচার্য।

—তাই নাকি?

—ওই যে দ্বিতীয় গান 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে' ওইটাই দৈবপ্রেরিত গান। বাবার সঙ্গে ওই একটাই সংঘাত হয়েছে আমার জীবনে। বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে বৈদ্য বংশের কন্যার বধূরূপে প্রবেশ সহজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমার গিন্নিই তাঁকে জয় করে ব্যবহারে, কথাবার্তায়। অভিধানের শব্দ আর রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী— আমার জীবনের প্রধান দুটো আশ্রয়। আমার ইচ্ছাপত্রে লেখা আছে কোন কোন রবীন্দ্রসংগীত আমার মৃত্যুর পর গাইতে হবে।

এখনই ইচ্ছাপত্র লিখে ফেলেছেন?

—হ্যাঁ, আর সেই উইল স্ত্রী ছেলেমেয়েকে পড়িয়েও রেখেছি। আসলে মানুষের জীবন আর মৃত্যু তো একই ছন্দে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তা বুঝেছি। আর মৃত্যু মানে শরীরের মৃত্যু নয়, মেধা আর স্মৃতির মৃত্যু। তাই দেহ নিয়ে শবযাত্রা, দাহ, শ্রাদ্ধ, ভোজ কিছুই পছন্দ নয়। জীবনটা হল একটা শিল্প। সাজানোগোছানো, সঞ্চয়ে আর আয়োজনে সুন্দর। তাতে বস্তুর ভার নেই, ভাবময়। তাই দেখবেন যত কিছু আমি জমিয়েছি তার অনুষঙ্গের স্মৃতিটুকু বেশ মনে আছে।

ঘড়ি ধরে বিকেল পাঁচটাতেই দু'কাপ চা হাতে ঢুকলেন গৃহকর্ত্রী। আমি উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললাম, আসুন মহুয়া সেন। আপনার গান তো শোনা হল না।

লজ্জিত হেসে বললেন, ও, মহুয়া সেনের গল্প শোনা হয়ে গেছে? কিন্তু গান শোনানোর যে উপায় নেই!

শচীন বললেন, এই একটা ব্যাপারে আমি খুব কৃপণ। ওর গানে শুধু আমি শ্রোতা। ওর গলায় প্রথম গান শোনার স্মৃতি আমার এখনও মনে আছে। ওর গানে আমি এখনও সেই দিনটাকেই ফিরে পাই। সেই অনুভূতি আমি কাউকে দিতে পারব না। □

কলাপাতা

অভিজিৎ সেন

আমি ব্যাংকে চাকরি করি। আপাতত আঞ্চলিক অফিসের অফিসার। শহর থেকে আটত্রিশ কিলোমিটার দূরের শাখা রাঘবপুরের ম্যানেজার ছুটিতে যাওয়াতে মাস খানেকের জন্য আমি সেখানে ডেপুটেশনে যাচ্ছিলাম। জমি নিয়ে সংঘর্ষে একজন কৃষক নিহত হওয়ায় রাঘবপুরে পরপর দুদিন বন্‌ধ্ ডাকা হয়েছিল। বিবদমান দুইপক্ষই একদিন একদিন করে বন্‌ধ্ ডেকেছিল। জানা সত্ত্বেও আমি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে নিঃসংশয় হলাম যে সত্যিসত্যিই রাঘবপুরে সেদিনও বাস যাচ্ছে না। বাসস্ট্যান্ড থেকে বিফল হয়ে আমি আঞ্চলিক অফিসে এসে হাজিরা দিলাম। রাজনৈতিক বা অন্য যে কোনও কারণে বন্‌ধ্ ডাকলে, আমরা যদি অফিস করতে না পারি, ছুটির দরখাস্ত করে ছুটি নিতে হয়। কাজেই ছুটি বাঁচাতে শহরের অফিসেই এলাম।

আঞ্চলিক অফিসে দৈনন্দিনের কাজ কম। গল্পগুজব করার অবসর একটু পাওয়া যায়। সেই গল্পগুজবের মধ্যেই কথাটা উঠল।

আঞ্চলিক ম্যানেজার প্রিয়তোষ বলল, নতুন ডি.এম. লোকটি আগেরজনের থেকে কাজের হবে বলে মনে হচ্ছে। বয়সও কম, সমস্যা বোঝেও খুব দ্রুত। একদিন মিটিং করেই ব্যাপারটা বোঝা গেছে। সমীর বলল, ভাল তো বুঝলাম কিন্তু জেলাটা তো সরকার বাংলাদেশকেই দিয়ে দেবে মনে হচ্ছে।

আমাদের আঞ্চলিক অফিসের কর্মচারিদের মধ্যে কেউ মুসলমান ধর্মাবলম্বী নেই। কাজেই এখানে 'খোলামনে' কথা বলতে কেউ কোনও অসুবিধা বোধ করে না। সমীরের কথাবার্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, বোধবুদ্ধি সবসময়ই একটু তির্যক। ও কখন যে কী বলে, অনেক সময় আমরা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারি না। আবার অনেক সময় মনে হয়, ওর কথার আগে যে অর্থ ধরেছিলাম, ও বোধহয় তার উল্টো ইঙ্গিতই করেছিল।

ওর কথার উত্তরে নির্বিরোধ প্রিয়তোষ বলল, তা কেন, মুসলমানদের মধ্যেও ভাল লোক আছে। ডি.এম. মুসলমান তো কী হয়েছে?

সমীর চোখ পিট পিট করে বলল, তাই? কিন্তু জেলার তিন কর্তাই যদি মোছলমান হয়?

আমি বললাম, তাতে কী হয়েছে? এক্ষিন কি ব্যাপারটা কাক নজরে পড়েছিল? কোনও অসুবিধা হয়নি তো! বীরেন্দ্র বলল, অসুবিধা হয়নি! আমাদের পাড়ায় গিয়ে দেখুন। মসজিদে নতুন করে চুনকাম করা হয়েছে। মিনারের চারদিকে চারখানা মাইক লাগিয়েছে। সারাদিনের চার পাঁচবার চেল্লানো তো আছেই। তা ছাড়া মোল্লারা মাঝে মধ্যে এলে সভা করে বাণী শোনায়, নানারকমের লিফলেট দিয়ে যায়।

দিল্লি অনেক দূর।

আমাদের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিরা শিখ হোক বা মুসলমানই হোক, তাতে আমাদের এই ছোট শহরটার মানুষদের বিশেষ কিছু আসে না। আমাদের এই শহরটা উত্তরের একটা জেলা সদর। গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রান্তে ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে সেলিম সাহেব যখন এ জেলার শাসক হয়ে এলেন, জেলাবাসী বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল যে জেলার দুই সর্বোচ্চ কর্তার অন্যজন অর্থাৎ এস.পি. সাহেবও মুসলমান! মাসখানেকের মধ্যে আদালত চত্বরের উকিলবাবুরা শহরের অনেককেই জানিয়ে দিল যে ডিস্ট্রিক্ট জজ সাহেব, যিনি বৎসরাধিক কাল ধরেই আছেন এবং একই সঙ্গে পাশের জেলার বিচারবিভাগেরও দায়িত্বে, তিনিও মুসলমান!

আমাদের সবার কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টার মৌলিকত্ব একেবারে উল্টোভাবে অর্থাৎ অবরোহ পদ্ধতিতে ধরা পড়ল। হওয়া উচিত ছিল এই রকম :

১। জজ সাহেব এলেন, ধর্মে মুসলমান।

২। পুলিস সাহেব এলেন, ধর্মে মুসলমান!

৩। কালেক্টর সাহেব এলেন, ধর্মে মুসলমান!!

কিন্তু জেলার কর্তাদের মধ্যে তৃতীয় জন মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়ার পর আমরা সচেতন হলাম যে আগের দুজনও মুসলমান।

এই বিষয়টা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার কারণ একটাই। আমরা বাঙালিরা ধর্ম সম্পর্কে উদার। আমাদের মনোভাব ভারতীয় অন্য প্রদেশবাসীর থেকে অনেক বেশি সেকুলার বা ইহলৌকিক। অনেক বেশির প্রমাণ এই উদাহরণটি। আমি নিঃসন্দেহ যে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের যে-কোনও জেলা সদরে প্রথম মুসলমান কর্তা কাজে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা সবার চোখে পড়ে যেত। আমাদের ক্ষেত্রে চোখে পড়েছে পরপর তিন তিন জন ধারাবাহিকভাবে কাজে যোগ দেবার পরেই। সুতরাং এ বিষয়ে গর্ব আমাদের হতেই পারে।

সমীর প্রিয়তোষের কথার খেই ধরে বলল, ভাল ডি.এমের দরকার কী? কোনও গণ্ডগোল নেই, কোনও ঝামেলা নেই, আমাদের এ জেলা কালেক্টরেটের বড়বাবুরাই চালাতে পারে। আর চালায়ও তাই।

আমাদের শহরে একঘর স্থায়ী মুসলমান গৃহস্থ না থাকলেও একটি বেশ বড় মসজিদ আছে, যার ভিতরের চাতালেই অন্তত শ'দেড়েক লোক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে। হয়ত, কোনও এককালে এই শহরেও মুসলমান বাসিন্দা ছিল। নতুন জজ সাহেব আসার পর তারই উদ্যোগে মসজিদ সংস্কার হয়। নতুন করে নামাজ পড়াও শুরু হয়। বীরেন্দ্রর অস্বস্তির আর একটা কারণ হল, মসজিদের জমি, যা এখনও দখল হয়ে যায়নি, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। সেই পাচিলের সঙ্গে টিনের চালা জুড়ে ভিতর দিকে কয়েকটি খুপরি ঘরও তোলা হয়েছে। শহরে মুসলমান গৃহস্থ না থাকলেও, জেলার গ্রামাঞ্চলে যথেষ্টই আছে। শহরের স্কুল কলেজের হস্টেলে তাদের ছেলে মেয়েদের স্থান সংকুলান হওয়ার নানারকম সমস্যা আছে। জজ সাহেবের সহায়তায় এসব খুপরি ঘর পড়ুয়া ছেলেদের বাসস্থানকল্পেই নির্মিত।

আমি বললাম, তবুও এসব কথাবার্তা হালেই উঠেছে। তিন তিনজন সরকারি কর্তা মুসলমান, এটা ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে ভাবাই যেত না।

টেরা সমীর এ জেলারই লোক। পাশের জেলা মালদার লোকদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং শিক্ষাসংস্কৃতি নিয়ে এ জেলার লোকদের সঙ্গে রেষারেষি আছে। সেই মর্মে প্রচলিত একটা রসিকতা সে খুব জুতসইভাবে শুনিয়ে দিল। সে বলল, হামাকে ঠকাবে! এক ঢোক খেলাম, দু'ঢোক খেলাম, তিন ঢোক খেয়ে ঠিক বাতলে দিলাম মদ লয়, মুত! হামি মালদার ছেল্লে!

আমরা সবাই হাসলাম, মায় বীরেন্দ্রও। তা সত্ত্বেও একথা সমীরকেও মানতে হল যে এক ঢোক দু'ঢোক অব্‌দি জেলার লোকদের মধ্যে কোনও বিরূপভাব ছিল না। কেবল তিন ঢোকের পরেই—

পরদিন আমি সময়মতো গিয়ে রাঘবপুরের শাখা খুললাম। দু'জন লোকের শাখা। ম্যানেজার এবং ক্যাশিয়ার। এ ছাড়া একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রাবণ মার্ডি অবশ্য আছে। ক্যাশিয়ার শিবু একটু গণ্ডগোলের মানুষ। কখন যে তার মাথায় ভূত চাপবে, কেউ জানে না। সিন্দুকের চাবি ভাইয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবে সে। জানিয়ে দেবে অসুখ হয়েছে তার। কখনও কখনও মাসাধিক কালও সে এভাবে অসুস্থ থাকে। তারপর একদিন আবার এসে হাজির হয়। হাতের রেশন ব্যাগের ভিতর থেকে মাংস বা মাছ, সুগন্ধী তুলাই পাঞ্চা চাল, ঘি, কিসমিস, কাজু, পেস্তা, গরমমশলা, আরও সব বাছাই খাদ্যবস্তু এবং সে সব প্রস্তুত করার জন্য নানা ধরনের তেল মশলা বের করে সে। শুধু খেতে নয়, খাওয়াতে এবং সুচারুরূপে রান্না করতেও ভালবাসে সে। ছোট শাখা অফিসে কাজ কম। সারাদিনে পনেরো-বিশখানা ভাউচার হয় কি না সন্দেহ। নামমাত্র হাড়ি কড়াই এবং দু'একখানা বাসন সম্বল করে চমৎকার সংসার করে শিবু। তার রন্ধন-তালিকার মধ্যে থাকে খিচুড়ি, ভাত-মাছের ঝোল, মাংস-ভাত, ফ্রাইড রাইস, পোলাও, এমনকী তিনমাসে একবার বিরিয়ানিও খাওয়ায় সে অফিসের সবাইকে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই কী যেন হয় তার।

মাঝেমধ্যেই কামাই দেয় সে, অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার অসুস্থতা কী ধরনের, তা সত্যি, না মিথ্যা, আমাদের পরিষ্কার ধারণা নেই। অফিসে লোকের খুব অভাব। এই রাঘবপুর শাখায় শিবুর অনুপস্থিতির কারণে ডেপুটেশনে লোক পাঠাতে পাঠাতে আঞ্চলিক অফিসে আমরা হিমসিম খেয়ে যাই। শিবু কামাই দিয়েই যায়, শো-কজ হয় তার বিরুদ্ধে, মাইনে কাটা যায় তার। কিন্তু চাকরি যায় না। আজকাল চাকরি হওয়া খুব কঠিন, যাওয়া আরও।

শিবুর রোগটাকে রাবণ বলে বোঙায় ধরা। আজও তাই বলল। বলল, শিবুদাকে বোঙায় ধরেছে ফের। ভাই এসে চাবি দিয়ে গেল।

যাঃ বাবা! দু'দিন ব্যাংক বন্ধ ছিল। আজ তো একটু ভিড় হবেই। তা ছাড়া আগে থেকে খবর নেই। অন্য জায়গা থেকে লোকের বন্দোবস্ত করা হয়নি। এখন বে-আইনিভাবে দুই চাবির দায়িত্ব নিয়ে আমাকে একা ব্যাংক চালাতে হবে।

রাবণ ও শিবুর মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় ছাড়া আর সব ব্যাপারেই অমিল। প্রতিবছরই সরকারি নানা প্রকল্পে ব্যাংককে

যেন কিছু অনিচ্ছাকৃত ঋণ দাদন করতে হয়। রাবণ এবং শিবু এইসব প্রকল্পের উপভোক্তাদের মধ্যে মুসলমানদের নানা অছিলায় বঞ্চিত করার পক্ষপাতী। এসব নিয়ে একবার পঞ্চায়েত থেকে লিখিত অভিযোগ পাঠালে আঞ্চলিক অফিস থেকে আমাকেই পাঠানো হয়েছিল অনুসন্ধান করতে। রাবণ ভারত সেবাশ্রম সংঘের অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়ে প্রবল হিন্দু হয়ে উঠেছে। শিবু অযোধ্যায় মন্দির তোলার জন্য এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে। অনুসন্ধানে আমি এসবও জেনেছিলাম।

বারোটা পর্যন্ত স্বাভাবিকের থেকে বেশ বেশিই লোকজন এল। তারপর হঠাৎই লোক আসা বন্ধ হয়ে গেল। রাবণ শিবুর সরঞ্জাম নিয়ে চা করার চেষ্টা করতে লাগল। রাঘবপুর একটা পকেট অঞ্চল। যে বড় রাস্তাটা পৃথিবীর সঙ্গে সদর শহরের যোগাযোগ রাখছে, সেই রাস্তা থেকে ভেতরে কুড়ি বাইশ কিলোমিটার ঢুকে যাওয়া একটা রাস্তার মাঝামাঝি জায়গা রাঘবপুর। রাবণ স্থানীয়। তার কাছ থেকে গত দুদিনের বন্‌ধের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে শুরু করলাম। বাস থেকে নেমেই একটা পুলিশ ক্যাম্পের অস্তিত্ব চোখে পড়েছিল।

রাবণের বিবরণ শুনে মনে হল ব্যাপারটা ভারি স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বুঝতে বেশ কঠিন লাগল। সুরেশ সরকার নামে এক ব্যক্তির দশ বিঘা জমির একটা দাগ দিন পাঁচ ছয় আগে জবর দখল হয়ে গেছে। জবর দখলের নিয়ম অনুযায়ী জমির রোয়া ফসলের উপর সবাইকে জানান দিয়ে হাল মই নামিয়ে ফের নতুন করে বীজ গেড়ে দেওয়া হয়। এরপরে পুলিশ জমিটার উপরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে। সেটাও নিয়মের মধ্যে। এই জমি দখলের সময় সংঘর্ষ হয় এবং তাতে তীরবিদ্ধ হয়ে একজন খুন হয়েছে।

সমস্ত বিরোধে দুই বা ততোধিক পক্ষ থাকে। সুরেশ সরকার আজ বছর দশেক হল তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এসে রাঘবপুরে বসতি করেছে। অতি ধীরে সুস্থে হিসাব করে একটু একটু করে সে ওদেশের সম্পত্তি বিক্রি বাট্টা করেছে এবং এদেশে সম্পত্তি কিনেছে, বাড়িঘর করেছে। এদেশি স্বজাতের মধ্যে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিজের প্রতিরক্ষা দৃঢ় করেছে। জ্ঞাতিদের বসতি করিয়ে নিজেকে আরও শক্তিশালী করেছে। আর এসব করার জন্য সব থেকে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গী হয়ে এদেশের মাটির গভীরে শিকড় চালাতে চেষ্টা করেছে।

একাত্তর সালের পরে যারা বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছে তাদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ মোটামুটি গুছিয়ে বসার পর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পক্ষে ক্রমশ বেশি বেশি করে ঝুঁকে পড়ছিল। সুরেশ প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যেই এদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে শুরু করল।

রাঘবপুরের চাষিদের তেভাগার লড়াই করার ঐতিহ্য ছিল। সে নিয়ে বিস্তর উচ্ছ্বাস আছে। সুরেশ পুরোপুরি বেহাত হয়ে যাবে বুঝতে পেরে তার এতদিনের আশ্রয়দাতা দল এই দশ বিঘা জমির দাগটি নিয়ে ছোট একটা চাল দিল। জমিটির প্রাক্তন মালিকের দু'ঘর আধিয়ার ছিল। সুরেশ যখন জমি কেনে তখন টাকা দিয়ে তাদের সঙ্গে রফা করেছিল। এ ব্যাপারেও তার আশ্রয়দাতা দল তার সহায় ছিল। এখন সেই আধিয়ার হঠাৎ তাদের দাবি নুতন করে নিয়ে এসে হাজির হল। ফলে সুরেশ সরকারের সংঘর্ষে যাওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। জমির গাড়া ফসল ভেঙে দিয়ে অন্য কেউ নতুন করে গেড়ে দিলে পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ নেই। পুলিশ বিরোধের জমিটির উপরে একশো চুয়াল্লিশ জারি করতে পারে। কিন্তু জমির ফসল কাটবে যে শেষে গেড়েছে সে-ই। আইন তারপরে চলবে ধীরেসুস্থে। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে। সুতরাং দখল থাকাটা একান্ত আবশ্যক।

বেলা একটা নাগাদ সুরেশের সই করা উইথড্রয়াল স্লিপ নিয়ে মোটর সাইকেল দাবড়ে একজন যুবক এল দশ হাজার টাকা তুলতে। রাবণের চেনা লোক। সুরেশের নামে ফিকস্‌ড্ এবং সেভিংস আমানতে লাখ দুয়েক টাকা আছে। কাজেই এই গ্রাম্য ব্যাংক শাখায় সে খাতির পাওয়ার উপযুক্ত। উইথড্রয়াল স্লিপে অন্যকে টাকা দেওয়ার নিয়ম নেই। গ্রাম বলে এবং সব গ্রাহকেরই মুখ চেনা বলে অনিয়ম হলেও ব্যাপারটা চলে। কিন্তু পরিচিতি যেহেতু আমার সঙ্গে নেই, আমি আপত্তি করলাম। রাবণ আগন্তুককে জিজ্ঞেস করল, সুরেশদা কোথায়? আগন্তুক একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আছে, তবে তার আসতে একটু অসুবিধা আছে।

আমি বললাম, এত টাকা আমি বেয়ারারকে কীভাবে দেব?

লোকটি অধৈর্য বিরক্তিতে বলল, আরে! আগে কতবার নিয়ে গেছি!

রাবণ বলল, চেনা লোক, দিয়ে দিন।

আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে উইথড্রয়াল স্লিপটা হাতে দিলাম। ফিরিয়ে দেওয়ার একটা ছুতো পাওয়া গেল। উইথড্রয়ালের পিছনে সই নেই। ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, পিছনে সই করিয়ে নিয়ে আসুন।

যুবক একটু সময় বিমূঢ় হয়ে কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে, পরে বিরক্ত হয়ে 'ধ্যাত্তেরি' বলে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, এক্ষুনি আসছি।

বাইরের দিক থেকে তার অসহিষ্ণু মোটর সাইকেলের আওয়াজ ছিটকে মুহূর্তে দূরবর্তী হল।

—সুরেশ সরকারের লোক। রাবণ বলল।

—কে সে?

—যার জমির গণ্ডগোলের কথা এতক্ষণ বললাম।

—আর তুমি টাকা দিয়ে দিতে বললে!

—উইথড্রয়াল স্লিপে দিই তো আমরা।

—তা বলে এই সব ঝামেলার সময়? যদি তার একটা কিছু হয়ে থাকে? পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজছে তাকে? যদি সে এখন হাজতে থাকে?

—কিছু এখনও হয়নি তার। টাকা না দিলেই ঝামেলা হবে। কিছু হলে আমি জানতাম। রাবণ বেশ কর্তৃত্বের সুরে এসব কথা বলল। আমি একটু অস্বস্তিতেই পড়লাম। এ ব্রাঞ্চের দায়দায়িত্ব আমার নয়। বেকার কাজ সামলাতে এসে ঝামেলায় পড়ে না যাই। যাইহোক, তবুও একটু স্বস্তি লাগল এই ভেবে যে কাগজের পিছনের সইটা প্রমাণ করবে যে সে ব্যক্তি আছে এবং কাছেপিঠেই আছে। রাবণকে সে কথা বললামও।

রাবণ বলল, তা তো বটেই।

আসলে রাবণের কাছ থেকে সমর্থন চেয়ে আমি একটু আশ্বস্ত হতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, অন্তত রাবণই তো এ ব্রাঞ্চের একমাত্র কর্মী যে এখন উপস্থিত।

বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে লোকটি পুনরায় মোটর সাইকেল দাবড়ে এসে টাকা নিয়ে গেল। পিছনের সই, সামনের সই সব ভাল করে মিলিয়ে নিলাম আমি। নিঃসন্দেহ হবার জন্য কাগজখানা রাবণের দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, ঠিক আছে, না? কাগজের দিকে না তাকিয়েই রাবণ বলল, ঠিকই আছে। তবে ওই উইথড্রয়ালখানাই কি ও আগে নিয়ে এসেছিল?

উরিব্বাস! হারামির হাত বাকসো! আমি বললাম, মানে?

রাবণ বলল, সুরেশদা ওরকম উইথড্রয়াল বাড়িতেও দু'চারখানা সই করে রেখে যায়। খুঁজলে হয়ত আমার ড্রয়ারেও এক আধখানা পাওয়া যেতে পারে। মানেটা আমার মাথায় পরিষ্কার হল। অর্থাৎ রাবণ আমাকে নিয়ে একটু মজা করল। সে জানত লোকটির হাতের কাগজখানা আগের কাগজ নাও হতে পারে। ওর জাতে এমন হিসেবি বজ্জাত আমি আর দুটি দেখিনি। জাত তুলে ওকে গাল দেওয়ার ইচ্ছাটা খুব কষ্টে দমন করে গম্ভীরভাবে বললাম, ড্রয়ার খুলে দেখ এরকম কোনও উইথড্রয়াল তোমার ড্রয়ারে আছে কি না। থাকলে ইমিডিয়েটলি আমাকে দাও। পার্টির সই করা উইথড্রয়াল ব্রাঞ্চের লোকের কাছে থাকাটা ফ্রডের পর্যায়ে পড়তে পারে, তা জান?

আরও তিনদিন থাকার পর রাঘবপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে পুলিশ উঠিয়ে নিল প্রশাসন। ইতিমধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য চার পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সকাল দশটায় আমি যখন ব্রাঞ্চ খুলছি তখন চোখে পড়ল একটা গাড়ি এসে পুলিশ পার্টি নিয়ে চলে যাচ্ছে। সেদিন শিবুও এসেছিল। সে কেমন গম্ভীর, অন্যমনস্ক। তার আড়ালে রাবণ এক ফাঁকে আমাকে বলল, শিবুদার বোঙা মাথা থেকে নামেনি এখনও।

দুপুর দুটোর পরে যখন ক্যাশের হিসাব মিলিয়ে শিবু সিন্দুকে তুলছে, তখন রাস্তার দিক থেকে একটা মিছিলের আওয়াজ পেলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সে মিছিল দেখব ভেবেছিলাম, তা দেখলাম না। লাল ঝাণ্ডা ছিল, কিন্তু সে ঝাণ্ডা তেকোণা। এ ছাড়া গেরুয়া ঝাণ্ডাও ছিল। ধনুর্ধর রামের সংহারক মূর্তির ছবি আঁকা ব্যানার ছিল। ঢাক, ঢোল, কাঁসি ছিল। শঙ্খ আর ঘণ্টার মুহুর্মুহু ধ্বনিও ছিল। অসম্ভব প্রাণবন্ত চার পাঁচশো মানুষের মিছিলের মধ্যে হিন্দুধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংগঠনের পরিচিতিসহ বর্ণোজ্জ্বল ব্যানার ছিল আরও কয়েক রকমের। মিছিলকারীদের স্লোগানে রামজন্মভূমি উদ্ধার এবং রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার জঙ্গি আস্ফালন ছিল। মিছিল যাচ্ছিল বড় রাস্তার দিকে। শিবু সেই মিছিলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তার এক হাতে ক্যাশের ব্যাগ, এক হাতে সিন্দুকের চাবি। কি এক নিদারুণ স্বপ্ন তার চোখে। মিছিল জানালার সামনে থেকে সরে যেতে সে পিছন ফিরে বলল, আজ একটু তাড়াতাড়ি যাব। আমার কার্যকারণ সম্পর্ক মনে পড়ল। সদরে একটা সভা আছে আজ। এই মিছিল এখন ট্রাকে চেপে সেখানে যাবে। শিবুও সেখানে যাবে। রাবণ রাস্তায় গিয়ে মিছিলের সঙ্গে বেশ খানিকটা এগিয়ে, পরিচিতদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ব্যাংকে ফিরে এল।

একটু বাদেই হানিফ মাস্টার নামে এক ব্যক্তি অফিসে এল। এই লোকটির সঙ্গে আগেই বার দুয়েক দেখা হয়েছে আমার। খোঁচা-মারা কথা বলে লোকটি এবং তা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগও করে। নিষ্ঠাবান কিনা জানি না, তবে তাকে আমার অত্যন্ত দাম্ভিক মানুষ বলে মনে হয়েছিল। আর এই দম্ভ তার ধর্মকে কেন্দ্র করেই।

আমার সামনের চেয়ারে বসে হানিফ বলল, মিছিল দেখলেন ম্যানেজারবাবু?

আমি কাজ করতে করতে বললাম, হ্যাঁ দেখলাম।

তা এই অসময়ে?

—পাশ বইটা নিতে এলাম। সে বলল। আমাকে চুপ করে কাজ করতে দেখে ফের বলল, আপনি দেখছি আজ খুব ব্যস্ত। না হলে একটা কথা—

আমি বেশ মাতব্বরি ভঙ্গিতে বললাম, বলে ফেলুন। সে ফের অনুমতির ভণিতা করে বলল, বলি তা হলে? এই যে মিছিল গেল না, এতে সব আছে—ভারত সেবাশ্রম, হিন্দুমিলন, বালক ব্রহ্মচারী, বিশ্বহিন্দু, ইস্কুল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, আনন্দমার্গী, রামকৃষ্ণ—এরা সবাই তো হিন্দু?

আমি কলম থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে তাকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। বললাম, হ্যাঁ হিন্দুই তো। হানিফ বলল, কত রকম হিন্দু।

আমি বললাম, হ্যাঁ হিন্দু বহু রকম। যে তুলসী গাছে, অশ্বত্থ গাছে, মনসা গাছে সিঁদুর লেপে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করে সেও হিন্দু আবার যে মন্দিরে গিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ মূর্তি পুজো করে, সেও হিন্দু। সারাজীবন যে গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ করে সেও হিন্দু।

হানিফ ইতর ভঙ্গিতে বলল, আবার গান্ধী, রামা রাও কিংবা রামচন্দ্রনকে যারা পুজো করে তারাও হিন্দু। তাহলে হিন্দুর ডেফিনেশনটা কী হবে? আমি একটু ভেবে বললাম, হিন্দুর কোনও ডেফিনেশন হয় না। সব মিলিয়েই হিন্দু।

আমি বুঝতে পারিনি হানিফ আমাকে তার পক্ষে সুবিধাজনক কোনও একটা দিকে ঠেলতে চেষ্টা করছে। তাতে সে সফলই হল। বলল, আমি একটা ডেফিনেশন দিতে পারি — যে অহিন্দু নয় সে-ই হিন্দু। হাঃ — হাঃ —

আমি সব সময়ই বিরোধ এড়াতে চাই। বিশেষত এই ধরনের বিষয়ে। কিন্তু হানিফের শেষ কথাটি এবং তার হাসির মধ্যে যে শ্লেষ এবং স্বধর্ম সম্পর্কে যে অহঙ্কারের প্রদর্শন ছিল তা আমাকে বিদ্ধ করল। আমি নিজে কোনও ধরনের ধর্ম আচরণ করি না। আমার স্ত্রী সন্তানরাও এসবের বাইরে থাকে। তবুও হানিফের এহেন উক্তিতে আমি কেন ভীষণ আহত হলাম সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম না। তবে মাথার মধ্যে হঠাৎ কেমন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। এই ব্যক্তির মস্তিষ্কের ভিতরটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। নিজের ধর্মের সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্ব তার কাছে যেমন প্রশ্নাতীত, তেমনই অন্যের ধর্মের সম্পর্কে তার ধারণাগুলি ঠিক এর বিপরীত, এ কথা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। এমন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এমন দুঃসাহসিক ধর্মাভিমানী আমার অভিজ্ঞতায় আর ছিল না।

শিবু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে তার বিষণ্ণ চোখ জোড়া তুলে হানিফকে জিজ্ঞেস করল, আর মুসলমানের ডেফিনেশনটা কী, মাস্টারমশাই?

হানিফ বলল, ম্যানেজার সাহেব রাগ করবেন না, এই ডেফিনেশনটা পণ্ডিতরাই দিয়েছে।

তীর যে ঠিক জায়গায় বিঁধেছে, রক্তপাত না দেখেও সে নিশ্চিত হয়েছিল এবং তার গলার তৃপ্তির উদ্গারও যেন টের পাচ্ছিলাম আমি।

শিবু আবার বলল, মুসলমানের ডেফিনেশনটা বললেন না মাস্টারমশাই?

হানিফ, আল্লার এক ও অভিন্নতা, সম্পূর্ণ নিরাকার অবস্থা এবং পয়গম্বরকে প্রেরিতপুরুষ হিসাবে যারা মেনে নেয়, তাদেরকেই মুসলমান অভিধায় চিহ্নিত করলে, শিবু অসম্ভব ত্যাঁদোড়ের মতো বলল, এটা আপনাদের পণ্ডিতদের ডেফিনেশন। আমাদের পণ্ডিতেরা মুসলমানদের সম্পর্কে আরেকটা ডেফিনেশন দিয়েছে, শুনবেন? — বেশ তো শোনা যাক। হানিফ বেশ উদার। একবারও চোখের পাতা না ফেলে শিবু বলল, কলাপাতার উল্টোদিকে যারা ভাত খায়, তাদের মুসলমান বলে।

হানিফের গর্বিত মুখটা নিমেষে কলাপাতার উল্টোদিকের মতোই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আঞ্চলিক অফিসের খোলামেলা আলোচনায় এ ধরনের কথাবার্তা আমিও শুনেছি। হিন্দুদের মধ্যে এ ধরনের একটা রসিকতা চালু আছে যে, হিন্দুরা যা করবে, কট্টর মুসলমান ঠিক তার উল্টোটা করবে। না হলে কিসে প্রমাণ হবে সে মুসলমান? লুঙ্গির কাছা না থাকা, পশ্চিম দিকে ফিরে ঈশ্বরের আরাধনা, মেঝে কিংবা টেবিলের বদলে বিছানায় বসে খাওয়া, পাতেই হাতমুখ ধোয়া এবং একেবারে মোক্ষম কলাপাতার তলার দিকে ভাত খাওয়া এবং এ রকম আরও অনেক কিছু হিন্দুদের থেকে একেবারে বিপরীত আচারআচরণ এই তত্ত্বের সপক্ষে দেখানো হয়।

হানিফের গোপন রক্তপাত আমাকেও তৃপ্তি দিল। বজ্জাত রাবণ শিবুর প্রত্যাঘাত একটু দেরিতে বুঝতে পেরে দেরিতেই খ্যাক খ্যাক করে হাসল। হানিফ হাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলল, এটা কিন্তু শিবুবাবু দারুণ বলেছেন!

তারপর আপোসের ভঙ্গিতে কলাপাতার তলার দিকে খাওয়ার সপক্ষে দু'একটা যুক্তি দেখাল। আমি হানিফের মুসলমান সম্পর্কীয় অতি সরল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দু'একটা কথা বলতেই পারতাম, কিন্তু বললাম না। ধর্ম নিয়ে আলোচনাতে আমার উৎসাহ কম। তা ছাড়া এ রকম দুই বিরুদ্ধ এবং প্রবল ধর্মাভিমানীর সঙ্গে আমার মতো নাস্তিকের কোনও আলোচনা হতে পারে না, এমন কাণ্ডজ্ঞান আমার ছিল। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, মাস্টার মশাইয়ের পাশ বইটা দিয়ে দাও শিবু। আর তাড়াতাড়ি করো, সাড়ে চারটার বাসটা ধরতে হবে।

হানিফ পাশ বই নিয়ে চলে গেল। ফিরে যাওয়ার সময় তার চোখমুখের চেহারা আর আগের মতো সপ্রতিভ ছিল না। আমি আর ওসব না দেখার ভান করে হিসাবপত্রের দৈনিকের খাতা বই চেক করে উঠে বললাম, বন্ধ করো।

বাসে করে আসতে আসতে রাস্তায় বহু জায়গায় ট্রাকে সভায় যাওয়ার লোকজন দেখলাম। স্লোগান এবং রঙিন পতাকা ফেস্টুনে সমৃদ্ধ মিছিল এখানে সেখানে। বাসের লোকের মধ্যেও এই মিছিল, এই আন্দোলন এবং তাদের নেতাদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও আবেগের প্রকাশ দেখতে দেখতে শহরে এলাম।

মানুষের উৎসাহ দেখে আমি অবাক হচ্ছিলাম। বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাঠে বিশাল সভা হচ্ছে! শহরটা বামপন্থীদের। সাংসদ তাদের, বিধায়ক তাদের, পৌরসভা তাদের। মানুষের বেশির ভাগই তাদের সমর্থক। কিন্তু 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এইসব মানুষের বেশ বড় একটা অংশের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম। সবাই তেমন ধার্মিক না হলেও বিদ্বেষের ইন্ধন নতুন করে যেন চাগিয়ে উঠল। তাদের অনেকেরই একসঙ্গে মনে হল শহরটা — এ জেলাটা মুসলমানের দখলে চলে গেল নাকি? শালাদের কিছু শিক্ষা এবার দেওয়া দরকার! শালারা খুব বেড়ে গেছে!

পরদিন থেকে শিবু আবার অফিসে আসা বন্ধ করল। সকালে অফিসে আসার আগে তার ছোট ভাই বিব্রত মুখে কেশিয়ারের চাবি আমার কাছে দিয়ে গেল। শিবু নাকি ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছে অথবা আদৌ সুস্থই হয়নি। আগের দিন এসে সে অসুস্থতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল বোধহয়, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। দিন তিনেক পরে রবিবার। আমি শিবুর খোঁজ নিতে তার বাড়ি গেলাম। শিবু বিছানায় শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে উঠে বসল।

— কী হয়েছে তোমার? অফিস যাচ্ছ না কেন?

— শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

— জ্বর হয়েছে? পেট টেট খারাপ?

— না ওসব কিছু নয়।

— কিন্তু তোমার তো মাইনে কাটা যাবে! ছুটি তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

— কাল থেকে যাব ভাবছি।

অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিচ্ছিল শিবু। থেমে থেমে। দেয়ালের দিকে দৃষ্টি রেখে। আচমকা মেঝে থেকে একপাটি চটি তুলে দেয়ালের একটা টিকটিকিকে লক্ষ করে ছুড়ে মারল। নির্ঘাত লক্ষ্যে আহত টিকটিকিটা মেঝেতে পড়ে ছটফট করতে থাকলে শিবু উঠে চটি দিয়ে ওটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে এল। বলল, টিকটিকি, ছুঁচো, আরশোলা আমি একদম সহ্য করতে পারি না জানেন?

আমি খুব বিস্মিত হলাম।

শিবু বলল, ওরাও আমাকে দেখে ভয় পায়।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

শিবু বলল, সেদিন একটা ছুঁচো আমাকে দেখে পালাবার পথ না পেয়ে ভয়ে দেয়াল বেয়ে সোজা ওই লাইন অবধি উঠে গেল, জানেন?

আমি তার মুখ চোখের চেহারা লক্ষ করছিলাম, কিন্তু শিবু কিছুই লক্ষ করছিল না।

পরদিনও শিবু অফিসে এল না। আরও দিন সাতেক পরে সকালে অফিস যাওয়ার জন্য রাঘবপুরের বাসে উঠে দেখি শিবু আগে থাকতেই উঠে বসে আছে। আমার জন্য জানালার পাশে জায়গাও রেখেছে সে। তাকে দেখে একটু স্বস্তি পেলাম। কেননা আঞ্চলিক অফিস থেকে কোনও লোকের ব্যবস্থা না করতে পারায় আমাকে একাই ব্যাংক চালাতে হচ্ছিল। আগের দিন মহরমের ছুটি ছিল। রাস্তায় কুমারপাড়া মোড় থেকে চারপাঁচজন স্ত্রীপুরুষ এবং শিশুর একটা পরিবার গাড়িতে উঠল। প্রচণ্ড ভিড় বাসে। অনভ্যস্ত স্ত্রীলোক এবং শিশুরা এ ওর গায়ে পড়তে পড়তে, ঘোমটা এবং কোলের বাচ্চা সামলাতে নাজেহাল হয়ে গেল। পরিবারটি যে মুসলমান, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমাদের। আমি আর শিবু দুজনে একটা সিটে বসেছিলাম। আমি জানালার দিকে, শিবু বাসের ভিতরের দিকে। দলটির স্ত্রীলোকের খুবই অনভ্যস্ত। ওই ভিড়ের মধ্যেও তারা বাসের মেঝেতে বসে পড়ে নিজেদের সামলে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের তিন চার বছরের একটি ফুটফুটে শিশু শিবুর সিটের কাঠের ফাঁকায় হাত আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার পাশে বসা শিবু দু-তিনবার নানা কায়দায় তাকে একটু দূরে সরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। শিশুটির সংস্পর্শে তার শারীরিক অস্বস্তি চোখে পড়ার মতো। সে ফিসফিস করে আমাকে বলল, উঃ, হাত মুখ থেকে মাংসের গন্ধ বের হচ্ছে।

আমি তার বাতিক জানতাম। তাই ঈষৎ হেসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কোনও এক 'বাঙালকে' কলকাতার 'ঘটি' জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার বাসা কোথায়? বাঙাল সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিয়েছিল, হকুন তোর বাপে! অর্থাৎ তোর বাবা শকুন। শিবুর অস্বস্তিতে অনেককাল আগে শোনা গল্পটা আমার মনে পড়ল। বাঙালের যুক্তিটা এরকম, বাসা! বাসায় তো পাখি থাকে (মানুষ থাকে বাড়িতে)! তাহলে এ কলকাত্তাইয়া ঘটি আমাকে মনুষ্যেতর (বাঙাল মনুষ নয়) সাজিয়ে রগড় করতে চায়! সুতরাং চার্জ!

শিবুও এই যুক্তিধারায় মাংসের গন্ধ / মসুলমানের ছেলে / দাওয়াত খেয়ে এসেছে / মহরম / নির্ঘাত গোমাংস! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল।

— তোরা কোথায় যাবিরে?

— আশফাকপুর।

— কোথায় গেছিলি? দাওয়াত খেতে?

— হুঁ।

কার বাড়ি?

— শশর বা —

শিশুটি কথা শেষ করার আগেই ওয়াক তুলে বমি করে ফেলল। শিবুর হাতের উপরে এবং আশপাশের দু-একজনের গায়ে বমি পড়ল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শিবু ছিটকে উঠে দাঁড়াল।

—ইস্—ইস্—বমি—

পরিবারটির তরফে পুরুষদের একজন ভিড়ের ভিতর থেকে কষ্ট করে এগিয়ে এসে পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করে শিবুর হাত এবং জামার উপর থেকে বমি ঝেড়ে এবং মুছে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বলল, চেংড়া ছাওয়াল, কেছু মোনেত নেন না বাহে।

শিবু নিজের সিটে কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে থাকল। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও যেন নিজের ভাবতে পারছিল না সে। কী ঘেন্না—কী ঘেন্না! বমির অংশবিশেষে মাংসের টুকরোর মতো ছিল না? সেগুলো কিসের মাংস! সম্ভবত এরকমই ভাবছিল সে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, তার যেন বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবে। সে আমাকে দেখছিল না, অন্য কাউকেও নয়। বিস্ফারিত চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

রাঘবপুরে নেমে শিবু এমনভাবে হেঁটে ব্যাংকে এসে ঢুকল যেন মনে হচ্ছিল সে নিজে হাঁটছে না। কেউ তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকে সোজা সে পিছনের কলপাড়ে গেল। জামাকাপড় এবং গেঞ্জি খুলে শুধুমাত্র নীচের অন্তর্বাস পরা অবস্থায় প্রথমে সে কয়েক বালতি জল গায়ে ঢালল। তারপর সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচল। গায়ে সাবান দিয়ে অন্তত বিশ-পঁচিশ বালতি জল দিয়ে স্নান করল। আমি ঘরে বসে দীর্ঘসময় ধরে জল ঢালার শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে বাইরে এসে বললাম, ঢের হয়েছে শিবু, এবার বন্ধ করো। না হলে অসুখে পড়বে।

ভিজে প্যান্ট জামা পরে চেয়ারে এসে বসল শিবু। সম্পূর্ণ ভেঙে-পড়া পাগলাটে চেহারা চোখমুখের। আমি বললাম, কী হল? তুমি ও রকম করছ কেন? শিবু বলল, যদি গোরু খেয়ে এসে থাকে? যদি কেন, আমার হাতের মধ্যে একটা মাংসের টুকরো... সে দ্রুত উঠে পিছনের ড্রেনের কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল। প্রাণপণে ওয়াক দিয়ে বমি করতে লাগল। তারপর আরও কিছুক্ষণ ভূতগ্রস্তের মতো বসে থেকে বলল, আজ আমি আর জয়েন করব না। আমি বাড়ি চলে যাব।

শিবু চলে যাবার পর রাবণ বলল, শিবুদাকে আবার বোঙায় ধরল।

দিন তিনেক পরে শিবুর ছোট ভাই আমার বাসায় এসে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে গেল। তার কাছ থেকে শুনলাম শিবু শয্যাশায়ী, অসুস্থ, ডাক্তারের চিকিৎসায় আছে। এ ছাড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত এনে মাথা নেড়া করে, গোবর খেয়ে শাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বাভাবিক হতে পারছে না। এক অজানা আতঙ্ক তাকে তাড়িত করছে এবং কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সে কেঁদে ফেলছে।

দশবারো দিন এভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন তাকে দেখতে গেলাম আমি। তার দিকে তাকিয়ে যে-কোনও লোক বুঝতে পারবে যে সে আর অন্য দশজনের মতো স্বাভাবিক মানুষ ছিল না। সে আর এ জগতের লোকও নয় যেন। আমি তবুও তাকে বললাম, অফিসে যাও। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারো, গল্পগুজব করো। একা ঘরের মধ্যে এভাবে বসে থাকলে এমনিতেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাল পরশু থেকে অফিস যেতে শুরু করো, কেমন? শিবু একইভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ কাল থেকেই যাব।

পরদিন শনিবার। আমি যথাসময়ে রাঘবপুরের শাখায় গেলাম। শিবু আজও অনুপস্থিত। আমরা ভাবলাম শনিবার বলে বোধহয় সে আসেনি। একবারে সোমবারে আসবে। ছুটির পরে বাড়ি ফেরার পথে যখন শহরের বাস স্টপে এসে নেমেছি, দেখি আঞ্চলিক অফিসের সুশান্ত আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বলল, শুনেছেন কিছু?

আমি বললাম, কী শুনব?

—শিবু আত্মহত্যা করেছে।

—আঁ!

—সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল অফিস যাবে বলে। অফিসে না গিয়ে সে নদীর পারের শালবনে ঢুকে গিয়েছিল।

—শালবনে?

—হ্যাঁ, ওখানে বসেই এক বোতল পেস্‌টিসাইড পুরোটা গিলেছে।

—তারপর?

—তারপর বেরিয়ে এসে একটা রিকশ ডেকে তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছিল।

—তারপর?

—হাসপাতালে ঘন্টাখানেক ছিল। তারপরে সব শেষ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহরের মাঝখানে কালেক্টরের অফিসের সামনে এলাম। শিবুরা স্থানীয় লোক। কাজেই মৃতদেহ মর্গ থেকে বের করবার জন্য আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তার বাড়িতে এবং শ্মশানে তো যাওয়া কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুশান্ত বলল, এখানেই দাঁড়ান। এখানেই সবাইকে আসতে বলেছি।

আমরা কালেক্টরেটের উল্টো দিকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়ালাম।

কালেক্টরেট চত্বর থেকে একদল লোক স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসে এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়াল তারা। সামনের দুজনের হাতে ব্যানার। ঠিকাদারদের সমিতি জেলা শাসকের কাছে গিয়েছিল কোনও দাবিদাওয়া নিয়ে।

সম্ভবত ব্যর্থ হয়েছে। ঠিকাদারেরা "জয় শ্রীরাম" তর্থবিলে মুক্ত হস্তে দান করেছে, এ তথ্য জানা ছিল। তাদের চোখে মুখে ক্রোধের ছাপ, গালাগাল এবং জেলাটা 'মুসলমান রাজত্ব' হয়ে যাওয়ায় প্রকাশ্য ও ক্রুদ্ধ আক্ষেপ। তাদের একজন একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে শুরু করল। তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত করা হচ্ছে। তাদের দাবি মানা না হলে তারা মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত যাবে। আদালতে যাবে! ডি.এম. তুমি দূর হটো! এস.পি. তুমি দূর হটো! মুসলমান তোষণ চলবে না! ইত্যাদি।

সোমবার এবং মঙ্গলবার সারাদিন চেষ্টাচরিত্র করার পর শিবুর জায়গায় একজন বদলি ক্যাশিয়ার পাওয়া গেল। নতুন ক্যাশিয়ার রবিউল এ জেলারই লোক। এতদিন মুর্শিদাবাদে ছিল। এবারে সুযোগ পেয়ে নিজের জেলায় এল।

বৃহস্পতিবার টিফিনের পরে হানিফমাস্টার এল। ব্যাংকে ঢুকেই সে সোজা রবিউলের টেবিল গিয়ে বসল।—শিবুবাবুর মৃত্যু খুবই দুঃখজনক ম্যানেজারসাহেব। রবিউলের সামনে বসলেও সে আমার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

—শিবুবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে সুখ ছিল। আমি চুপ করে থাকলাম। হানিফমাস্টার একটু সময় উশখুশ করে বলল, আপনি নীল আরমস্ট্রংয়ের নাম শুনেছেন, ম্যানেজারসাহেব? আমি বললাম, কে? —ও—না—সেই চাঁদে যাওয়া লোকটা?

হানিফ বলল, হ্যাঁ, নীল আরমস্ট্রং মুসলমান হয়েছে, জানেন না? আমি এ ধরনের একটা বিচিত্র প্রসঙ্গে আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, নীল—মুসল—মানে কেন? —কেন? হানিফ সর্বজ্ঞের মতো হাসল। বলল, সে যে-সব জিনিস সেখানে দেখে এসেছে, তাতে তার মুসলমান না হয়ে আর উপায় ছিল না।

আমি কবে যেন কার কাছে হজরত মহম্মদের অলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করার একটা গল্প শুনেছিলাম। আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে নিজের কাজে মন দিলাম।

হানিফ তাতে আদৌ নিরুৎসাহিত না হয়ে বলল, ম্যানেজারসাহেবের বোধহয় কথাটা বিশ্বাস হল না। কিন্তু এ ঘটনার লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে যায়? বলে সাব-ক্যাশ বইটা মেলাতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সাব-ক্যাশ মিলল না। মাথা থেকে হানিফের চিন্তাটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। একজন অতিসাধারণ গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষকের চেতনায় এত অহঙ্কার কীভাবে আসে? আগের দিন শিবুর ঠ্যাটামির কাছে পর্যুদস্ত হওয়া লোকটি নিজের এবং নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে ফের আজ এসেছে। তার ভিতরের তাড়না তাকে শেষ নিষ্পত্তির জন্য যেন খালি খোঁচাচ্ছে। আমি জানি না, একজন কৃষক খুন, রাঘবপুরের মিছিল, আঞ্চলিক অফিসে আমাদের খোলামেলা আলোচনা, শিবুর সর্বাঙ্গ বিষাক্ত হয়ে যাওয়া অশুদ্ধতা, ঠিকাদারদের ক্রুদ্ধ স্লোগান, হানিফমাস্টারের নীল আরমস্ট্রং বিষয়ক গল্প, এসবের মধ্যে কোনও সাধারণ যোগসূত্র আছে কি না।

হানিফ রবিউলের সামনে বসে আছে কিন্তু তার দৃষ্টি আমার দিকে। আমিও এসব ভাবতে ভাবতে তার দিকে মুখ তুলে তাকালাম। রবিউলের সামনে বসে থাকা লোকটির মুখ আমার অন্যমনস্ক চোখের সামনে বদলে আস্তে আস্তে শিবুর মুখের মতো হয়ে যাচ্ছিল। □

বঙ্গসংহার এবং

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

গান্ধীজি এক সময় ভেবেছিলেন জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি পাকিস্তানেই অতিবাহিত করবেন। ১৯৪৭ সালের ৬ আগস্ট গান্ধীজি শ্রীনগর থেকে লাহোর পৌঁছলেন কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য। তখন লাহোর থেকে পাঞ্জাব মেল পাটনা হয়ে সরাসরি কলকাতা আসত। লাহোরে গান্ধীজি সাংবাদিকদের বললেন — 'The rest of my life is going to be spent in Pakistan, maybe in East Bengal or West Punjab, or perhaps the NWFP' (Associated Press of India).

গান্ধীজি কাশ্মীর গিয়েছিলেন মহারাজ স্যার হরি সিংয়ের অনুরোধ রাখতে। দিল্লি থেকে কাশ্মীর রওনা হওয়ার আগে তিনি অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজধানী হিসাবে দিল্লিতে তাঁর শেষ প্রার্থনাসভিক ভাষণে (২৯ জুলাই, ১৯৪৭) বললেন, আজ সকলেই স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। কিন্তু যে স্বাধীনতা তোমরা পেতে যাচ্ছ তা এক টুকরো কাঠের রুটি (wooden loaf)। ওটা যদি তোমরা না খাও তাহলে ক্ষুধার জ্বালায় মরবে। আর যদি খাও তবে কলিকের ব্যথায় মারা যাবে। ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ও নিরাশায় ভরা (...the freedom is an wooden loaf. If you do not eat it you will die of hunger and if you eat it you will die of colic. I can see the future of this independence is dark and bleak....)

লাহোর থেকে পাটনা হয়ে গান্ধীজি সরাসরি কলকাতায় চলে এলেন। দিনটি ছিল ১৯৪৭ সালের ৯ আগস্ট, সকাল আটটা। পাটনা থেকে গান্ধীজি কলকাতায় তাঁর সেক্রেটারি নির্মল বসুকে খবর পাঠিয়েছিলেন। নির্মলবাবু বর্ধমান স্টেশনে গান্ধীজির কামরায় উঠলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে তাঁরা সোদপুর আশ্রমে চলে গেলেন। এদিকে দেশবিভাগের সব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। চূড়ান্ত করা হয়েছে ভারতবর্ষের ২৫ কোটি হিন্দু, ৯ কোটি মুসলমান, ১ কোটি খ্রিস্টান এবং ৫০ লক্ষেরও বেশি শিখকে বিভক্ত করার সব ব্যবস্থা।

দেশবিভাগের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ২ জুন। এই পরিকল্পনা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটি তাদের জরুরি বৈঠকে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে, '....ইংরেজরা ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা দখল করেছিল মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে, সুতরাং ইংরেজদের উচিত হবে ওই শাসনভার মুসলমানদের হাতেই প্রত্যর্পণ করা।'[১] গান্ধীজি ওই প্রস্তাব মেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'তা-ই হোক। মহম্মদ আলি জিন্নাহ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি যা হতে চান, হোন। অন্তত ভারতবর্ষ তো অখণ্ড থাকুক।'[২] দেশকে অখণ্ড রাখার এটাই শেষ চেষ্টা। কিন্তু তিনি তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব থেকে উপেক্ষিত ও পরাজিত সৈনিক।

ভারতীয় মুসলমানদের 'হোমল্যান্ড' পাকিস্তান দ্রুত আদায়ের জন্য মুসলিম লিগ এর একবছর আগে, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে। ওই দিন সকাল হওয়ামাত্রই কলকাতার মিশ্র এলাকায় মুসলিমরা হিন্দুদের আক্রমণ করতে থাকে। পরদিন হিন্দুরা পাল্টা আঘাত করে। ১৬ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট, কলকাতায় এই তিন দিনের দাঙ্গায় খুন হয়েছিল ৬ হাজার লোক, ধর্ষিতা, বিকলাঙ্গ ও অপহৃত হল আরও ২০ হাজার মানুষ। মহম্মদ আলি জিন্নাহ দিনটিকে সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। হিন্দুরা এই রাজনৈতিক হরতালের বিরোধিতা করলে, জিন্নাহ মুসলিমদের এই নির্দেশ দেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেন হিন্দুদের দাবিয়ে রাখা হয়।[৩]

'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় 'শাহিদ' ছদ্মনামে সুরাবর্দি ৫ আগস্ট লিখেছিলেন — হিংসা রক্তপাত ও অশান্তি এমনিতে খারাপ কিছু নয় যদি সেগুলি মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। নিঃসন্দেহে

এখন মুসলমানদের কাছে পাকিস্তানের থেকে প্রিয় ও মহৎ আর কিছু হতে পারে না।[৪]

সুরাবর্দির লেখা এই প্রবন্ধটির নাম ছিল, — 'The Day of Deliverance', এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে 'Day of Deliverance' বা নিষ্কৃতি দিবস কথাটি আসলে মহম্মদ আলি জিন্নাহের। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে ইংরেজ সরকার ভারতের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে নির্দেশ দেয়, জার্মানির বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধ-উদ্যমকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে, যে যুদ্ধ ভারতের জনগণের মুক্তির যুদ্ধ নয়, সেই যুদ্ধের অংশীদার হতে তারা রাজি নয়। এর পরিণতিতে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি থেকে বেরিয়ে আসে। মহম্মদ আলি জিন্নাহ কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগে উৎফুল্ল হয়ে সেদিনটিকে 'Day of Deliverance' বা নিষ্কৃতি দিবস আখ্যা দেন।

অবিভক্ত বাংলার মুখমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) হিসাবে ১০ আগস্ট দিল্লিতে এক বক্তৃতায় সুরাবর্দি ঘোষণা দিলেন, — কংগ্রেস যদি কেন্দ্রে একাই অন্তবর্তী সরকার চালাতে চায় তবে বাংলায় তিনিও এক স্বতন্ত্র সরকার গঠন করবেন। সেক্ষেত্রে 'বাংলা থেকে কেন্দ্রে কোনও রাজস্ব যাবে না এবং আমাদের সঙ্গে কেন্দ্রের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।' প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের প্রাক্কালে এক ঘোষণায় মুসলিমদের উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানালেন — 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' অর্থাৎ লড়াই করে পাকিস্তান আদায় করা হবে। এই ঘটনার মধ্যেই দেশ বিভাগের বীজ নিহিত ছিল।

এই কলঙ্কময় দিনটির সূচনা হয়েছিল সূর্য ওঠার আগেই। ভোরবেলা হাওড়া থেকে একদল মুসলমান হাগলিনদী পার হলেন। তাদের সঙ্গে ছিল লাঠি, ছোরা, বোতল ও লোহার শিকল। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের দোকান আক্রমণ করা। যেহেতু মুসলমানরা দোকান বন্ধ রেখেছিল সুতরাং খোলা দোকানগুলিকে হিন্দুদের দোকান হিসাবে সহজেই চিহ্নিত করা গিয়েছিল। হিন্দুরা, যারা দোকান খুলেছিল তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। কলকাতায় এই ভয়বহ দাঙ্গা 'The Great Calcutta Killings' নামে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে।[৫]

সুরাবর্দির খুড়তুতো বোন শায়েস্তা সুরাবর্দি ইক্রামুল্লাহ তার দাদা শাহিদ সুরাবর্দি সাহেবের যে জীবনী লিখেছেন তাতে এই দাঙ্গার উল্লেখ করেছেন। সেই জীবনীগ্রন্থে শায়েস্তা বলেছেন — আমি সেদিন সকালে দিল্লি থেকে কলকাতায় প্লেনে আসছিলাম। আমার বাবা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় ছিলেন। প্লেনে শুনতে পেলাম কলকাতায় ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দরে দুপুর নাগাদ যখন প্লেন পৌঁছল, তখন সেখানে শহরে পৌঁছবার জন্য ট্যাক্সি বা অন্য কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি ও কয়েকজন বিদেশি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা অনেক কষ্টে একটা বড় গাড়ির ব্যবস্থা করলাম। সেই গাড়ি করে শ্যামবাজার হয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে চৌরঙ্গি পেরিয়ে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে পার্ক সার্কাসে আমাদের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। সারা পথে আমি যা দেখেছি, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা মানুষকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কখনও কল্পনায়ও আসে না। এই ঘটনা বহুদিন আমাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করেছে।[৬]

তবে এই ঘটনার জন্য শায়েস্তা তাঁর দাদা সুরাবর্দিকে দায়ী করতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য হল — সুরাবর্দি সাহেবের প্রখর-ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক দৃঢ়তার ফলে তাঁর নিজের দলেই (অর্থাৎ মুসলিম লিগে) অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারাই ১৬ আগস্টের দিনটিকে তাঁর শাহিদ ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।

অন্যদিকে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির প্রধান খান আবদুল ওয়ালি খান (সীমান্ত গান্ধীর পুত্র) তাঁর স্মৃতিকথায় ১৬ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন — 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস কার বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল? এটা নিশ্চিতভাবেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল। কারণ, মহম্মদ আলি জিন্নাহ 'হিন্দু কংগ্রেস' 'হিন্দু কংগ্রেস' বলে চিৎকার করে আসলে মুসলমানদের এমনভাবে খেপিয়েছিলেন যেন হিন্দুরাই পাকিস্তান সৃষ্টির একমাত্র অন্তরায়। বাংলা ছাড়া আর কোনও প্রদেশে ১৬ আগস্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' মুসলমানদের মনে খুব বড় দাগ কাটতে পারেনি। যেহেতু বাংলায় মুসলিম লিগের মন্ত্রিসভা ছিল সেই সুযোগ নিয়ে কলকাতাকে লিগ সরকার এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যার পুরো দায়িত্ব তাদেরই উপর বর্তায়। দাঙ্গার প্রথম এক-দু'দিন হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের ধন-সম্পত্তি লুঠ হয়েছে কিন্তু পরিণামে সামগ্রিকভাবে ক্ষতি হয়েছে এবং প্রাণহানি হয়েছে মুসলমানদেরই বেশি। কারণ, কলকাতা শহরে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা অনেক বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা প্রত্যাঘাত করেছে, ফলে এই পরিণতি।[৭]

কলকাতা দাঙ্গার খবর পেয়ে বিচলিত ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ২৫ আগস্ট কলকাতায় এলেন। গান্ধীজি তখন কলকাতায় আসেননি। বোধ হয় তিনি ভেবেছিলেন যে কলকাতা একটা প্রদেশের রাজধানী, যেখানে সরকার আছে, পুলিশ আছে, জননেতারা আছেন। সবথেকে বড় কথা হল যে ওই শহরে ব্রিটিশ বণিকদের বিপুল বাণিজ্য-স্বার্থ রয়েছে। সর্বোপরি এত বড় একটা শহরে আক্রান্তরা আত্মরক্ষার একটা পথ খুঁজে পাবেই।

কলকাতা দাঙ্গার মাত্র সাতটি সপ্তাহ পার না হতেই অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে নোয়াখালি জেলার তিনটি প্রত্যন্ত থানা রামগঞ্জ ও লক্ষীপুরের চর এলাকায় এবং

উপকূলবর্তী গ্রামগুলিতে হিন্দুরা আক্রন্ত হলেন। এদিকে কলকাতা দাঙ্গার বদলা হিসাবে বিহারে দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেছে। মুসলিম লিগ ততদিনে কেন্দ্রে অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিয়েছে এই সরকারের এক নম্বর মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং নিখিল ভারত মুসলিম লিগের সভাপতি ও যোগাযোগ মন্ত্রী সর্দার আবদুর রব নিশতার বিহারের পরিস্থিতি দেখতে পাটনা গেলেন। তাঁরা দু'জন পাটনা থেকে দিল্লি ফিরে বিহারের পরিস্থিতি নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবদুর রব নিশতার গান্ধীজিকে বিহার যেতে অনুরোধ করলেন। ততদিনে গান্ধীজির কাছে নোয়াখালি দাঙ্গার বিশদ রিপোর্ট পৌঁছে গেছে। তিনি বিহারে না গিয়ে নোয়াখালি যাওয়াই স্থির করলেন। আর দিল্লি থেকে নোয়াখালি রওনা হবার আগে তিনি পেশোয়ারে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খানকে এক জরুরি বার্তা পাঠিয়ে তাঁকে অবিলম্বে বিহারে যেতে বললেন।

২৯ অক্টোবর বিকালে গান্ধীজি সোদপুর আশ্রমে এসে পৌঁছলেন। সোদপুরে পৌঁছনোর পরই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, কিরণশঙ্কর রায় ও বরিশালের সতীন সেন। তাঁরা নোয়াখালি সম্পর্কে গান্ধীজিকে রিপোর্ট দিলেন ও বললেন যে নোয়াখালি দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পূর্ববাংলার জেলাগুলিতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে ভয়ানক ভীতি ও আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়েছে। নোয়াখালির পাশের জেলা ত্রিপুরারও কয়েকটি এলাকায় হিন্দুদের উপর আক্রমণের কিছু ঘটনার রিপোর্টও তাঁরা গান্ধীজিকে দিলেন। ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর প্রায় প্রতিদিনই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) হুসেন শাহিদ সুরাবর্দি সোদপুরে এসে গান্ধীজিকে অনুরোধ করতেন, তিনি যেন নোয়াখালি সফর বাতিল করেন। নোয়াখালি না যাওয়ার জন্য সুরাবর্দির এই পীড়াপীড়ির জবাবে গান্ধীজি শাহিদ সাহেবকে বলেন, "শাহিদ, তোমার কি লুকনোর কিছু আছে? তবে তুমি কেন আমাকে নোয়াখালি যেতে বারণ করছ?"[৭]

সুরাবর্দি এদিকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসই কলকাতার উপর তাঁর রাজনৈতিক শক্তির পরিচয় দেবার প্রেষ্ঠ সময়। তিনি অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করলেন, 'অস্ত্র ধারণ কর, হিন্দুদের হাতে হত হবার আগে তাদের হত্যা কর।'[৮] ১৬ আগস্ট-এর পদযাত্রায় সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

৩ নভেম্বর গান্ধীজি বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বারোজের সঙ্গে দেখা করে নোয়াখালির পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন। এই আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের সামরিক প্রধান জেনারেল রয় বুচার (st General Roy Butcher G.O.C. in C, Eastern Command)। জেনারেল গান্ধীজিকে বললেন, তিনি নোয়াখালিতে সামরিকবাহিনী মোতায়েন করতে চান। গান্ধীজি তাঁকে সাফ জবাব দিলেন, সামরিকবাহিনী যদি প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করে তা হলে ওই সামরিক সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, তাতে কোনও ফল হবে না। ৪ নভেম্বর গান্ধীজি তাঁর নোয়াখালি যাবার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে ফেললেন এবং পরিকল্পনা মাফিক সব কিছু করার জন্য তাঁর সেক্রেটারি নির্মলকুমার বসুকে নির্দেশ দিলেন। ৬ নভেম্বর সকালে ট্রেনে ওঠার আগে গান্ধীজি সোদপুর আশ্রম থেকে দু'খানা চিঠি লিখলেন। প্রথমখানা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ও অন্যটি জওহরলাল নেহরুকে। সর্দারকে তিনি যে চিঠি দিলেন, তার বয়ান ছিল — কলকাতার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় বেরিয়েছে যে তুমি এলাহাবাদে সাংবাদিকদের কাছে সুরাবর্দি ও মুসলিম লিগকে এই বলে খুঁশিয়ারি দিয়েছ, যদি বাংলার প্রাদেশিক সরকার হিন্দু হত্যা বন্ধ না করে তা হলে বিহারের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং অন্য প্রদেশগুলিতে এর প্রতিক্রিয়া পড়বে। তোমার এই বিবৃতি সত্য কি? জওহরলাল নেহরুকে লিখলেন : বিহারের ঘটনা সম্পর্কে খবরের কাগজে যেসব খবর বেরিয়েছে তার একাংশ যদি সত্য হয়, তা হলে বিহারের প্রাদেশিক সরকারের সরকার পরিচালনার কোনও অর্থই থাকে না। সব অপকর্মের জন্য কেবল গুণ্ডারাই দায়ী, এ-কথা মানতে আমি রাজি নই এবং এটা অসত্য...।

সেদিন বেলা তিনটেয় গান্ধীজি গোয়ালন্দ স্টিমারঘাটে পৌঁছলেন। ইংরেজ স্টিমার কোম্পানি গান্ধীজির জন্য একটি আলাদা স্টিমারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এই স্টিমার গান্ধীজিকে চাঁদপুরে নিয়ে যাবে। স্টিমারঘাটে গিয়ে দেখা গেল হাজার হাজার ছোট বড় নৌকা পয়ার বুকে ভাসছে।

নৌকার গুলুইতে লোকেরা বসে আছে গান্ধীজিকে দেখার জন্য, এ ছাড়া আরও নৌকা ঘিরে রয়েছে স্টিমারের দু'পাশে।

স্টিমারের উপর ডেটির দুপাশে কোম্পানির সাহেব ও ভারতীয় অফিসারেরা দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টিমারের সারেঙ ও খালাসিরা। তারা কেউ কেউ গান্ধীজিকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। গান্ধীজি স্টিমারের দোতলায় উঠে গিয়ে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে নৌকায় অপেক্ষমান হাজার হাজার মানুষকে নমস্কার করলেন। জনতা তাঁর কথা শুনতে চাইল। তখন ডেকের উপর বসে তিনি উঁদের বললেন, 'আমি নোয়াখালিতে যাচ্ছি কেবল একটি কথা হিন্দুদের বলতে। সেটি হল, হিন্দুরা যেন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে না যায়। নোয়াখালি জেলায় হিন্দুরা সংখ্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও তাদের মুসলমানদের সঙ্গেই বাস করতে হবে। আত্মসম্মানের সঙ্গে কোনও আপস না করেই হিন্দুদের তা করতে হবে।'[১০] চাঁদপুরে স্টিমার পৌঁছল সন্ধ্যায়।

৭ নভেম্বর সকাল ১০ টায় চাঁদপুর থেকে ট্রেন ছাড়ল

নোয়াখালির চৌমোহনির উদ্দেশে। প্রতিটি স্টেশনে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। গাড়িতে বসেই প্রত্যেক স্টেশনে অপেক্ষমান জনতাকে গান্ধীজি বললেন, সাহস ও নির্ভীকতা নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। ভয় করলে চলবে না। বাস্তালির কাছে এটা যেন রবীন্দ্রনাথের কথা। লাকসাম জংশন স্টেশনের কাছে নোয়াখালির শরণার্থীদের জন্য একটি বড় শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। নোয়াখালির উপদ্রুত গ্রামগুলি থেকে অত্যাচারিত কয়েক হাজার হিন্দু এই শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। গান্ধীজি প্লাটফর্মে নেমে কিছু শরণার্থীর সঙ্গে কথা বললেন এবং সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। বিকালে ট্রেন চৌমোহনি পৌঁছলে গান্ধীজি ট্রেন থেকে নামলেন। এই চৌমোহনিতে যোগেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে গান্ধীজির কয়েকদিনের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হল।

চৌমোহনিতেও একটি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে দাঙ্গাপীড়িতদের জন্য। এই শিবিরটি পরিচালনার দায়িত্ব সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ করেছে কংগ্রেস, আর এস. পি. এবং খাদি সংগঠন অভয় আশ্রমের কর্মীবৃন্দ। ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় ত্রাণ শিবিরের কাছে গান্ধীজির প্রার্থনাসভার আয়োজন করলেন এই কর্মীরা। গান্ধীজি প্রার্থনাসভায় যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়েই দেখলেন দু'জন লোক ঘরের বাইরে একটি বেঞ্চে পাশাপাশি চিন্তিত হয়ে বসে আছে। তাঁদের মধ্যে একজন সাহেব। গান্ধীজিকে দেখেই তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। ইংরেজ ভদ্রলোক গান্ধীজিকে নমস্কার করে বললেন, "আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই.এফ. ম্যাকিনার্নি।" পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয়কে দেখিয়ে ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "ইনি এস. এম. আবদুল্লা, আমার জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট।" গান্ধীজি আবদুল্লার দিকে এগিয়ে গিয়ে সহাস্যে বললেন, "তুমিই হলে সেই আবদুল্লা, তোমার কথা আমাকে অনেকে বলেছে। তারা বলেছে, তুমি একটি কুখ্যাত লোক। তুমি নোয়াখালিতে আক্রান্ত মানুষদের রক্ষা তো করোইনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে আক্রমণকারীদের উৎসাহ দিয়েছ। এটা কি সত্যি?"[১১] নোয়াখালির পুলিশ সুপার আবদুল্লা গান্ধীজির সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। গান্ধীজি আবদুল্লার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "যা হোক এখন তো তুমি আমার সঙ্গে এসো।"[১২] যে পুলিশ সুপার আবদুল্লার বিরুদ্ধে নোয়াখালির হিন্দুদের অভিযোগ পুঞ্জীভূত সেই আবদুল্লাকেই সঙ্গে নিয়ে মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনাসভায় এলেন। মহাত্মাজির সঙ্গে আবদুল্লাকে দেখে প্রার্থনাসভার শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। গান্ধীজি তাঁকে তাঁর পাশে বসতে বললেন।

চৌমোহনিতে তিনদিন থাকার পর গান্ধীজি নোয়াখালির দত্তপাড়া গ্রামে প্রবেশ করলেন। এই গ্রাম থেকেই আরম্ভ হল নোয়াখালির উপদ্রুত গ্রামগুলিতে তাঁর ঐতিহ্যাসিক যাত্রা। দত্তপাড়া, কাজিরশিল, শ্রীরামপুর, লক্ষীপুর এই চারটি গ্রামে তিনি তাঁর আস্তানা করে নিলেন। যে গ্রামগুলিতে মেয়েরা বেশি নির্যাতিতা হয়েছিলেন, সেই গ্রামগুলিতে পাঠিয়ে দিলেন হেমপ্রভা মজুমদার, সুশীলা নায়ার ও সুচেতা কৃপালনিকে। নোয়াখালি এমনই একটি জেলা যেখানে বছরে ন'মাস জলে পরিবহণ। জল কাদা ভেঙে বাঁশ ও সুপারি গাছের সাঁকো পেরিয়ে প্রায় সাড়ে চার মাস তিনি নোয়াখালিতে ছিলেন। যে-গ্রামগুলিতে গান্ধীজি শিবির স্থাপন করেছিলেন, সেখানকার আক্রান্ত ও আক্রমণকারী উভয় সম্প্রদায়ের বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন। আটকে রাখা ধর্মান্তরিত হিন্দুদের উদ্ধার করেছেন। যে সকল মৌলবি হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছিলেন। তাদের বাড়ি গিয়ে তিনি কোরান চেয়েছেন। বলেছেন, আমাকে দেখিয়ে দাও এই ধর্মান্তর করে তুমি আল্লাহর কতখানি কাছে যেতে পারবে? সেইসব মুসলমানরা লজ্জিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করেছে, গান্ধীজির সামনে আল্লাহর কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

সারা দেশের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজি কেন নোয়াখালিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন? এর উত্তর গান্ধী দিয়েছেন তাঁর ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার সেক্রেটারি কৃষ্ণাসকে। নোয়াখালিতে বসেই কৃষ্ণদাসকে তিনি বলেছিলেন — "আমি কেন বাংলার এই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এতদিন ধরে পড়ে আছি? এই জেলার হিন্দুরা এতই সংখ্যালঘিষ্ঠ যে তাদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু কেন তারা সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রতিবেশীদের মতোই থাকতে পারবে না?"[১৩]

নোয়াখালির পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এস. এম. আবদুল্লা যাঁকে ওই জেলার প্রতিটি হিন্দু হিন্দু-বিদ্বেষী বলে মনে করত, সেই আবদুল্লা গান্ধীজির এক অনুগত ভক্তে পরিণত হলেন। তিনি গান্ধীজিকে জানিয়েছিলেন কীভাবে মুসলিম লিগের নেতা ও সক্রিয়বাদীরা জেলার প্রশাসনকে কব্জা করে ফেলেছে। সদরে বসে পুলিশ সুপার এবং তাঁর অধস্তন অফিসাররা গ্রাম এলাকার পরিস্থিতির খবর পাচ্ছেন না। গান্ধীজির সঙ্গে আবদুল্লার এই মানসিক ও আত্মিক নৈকট্য মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি খুবই অপছন্দ করলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন টেলিগ্রামে আবদুল্লাকে নোয়াখালি থেকে মুর্শিদাবাদে বদলি করে দিলেন। সরকারি অফিসার হিসাবে তিনি এই নির্দেশ মেনে নিয়ে গান্ধীজির আশীর্বাদ চাইলেন।

[সূত্রনির্দেশগুলি পরবর্তী কিস্তিতে উল্লেখিত হবে।]

অন্য ভাষায় অন্য কবির চোখে

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যে শরীরে যে কবিতার জন্ম, তার বাইরে সে কবিতার কোনও অস্তিত্ব নেই, যেমন নাটক হ্যামলেটের বাইরে কোনও অস্তিত্ব নেই তার নায়ক হ্যামলেটের। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলিকেও তাঁর বাংলা কবিতা ও গানের অনুবাদ কোনও ক্রমেই বলা চলে না। "In the deep shadows of raining july"—কে যদি কেউ "আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহ"-এর ইংরেজি অনুবাদ বলে চালাবার চেষ্টা করে, লোক ঠকানোর দায়ে তাকে পুলিশে দিলে অন্যায় হয় না। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের দিক দিয়েই যাননি। অসম্ভবের সাধনা করে লাভ কী? ফিটজেরাল্ড করেননি, তাই তাঁর ওমর খৈয়াম লোকের মুখে মুখে ফিরেছে।

পণ্ডিতেরা যাচাই করেন, মূলের সঙ্গে অনুবাদ কতদূর মিলল, কবিতার পাঠক তার কি পরোয়া করে? সে তো ফারসি জানে না, হিব্রু জানে না, এবং ইংরেজি গীতাঞ্জলি যার জন্য রচিত, সে বাংলা জানে না। তার কাছে অনুবাদটিই মূল, তার আনন্দের, তার বেদনার, তার রোমাঞ্চের তার গভীর আত্মিক মন্থনের তার অনাস্বাদিতপূর্ব এক অভিজ্ঞতার মূল কারণ।

তা হলে কি অনুবাদ কোনও সম্পর্ক রাখবে না তার মূলের সঙ্গে? অবশ্যই রাখবে, নইলে অনুবাদ করা কেন? কিন্তু কতটুকু সম্পর্ক রাখবে, কীভাবে রাখবে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর আপনার আমার দেবার কথা নয়, যিনি অনুবাদ করেন, তিনিই এর উত্তর দেন। আমরা এইটুকু মাত্র বলতে পারি, যে কারণে মূল কবিতা অনুবাদ করবার তাগিদ অনুবাদক অনুভব করেন, যে প্রাপ্তিটাকে তিনি মূর্ত করতে চান অন্য এক ভাষায়, সেটা অনুবাদের পাঠকের কাছে পৌঁছনো চাই, অনুবাদক যদি কবি না হন, তা হলে তা কখনওই সম্ভব নয়।

জো উইনটার নিজে কবি। দ্বিতীয়ত, তিনি বর্তমানে শান্তিনিকেতনের অধিবাসী, বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক। তাই, ধরে নেওয়া যায়, আমাদের রীতিনীতি আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, আমাদের জল, মাটি, আমাদের প্রকৃতি, আমাদের ঋতুচক্র, আমাদের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের অধ্যাত্মচেতনা তাঁর সম্পূর্ণ অজানা নয়। কবিতাকে, কবিকে এ-সব থেকে আলাদা করা যায় না। তাই অনুবাদকের ভূমিকার প্রথম দিকেই যখন পড়ি:

Rabindranath (poets in this part of the world who become "part of the family" are often called by their first name) was born in....

তখন অবাক হয়ে থমকে যেতে হয়। তা হলে কি শান্তিনিকেতনের বাঙালিরা এখন পরস্পরকে মি. দাস, মি. ঘোষ বলে ডাকতে শুরু করেছেন? উইন্টার কি জানার সুযোগ পাননি যে পদবীতে নয়, বাঙালিদের পরিচয় প্রধানত তাদের নামে (বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রাম, শ্যাম, যদুবাবু, হরিবাবু)? রবীন্দ্রনাথ বলে পরিচিত হবার জন্য তাঁকে ঘরের লোক হতে হয়নি। এই যদি বাঙালি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের বহর হয়, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কী মূর্তি নেবে তাঁর হাতে পড়ে, কে জানে? তারপর দেখি, না, অবশ্যটা অন্তত মারাত্মক নয়, ওই বিশেষ জায়গাটাতে জানে একটা ঘাটতি ছিল, যাকে ইংরেজিতে বলা চলে lacuna।

অনুবাদের বিষয়েও আগে যা বলেছি তার সূত্র ধরে বলি, সব জায়গায় অতটা মূলানুগ না হলেই ভাল হত। যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু, এবার এ জীবনে", তখন বুঝতে হয় এ দেখা শুধু চোখের দেখা নয়, দূর থেকে তাজমহল দেখার মতো। এ বরং কতকটা রাত্রিশেষে সূর্যের দেখা পাওয়ার মতো। "Not to have seen you, Lord", বললে বড়ই কম বলা হয়, তেমনই "ধ্যান-গম্ভীর ওই যে ভূধর"—এর অনুবাদ "these thought-clad mountains" করলে, ভারতীয় ঐতিহ্যের ভূমি থেকে পর্বতের কল্পনাকে একেবারে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পটভূমিতে স্থাপন করা হয়। এও অজ্ঞানতারই ফল। এবং এইরকম অজ্ঞানতার কারণেই কতকটা অন্ধভাবে মূলের আক্ষরিক অনুগমন করতে হয়, যার ফলে অনেক সময়ে তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য থেকে আমরা দূরে চলে যাই। যেমন, যেখানে আছে:

এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত
এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।

সেখানে অনুবাদ যদি হয় 'in form of vast and various law', তা হলে ঈশ্বরের বিচিত্র বিধানকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার স্তরে নামিয়ে আনা হয়। কিংবা, উইনটার যদি Mosaic law-র কথাই ভেবে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যের জগৎ থেকে সে অনেক দূরে।

অথচ উইন্টার কবি, সাধারণভাবে বেতে গেলে গীতাঞ্জলির

জগতে তিনি একান্ত বিদেশি বলে মনে হয়নি, অনুবাদে যেখানে তিনি নিজে অনুপ্রাণিত বোধ করেছেন, সেখানে তাঁর অনুবাদও সুন্দর হয়েছে।

The dream of night has run has run—
The chain is now undone, undone,
Life's barrier has ceased to be
Into the world I am set free
In the lotus-petals of my heart
a blossoming has begun, begun
(নিশার স্বপন ছুটল রে এই ছুটল রে)
কিংবা 'যেথায় থাকে সবার অধম'-এর অনুবাদ :
Among the meanest your feet go

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কোথায় উইন্টার সার্থক হয়েছেন, কোথায় হননি, কোথায় তার লেখা কবিতার স্তরে পৌঁছেছে, কোথায় পৌঁছয়নি এ বিচার কোনও দিন শেষ হবে না, মোটের ওপর আমরা বলতে পারি, যাঁরা বাংলা জানে না তাঁদের কাছে তো বটেই, যাঁরা বাংলা কবিতাগুলি পড়েছেন তাঁদের কাছেও, এই অনুবাদ গ্রহণীয় হবে, কেননা তাঁরাও দেখবেন, আরেকজন কবির চোখে, তাঁর ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কী মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

পরিশেষে উল্লেখ করতেই হয়, রাইটার্স ওয়ার্কশপের বইয়ে আমরা যা দেখি, এ বইয়েরও ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি উচ্চমানের, আমাদের প্রকাশকদের অনুকরণের যোগ্য। □

The Gitanjali of Rabindranath Tagore / Translated by Joe Winter / Writers workshop, Calcutta 45 / 100.00

ইস্যুগুলি ভবিষ্যতেও বিতর্ক জিইয়ে রাখবে

পুলকনারায়ণ ধর

সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজ্যপাট' পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক 'ইস্যু' নিয়ে প্রবন্ধের সংকলন।

১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এই রচনাগুলি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় তো আছেই, সেই সঙ্গে লেখক রচনাগুলিকে আরও একটি বিষয়ে ভাগ করেছেন। তা হল 'দুর্নীতি' বিষয়ক রচনা।

বলা বাহুল্য গুরুগম্ভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ বলতে সাধারণত যা বোঝায় এই প্রবন্ধগুলি আদৌ সে পর্যায়ের নয়। কিন্তু সময়ের বিচারে ও দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব আছে। চলমান ঘটনাকে চলিষ্ণু মন তাৎক্ষনিক উত্তেজনায় সব সময় যথার্থ বিচার করতে সক্ষম নয়। এর জন্য আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন। অপেক্ষা করতে হয় ফিরে দেখার সুযোগের জন্য। সুতরাং ১৯৯৩ সালের যে ঘটনা আমরা সেই সময়ের কাগজে পড়েছি তা ১৯৯৮ সালে পড়লে আমাদের সুস্থিত এবং অভিজ্ঞ মস্তিষ্ক হয়ত নতুন করে যথাযথ বিশ্লেষণে সক্ষম হবে। লাভ আরও একটি আছে। অপেক্ষাকৃত নতুন ও ভবিষ্যৎ পাঠকরা তাদের পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনাবলি সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ থেকে বহমান ঘটনাবলির পরম্পরাকেই খুঁজে পেতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রবন্ধ সংকলন সর্বদাই উপযোগী ও কাম্য। ফিরে দেখা বা পড়াটাও অনেকের কাছে উপভোগ্য। সাংবাদিক তথন কী বলেছেন এবং আজ কী বলছেন তাও অনেকের কৌতূহলের বিষয় হতে পারে।

গ্রন্থটিতে রাজনীতি বিষয়ে স্থান পেয়েছে মোট বাইশটি প্রবন্ধ। এর মধ্যে কংগ্রেস বিষয়ক পনেরোটি এবং জ্যোতি বসু বা সি. পি. এম সম্পর্কে মোট সাতটি প্রবন্ধ আছে। কংগ্রেস সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির বেশির ভাগই আবার মমতা বন্দোপাধ্যায়ই দখল করেছেন—প্রায় নয়টি।

লেখক পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম শাসিত সরকারের ক্রিয়াকলাপের এবং দলের সংকীর্ণ রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন রচনায়। কিন্তু জ্যোতি বসুকে কিছুটা এই বৃত্তের বাইরে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। সিপিএমের সঙ্গেই যে জ্যোতি বসু নামক অসহায় ব্যক্তিটির লড়াই এ সম্বন্ধে লেখকের কোনও সংশয় নেই। জ্যোতি বসুকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণে বাধা দিয়ে সিপিএম 'ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা' করেছে বলেই লেখকের ধারণা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জ্যোতিবাবু দৃশ্যপট থেকে সরে গেলে 'সর্বভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে বাঙালির দুরবস্থা প্রায় অবশ্যম্ভাবী।' কারণ, জ্যোতিবাবুর পরে যিনিই মহাকরণে আসুন তিনি হবেন 'লিলিপুট' যার দিকে ভারত আর সসম্ভ্রমে তাকাবে না। জ্যোতিবাবুর অনন্যতা স্বীকার করেও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। বাঙালির জন্য জ্যোতিবাবু কী করে গেলেন তা বাঙালিরা করে বুঝবেন? লেখক অবশ্য এই বিশ্লেষণে যাননি। মনে হয়, ইতিহাস জ্যোতিবাবুর মূল্যায়ন সময় হলেই করবে। তবে লেখক যখন বলেন "হাজার প্রলোভন সত্ত্বেও সেই ১৯৪৬ সাল থেকে জ্যোতিবাবু কোনও দিন বিধানসভার আঙিনা

ছেড়ে বের হননি" (পৃ: ১৪) তখন ধন্দ লাগে। কারণ বিধানসভার আঙিনাতেই যে জ্যোতিবাবু সহজ ও স্বচ্ছন্দ এবং সংসদই যে তাঁর সর্বাপেক্ষা কাঙ্খিত আশ্রয় সে তো তাঁর দীর্ঘ জীবনচর্যায় রাজনৈতিক চালচিত্রে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত। সাংগঠনিক হাটবাজার যে জ্যোতিবাবুকে কোনও দিনই তেমন আকর্ষণ করেনি সে সম্বন্ধে দলের পুরানো সহকর্মীরাই সাক্ষ্য দেবেন।

"আদর্শের ছুতমার্গ ছেড়ে পুঁজির সন্ধানে যত্রতত্র হাত পাততে" জ্যোতিবাবুর আপত্তি না থাকায় লেখক মনে করেন জ্যোতিবাবু অনেক পাল্টে গেছেন। ক্ষমতায় আসার পরে এই 'বাস্তববাদী' জ্যোতিবাবুকে আমরা পেয়েছি। একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে ক্ষমতায় আসার আগেও জ্যোতিবাবু একই রকম ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসটা ছিল 'লিবারেল বুর্জোয়ার' যিনি ইংল্যান্ডকে এখনও তাঁর দ্বিতীয় দেশ বলে মনে করেন। শুধু স্লোগানের আড়ালটা একটু পাল্টে গেছে।

লেখকের সুনিশ্চিত অভিমত জ্যোতিবাবুর দল তাঁর ক্ষেত্রে 'মিরজাফরের' ভূমিকা পালন করেছে। দল তাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়নি। ইতিহাসে জ্যোতিবাবু সম্ভবত চিহ্নিত হবেন একজন "দুর্বল বঙ্গজ কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে" (পৃ: ২১) কারণ ইতিহাসের সঙ্কটমুহূর্তে জ্যোতিবাবু "রামা-শ্যামা কমরেডদের ভিড়ে নিজেকে কেবলই একজন মামুলি 'ব্যক্তি বিশেষ' বলে পরিচয় দেন। ইতিহাস তাকে স্মরণে রাখবে না (পৃ: ২১)।

এই যদি জ্যোতি বসুর ক্ষমতার দৌড় এবং পরিণতি হয় তবে 'রামা-শ্যামা' কমরেডদের দলের নেতা হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে না পারায় দেশের এমন কী ক্ষতি হয়েছে? বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ একুশ বছরে সিপিএম সরকার যখন বিশেষ "কাণ্ডজ্ঞানহীনতার" পরিচয় দিয়ে আসছে। (পৃ: ১০৭) এই প্রশ্নের অবতারণা অবধারিত।

বঙ্গজ কমরেডরা 'ঝট্‌পট্‌' ইংরেজি বলতে পারেন না তাই তাঁরা দিল্লিমুখো হতে চান না। কারণ এই গুণটিই পলিটব্যুরোর হর্তাকর্তা হওয়ার পূর্বশর্ত বলে লেখকের অভিমত (পৃ: ২৪)। সুমনের এই তীব্র বিশ্লেষণ বঙ্গজ কমিউনিস্টরা মেনে নেবেন বলে মনে হয় না। কারণ তাঁরা জানেন ইচ্ছাশক্তি নয় প্যাঁচ-পয়জার রাজনৈতিক শক্তির উৎস। তা ছাড়া দিল্লির রাজনৈতিক মঞ্চে স্থান পাওয়া সকল বঙ্গজ কমরেডরাই ফট্‌ফট্‌ করে ইংরেজি বলেন এমনও শোনা যায় না। সুমন অবশ্য এই ইংরেজিটাকেই দক্ষিণী কমরেডদের প্রধান আয়ুধ বলে মনে করেন, যার জোরে বঙ্গজ কমরেডদের ওপর দক্ষিণীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছেন।

সুমনের অভিমত খুবই সাহসী ও স্পষ্ট। তার মতে 'অযোধ্যা নীতির প্রশ্নে বিজেপি ও কংগ্রেসের মনোভাবে মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই' এবং বামপন্থীরাও মন্দির নির্মাণ হলে তা রুখতে নামবেন না। শুধু সংসদে হইহল্লা করে ও পশ্চিমবঙ্গে বনধ্‌ ডেকে প্রচারের পাদপ্রদীপে চলে আসবে। "আর্থিক নীতির প্রশ্নে সিপিএমের তুলনায় বিজেপি অনেক বেশি বামপন্থী। শুধু তাই নয় বিজেপির প্রথম সারির নেতাদের মতন নিষ্কলুষ ভাবমূর্তি এই মুহূর্তে অন্তত অন্য কোন সর্বভারতীয় দলের নেই" (পৃ: ২৬)। এই মত নিয়ে বিতর্ক হবে সন্দেহ নেই। তা হোক কিন্তু চিন্তাকে অন্য দিকে ঘোরাবার দক্ষতা লেখকের আছে।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবস্থা এবং শক্তি আলোচনা করতে গিয়ে লেখক যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন তার প্রায় সব কয়টিই দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে রচিত। লেখক মনে করেন কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ঐক্য স্থাপিত হলেও নীতিহীন দিশার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টকে নির্বাচনে পরাজিত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিও নঞর্থক এবং তিনি 'স্ট্রিট ফাইটারের' ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। এই অভিমতের সঙ্গে সকলে একমত হবেন কি না বলা শক্ত। বামফ্রন্টেরও নির্বাচনে বার বার জয়ের ক্ষমতা শুধু তার আদর্শ ও নীতিবোধের প্রতি অবিচল আনুগত্যবোধ থেকে উৎসারিত এমন মনে করা সঙ্গত নয়। 'আদর্শ' আজ প্রায় অবান্তর প্রসঙ্গ। নীতিহীন কৌশল ও রাজনৈতিক ধান্দা এসব একেবারেই উপেক্ষা করা যায় না। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া আঞ্চলিক দলীয় নেতৃত্বের দোলাচল এসব আজ আর গোপন নয়। রাজনীতি শুধু arithmetic নয়, তার চেয়েও বেশি তার chemistry-র ভাগ। মমতা 'জনপ্রিয়' নেত্রী স্বীকার করেও, তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণ কোনও সমাজবিজ্ঞানী বা সাংবাদিক কেন বিশ্লেষণ করছেন না তাও একটি বড় জিজ্ঞাসা।

বামফ্রন্টের শিল্প ও কৃষ্টিতে সাফল্যের দাবি বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেন নয় লেখক তা যুক্তি সহকারে দেখিয়েছেন। 'গ্যাট' সম্পর্কে বামপন্থীদের চিন্তা 'অবান্তর' ও 'হটকারী'। শিল্পায়নের প্রশ্নে বামপন্থীরা যে কতখানি কাণ্ডজ্ঞানহীন তা 'ইস্কো', গ্রেট ইস্টার্ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির 'ভৈরবনৃত্য' দেখলেই বোঝা যায়।

দুর্নীতির 'ইস্যু'তে পি.এল. অ্যাকাউন্ট বিষয়ে পাঁচটি প্রবন্ধ এবং শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুটি প্রবন্ধই বামফ্রন্টের দুর্নীতির বহর বোঝাতে সুমন যথেষ্ট মনে করেন। এ ক্ষেত্রে বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনও পার্থক্য নেই। পি এল অ্যাকাউন্ট নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলিতে তথ্য ও যুক্তি লেখক একজন দুঁদে উকিলের মতন উপস্থিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তার সঙ্গে সিপিএমের দলীয় মুখপত্র 'গণশক্তি' ও একটি বাংলা দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকার তীব্র কলমযুদ্ধ সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দাবি করতে পারে।

সুমন যে সমস্ত ইস্যু বেছে নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা ভবিষ্যতেও বিতর্ক জিইয়ে রাখবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের রাজ্যের একটি বিশ্বাসযোগ্য ছবি এই নিবন্ধগুলিতে পাওয়া যাবে যা আগামী দিনে আমাদের স্মৃতির পাহারা হয়ে থাকবে। □

রাজ্যপাট — সুমন চট্টোপাধ্যায় / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ / ৫০.০০

আধুনিকতার সন্ধানে বাঙালি মুসলমান

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসলিম সমাজ নিয়ে গবেষণার একটি প্রাথমিক অসুবিধা হল এই সমাজ ধর্মের কঠোর অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয়। মৌলবাদীদের মতে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার কোনও স্থান মুসলিম সমাজে নেই। কারণ ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র একে অপরের দেহে লীন হয়ে গেছে। এই অর্থে রাষ্ট্র যদি হয় ধর্মের বহিঃপ্রকাশ তাহলে ধর্ম হল রাষ্ট্রের সারমর্ম। প্রখ্যাত ফরাসি ইসলাম-বিশেষজ্ঞ ম্যাক্সিম রদিসঁ এইজন্যই লিখেছিলেন যে, ইসলাম হল একাধারে ধর্ম ও রাজনৈতিক দল। স্বভাবতই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের সংস্পর্শে ভারতীয় সমাজে যখন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগল তখন হিন্দু সমাজ যত সহজে আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শ, ধ্যানধারণা, প্রতিষ্ঠান বা আচার ব্যবহার আত্মস্থ করতে পেরেছিল, রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ তা পারেনি। বরং প্রাথমিক পর্বে ভারতীয় মুসলমানরা এক ধরনের সাবেকি সাংস্কৃতিক গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রেনেসাঁর দ্যুতি মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

যে গ্রন্থের পর্যালোচনা আমরা করছি তার আলোচ্য বিষয় বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আধুনিকতার সন্ধান। তাই সঙ্গত কারণেই ঐতিহাসিক তথ্যরাজিকে সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে লেখক সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় অর্ধেক মুসলমান বাংলাদেশের অধিবাসী। তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল সর্বভারতীয় মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা। কারণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা প্রণালীর দিক থেকে বিচার করলে তারা অন্য প্রদেশের মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশি অ-মুসলিম বাঙালি সম্প্রদায়সমূহের নিকটবর্তী। এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ ছয় শতাব্দীব্যাপী মুসলিম শাসনকালে বহিরাগত মুসলমান অনেক এলেও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানই ধর্মান্তরিত স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত, এই কারণেই বাঙালি মুসলমানসমাজকে বুঝতে হলে স্থানীয় পরম্পরা, প্রথা ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। উত্তর ভারতীয় মুসলিম ঐতিহ্য এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হবে না। বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিগৃহীত যে সমস্ত নিম্ন জাত ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় ধর্মান্তরিত হয়েছিল তারা কিন্তু তাদের প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান তথা সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়নি। তাই দেখি চাষি, জেলে, কাঠুরে — সে হিন্দুই হোক বা মুসলমান হোক — ওঝা, ফকির, পীরবদর বা সত্যনারায়ণ ইত্যাদি সকলকেই সমানভাবে শ্রদ্ধা করত। এরই মাঝে সুফি প্রচারকরা ইসলামের উদারীকরণ ঘটান। এইভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব ও ইসলামিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে মিশ্র লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠল তাই হয়ে ওঠে মূলত গ্রামাঞ্চলে বাস করা বাঙালি মুসলমানের গ্রাম্য-সংস্কৃতি। এই সমন্বয়ী বা 'সিনক্রেটিস্টিক' ঐতিহ্যই ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের পরম সাংস্কৃতিক সম্পদ।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারায় অন্যতম প্রধান যে ত্রুটি চোখে পড়ে তা হল জাতীয়তাবাদের নামে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান। সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে এটাই হয়ত তখন বাস্তব ছিল তবুও সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর ক্ষেত্রে বাঙালি সাহিত্যিক, নাট্যকার তথা বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাও কম ছিল না। বঙ্কিম, নবীন বা হেম-সাহিত্যে মুসলমান চরিত্রকে 'যবন' বা 'ম্লেচ্ছ' বলে উল্লেখ করা এক প্রকার প্রচলিত রীতি হয়ে উঠেছিল। লেখকের গবেষণার মাধ্যমে এই রীতির বিরুদ্ধে নবোদ্ভূত মুসলিম বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর তিক্ত প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আমরা পাই। 'ইসলাম-প্রচারক', 'নবনূর', 'আল্ ইসলাম' বা 'বঙ্গনূর'-এর প্রবন্ধগুলিতে নজর দিলেই এই শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' বা 'সওগাত'-এর ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি মুসলিম সমাজে ধীর পদক্ষেপে আধুনিকতার প্রবেশ ঘোষণা করেছিল।

বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব সত্তা আবিষ্কারের প্রয়াসও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে লক্ষ করা সম্ভব। সেকালে গোঁড়া মুসলিম সমাজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জগতের আত্মীয় বলে দেখাতে আগ্রহী ছিল। আবার হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের বিদেশি বলে দেখানোরও একটা প্রবণতা ছিল। এরই মধ্যে তৃতীয় যুক্তিবাদী ধারাটি উভয় সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের তত্ত্ব প্রচার করেছিল। এই ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেছিল 'নূর-আল্-ইমাম', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'

বা 'ইসলাম প্রচারক'। উর্দুকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বলে যাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের তীব্র বিরোধিতা করে এই পত্র-পত্রিকাগুলি। বস্তুতপক্ষে বাঙলা ভাষাকে ইসলামিক ঐতিহ্যে নিষিক্ত করে আত্মস্থ করার মধ্যেই বাঙালি মসুলমানসমাজ তার নিজস্ব সত্তা খুঁজে পেয়েছিল।

সমাজ ও সংস্কৃতিতে আধুনিকতার সোপান রচনায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের অবদানও কম ছিল না। বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে এইজন্য যে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজ বাঙলার নবজাগরণে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ফলে ওই নবজাগরণ কার্যত হিন্দু জাগরণে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী যে মানবতাবাদী, উদারনীতিক ও যুক্তিবাদী বস্তুনিরপেক্ষতার ধারা লালন করেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এরই মধ্যে ধীরে হলেও মুসলিম সমাজের চেতনার মান উন্নত হতে থাকে। যেসব সাহিত্যসেবী প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল তারা হল বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ীনী, মুসলমান সাহিত্য সমিতি, আল্ হিলাল্ সাহিত্য সমিতি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। সঙ্গত কারণেই গবেষক সৌমিত্র সিন্‌হা ১৯২৬-এর ১৯শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তাঁর পাঠকদের জানিয়েছেন। এর মুখপত্র 'শিখা' যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূচনা করেছিল তা ছিল প্রকৃত অর্থেই অভিনব। আবদুল কাদির, আবুল হুসেন এবং কাজী আবদুল ওদুদ-এর মতো বিদগ্ধ সংস্কৃতিমনা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় 'শিখা গোষ্ঠী' গতানুগতিক মুসলিম মানসিকতাকে যুক্তিবাদী ধ্যানধারণায় দীক্ষিত করার যে প্রয়াস নিয়েছিল তার যথার্থ মূল্যায়নের প্রয়াস করে লেখক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। কারণ মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই উদারনীতিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী ধারা মুসলিম সমাজের মূল স্রোত হয়ে উঠতে পারেনি। তার পরিবর্তে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ ঘটল দেশভাগ। এর জন্য কে বা কারা দায়ী তা নিয়ে বিতর্ক আছে প্রচুর। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক জাতীয়তাবাদী, মার্ক্সবাদী, রবীন্দ্রিক ও ঐতিহাসিক নানা ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ গোপাল হালদারের বিশ্লেষণের সাহায্যে উপসংহার টেনেছেন। 'মুসলমান বাঙালীর কাল্‌চার' শীর্ষক প্রবন্ধে গোপাল হালদার মন্তব্য করেছিলেন যে বাঙালি সমাজের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বাঙালির সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং এই কারণেই বাঙালি মুসলমান যেমন বঙ্গসংস্কৃতিকে হিন্দু ঐতিহ্যভিত্তিক মনে করে আপন করে নিতে পারেনি, তেমনই হিন্দুর চোখে মসুলমানও একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের বেশি অন্য কিছু বলে প্রতিভাত হয়নি। কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই যে, হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত লোকসংস্কৃতিকে ভিত্তি না করে আমরা সমন্বয়ী সংস্কৃতি রচনা করতে পারব না। আবার এর জন্য প্রয়োজন মেহনতী মানুষের মিলিত গণসংগ্রাম। কারণ সংস্কৃতির ব্যপকতর গণভিত্তিই কেবল নবজাগরণের মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ধারাকে সঠিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

পরিশেষে লেখকের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চার প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্মানুসন্ধানের ইতিহাস রচনায় যে নৈর্ব্যক্তিকতা, বস্তুনিষ্ঠা, যুক্তিগামিতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার তথা সংযমের পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য এর চেয়ে ভাল প্রয়াস আর হতে পারে না। □

The Quest for Modernity and the Bengali Muslims 1921–47 — Soumitra Sinha / Minerva Associates, Calcutta / 200.00

গভীরতর বাস্তবতার লেখক

মধুময় পাল

বাংলাদেশের অবসর প্রকাশন সংস্থা, ঢাকা, থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস' সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫-এ। সম্পাদক হায়াৎ মামুদ ভূমিকায় লেখেন, "...বিগত দু দশকে ধীরে ধীরে তাঁর বই 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কি 'পদ্মানদীর মাঝি'র মতো ব্যবসাসফল উপন্যাস ব্যতিরেকে, দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন প্রকাশকের মর্জি ও ব্যবসাবুদ্ধি অনুযায়ী পৃথক ভাবে নানা সময়ে যে-সব বই বেরিয়েছে সে-সব এত অবহেলা অমনোযোগ ও অপশিক্ষার সাক্ষী যে কোনো ভাষা ও সাহিত্যের কোনো অমর প্রতিভার প্রতি তাঁর স্বদেশবাসী যে এহেন নিষ্ঠুর ও অশ্রদ্ধেয় আচরণ করতে পারে তা কোনো সভ্য সমাজকে বিশ্বাস করানো কঠিন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো একটি বই আমরা খুঁজে পাইনি যাকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।"

হায়াৎ মামুদের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা একটি তথ্য যোগ করতে চাই। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'শহরবাসের ইতিকথা' ৪০ বছর (১৩৬০–১৪০১) এবং 'ইতিকথার পরের কথা' ২৩ বছর (১৩৭১–৯৫) পুনর্মুদ্রণের মুখ দেখে না। অথচ একই প্রকাশকের ঘরে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ১৩৫৪ থেকে ৫০ বছরে ২৪ বার পুনর্মুদ্রণ হয়। বলা যেতে পারে, অল্প সময়ের জন্যও মুদ্রণহীন অবস্থায় ছিল না বইটি। প্রকাশক বলবেন, বাজার না থাকলে পুনর্মুদ্রণ না হওয়া বা দেরিতে হওয়া স্বাভাবিক। প্রকাশক ব্যবসায়িক বুদ্ধির উর্ধ্বে উঠবেন না, অতীতে বাংলা ভাষার প্রকাশকরা আবেগে বা প্রেরণায় কিছু ভুলচুক করে থাকলেও, এখন তা একেবারেই সম্ভব নয়, বিশেষত এ রকম একটা 'জীবন্মৃত' ভাষার বাজারে। সদর্থকভাবেই আমরা 'বাজার' শব্দটি ব্যবহার করছি। পাঠক যদি কোনও বইয়ের চাহিদা তৈরি না করেন, শুধু প্রকাশককে দোষ দেওয়া সাবেক কালের নিন্দাপদ্ধতি। পাঠকের দায় আমরা এড়াতে পারি না। আর, পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন পাড়া কলেজ স্ট্রিট উনিশ শতকের বটতলা থেকে কোনও অর্থেই বেশি দূরে নয়, বরং বটতলা সে সময় আধুনিকতর।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র' প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন এবং এ দেশের দরিদ্রতম ও আপসহীন, সৎ ও সাহসী লেখককে অসামান্য সংস্করণে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। স্বল্প ব্যবধানে দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে (ফেব্রুয়ারি ও জুন '৯৮)। আকাদেমির নিবেদনে বলা হয়েছে, রচনাসমগ্র দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে এবং মানিক সাহিত্যের এক আদর্শ-পাঠ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। আমাদের আলোচ্য প্রথম খণ্ডে আছে জননী, অতসী মামি, দিবারাত্রির কাব্য ও পুতুলনাচের ইতিকথা। দিবারাত্রির কাব্য লেখকের প্রথম উপন্যাস হলেও গ্রন্থরূপে প্রকাশের ক্রমে তৃতীয়। ১৯৩৫-এর মার্চে বেরয় 'জননী', গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামি' আগস্টে এবং 'দিবারাত্রির কাব্য' ডিসেম্বরে। মানিকবাবুর প্রথম লেখা 'অতসী মামি' বেরিয়েছিল 'বিচিত্রা'য় ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে। এর ৫ ও ৭ মাস পরে দ্বিতীয় গল্প 'নেকি' ১৯২৯-এর জুন ও তৃতীয় গল্প 'ব্যথার পূজা' ১৯২৯-এর আগস্টে। 'দিবারাত্রির কাব্য' ধারাবাহিকভাবে বেরতে শুরু করে ১৯৩৪-এ। ওই বছরই 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রকাশ শুরু হয় 'পূর্বাশা'য়। ১৯৩৫ সালে কোনও এক সময় মানিকবাবু মৃগী রোগে প্রথম আক্রান্ত হন। আমৃত্যু এই ব্যাধির সঙ্গে লড়তে হয়েছে তাঁকে। ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'। সাল-তারিখ বিশদে উল্লেখের একটিই কারণ, ১৯২৮-১৯৩৬—এই কালপর্বটি খেয়াল রাখতে হবে।

এখানে কবুল করা দরকার, এই আলোচনা কোনও বিশেষজ্ঞের নয়। যোগ্য ব্যক্তিরা মানিক-সাহিত্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখেছেন, গবেষণা করেছেন। আরও হবে। তরুণ বয়স থেকে মানিক-অনুরাগী পাঠক হিসাবে পরবর্তীকালে নিজেকেই যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছি, কথিত উত্তরকালে মানিকবাবুর বিকাশ রুদ্ধ হয়েছিল কি না এ-সংশয়ে পীড়িত হয়েছি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র লেখক প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছতে পারেননি এ-আক্ষেপও ক্রমে দানা বেঁধেছে, এই আলোচনায় তারই ক্ষুদ্র খোঁজ আছে। এর বেশি নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে 'বিষবৃক্ষ', 'গোরা', 'চরিত্রহীন' তাঁর পড়া হয়ে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে নিষিদ্ধ বই পড়া! আর, এই পড়ার প্রতিক্রিয়া ছিল: 'এ রকম একখানা বই পড়তাম আর তার ধাক্কা সামলাতে তিন চারদিন মাঠে ঘাটে, গাছে গাছে নৌকায় নৌকায়, হাটেবাজারে মেলায় ঘুরে আর হইচই মারামারি করে কাটিয়ে তবে সামলে উঠতাম। বড় ঈর্ষা হত যাঁরা বই লেখেন তাঁদের ওপর।' লক্ষণীয়, উপন্যাসগুলির বিষয়ের 'ধাক্কা' তাঁকে শুধু অস্থির নয়, ঈর্ষাতুরও করেছিল। আবার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মানিকবাবু সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে এরকম জানিয়েছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যও পড়তাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস পড়েও আমার মনে কোনো প্রশ্ন বা নালিশ জাগত না। কবি বলে রবীন্দ্রনাথকে সত্যই আমি রেহাই দিয়েছিলাম। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলছেন, শরৎচন্দ্রের বই পড়ে মনে হত তিনি অন্যায় আর গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন, কিন্তু অন্য কোন লেখক সম্পর্কে এ রকম ভাবা সম্ভব হত না। শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা ও অসতীরা চরিত্রে বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্বে, অনুচিত প্রেমও হয়েছে প্রেম। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেননি। একই প্রবন্ধে সামান্য ব্যবধানে বলছেন, ...শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে—মধ্যবিত্তের হৃদয়। 'আধুনিক' বা সমকালীনদের লেখা সম্পর্কে তিনি বলেন, অসীম আগ্রহ নিয়ে আধুনিকদের লেখা পড়ি। ভাষার তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানী, নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা আশা ও উল্লাস জাগায়—তারই পাশাপাশি হালকা রোমান্টিক ন্যাকামি তীব্র বিতৃষ্ণা জাগায়। নির্দিষ্টভাবে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে মানিকবাবু বলেছেন, বস্তিজীবন এসেছে, কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসেনি, ...মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয়নি।

বাংলা সাহিত্যে একটা অভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে প্রকট হয়েছে—বাস্তবতার অভাব—মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা, বস্তিজীবনের বাস্তবতা, সাধারণ মানুষের বাস্তবতা।

আর, তাঁকে পীড়া দিয়েছে 'হৃদয়াবেগ', 'রোমান্টিক ন্যাকামি', 'অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম'। তিনি প্রশ্ন তোলেন, শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি— সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের— সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ? এখানে উল্লেখ করার মতো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন বুদ্ধদেব বসুরা রবীন্দ্রসাহিত্যে বাস্তবতার অভাবের অভিযোগ করেছেন। আবার, সমকালীনদের সাহিত্য সম্পর্কেও মানিকবাবুর একই অভিযোগ।

এই অভিযোগ কতটা স্বীকার্য তা যাচাইয়ের কারণে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫-এ প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট বইয়ের নির্বাচিত তালিকা পেশ করা গেল। আগেই বলা হয়েছে, ১৯২৮ মানিকবাবুর প্রথম গল্প প্রকাশের সাল, ১৯৩৫ মানিকবাবুর প্রথম উপন্যাস প্রকাশের। ১৯২৮–২৯-এ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। কাছাকাছি সময়ে (১৯২৭–২৮) ঐ পত্রিকার আরেকটি ধারাবাহিক উপন্যাস ছিল রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড), শেষ প্রশ্ন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেঘমল্লার, অপরাজিত, মৌরীফুল, যাত্রাবদল, দৃষ্টিপ্রদীপ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চৈতালী ঘূর্ণি, পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, রাইকমল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর বেদে, টুটাফুটা, ঊর্ণনাভ, আসমুদ্র ইত্যাদি ১৩টি বই, বুদ্ধদেব বসুর সাড়া, যেদিন ফুটল কমল, ঘরেতে ভ্রমর এলো ইত্যাদি ১২টি বই, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নারীমেধ, বধূবরণ, সাঁওতালি, দিনমজুর, খরস্রোতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মৃত্তিকা, মিছিল ইত্যাদি, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রিয়ালিস্ট, অন্তঃশীলা, অন্নদাশঙ্কর রায়ের অসমাপিকা, আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা, সত্যাসত্য, যার যথা দেশ, অজ্ঞাতবাস, কলঙ্কবতী। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, জগদীশ গুপ্তের অসাধু সিদ্ধার্থ, দুলালের দোলা, লঘু গুরু, রোমন্থন, যথাক্রমে। এটা ঘটনা, অনেক লেখাই ক্রমে হারিয়ে গেছে, কিছু লেখকের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে, সমকালে সোরগোল ফেলা লেখা এখন আর পড়ার প্রয়োজন হয় না, আবার কিছু লেখক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পাঠকের সমাদর পাননি, অভাবিত উদাসীনতা তাঁদের কোণঠাসা করে রেখেছে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল না— এই অভিযোগ টেকে না। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে আধুনিকদের অভিযোগে যেমন অসারতা, অহমিকা ছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগেও বাস্তবতাবোধ ছিল একপেশে। আর, সাহিত্যের বাস্তবতা তো চলমান বিপ্লব। কোনও তত্ত্বই শেষ কথা ঘোষণা করতে পারে না।

বাস্তবতার ধারণা নিয়ে মানিকবাবুর দ্বন্দ্ব ছিল। মীমাংসা করতে না পেরে নিজস্ব ব্যাখ্যায় উপনীত হয়েছিলেন তিনি। যেমন, তাঁর প্রথম লেখাকে (অতসীমামি) তিনি বলেন, 'রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী'। আবার এই লেখা সম্পর্কে তিনিই বলেন, এমনি ভাবতে গেলে হাসি পায়, কিন্তু আজও গল্পটি প্রথম থেকে পড়ে গেলে আর মনে মনেও হাসবার সাধ্য হয় না। কারণ, কাহিনী রূপকথা হলেও নায়ক-নায়িকা জীবন্ত মানুষ, উদ্ভটভাবে হলেও কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে মাটির পৃথিবীর দুটি মানুষের বাস্তব প্রেম। ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত স্বামীর সঙ্গ অনুভব করতে অতসীমামি প্রতি বছর সেই মর্মান্তিক তারিখে রেললাইনের ধারে নির্জন মাঠে একাকী সারারাত বসে থাকে। এই প্রেম কি অবাস্তব, রোমান্স-ঠাসা, হাস্যকর? ১০০% বাস্তব খবর এই যে (খবরটি ছাপা হয় কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিকে ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬), বাংলাদেশের জামালপুরে ইয়াসমিন বেগম তাঁর স্বামীর কঙ্কাল কবর থেকে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। কঙ্কালের পাশেই তিনি ঘুমোন। ছ' সন্তানের জননী ইয়াসমিনের বিশ্বাস, তাঁর স্বামী মারা যাননি। মাদকাসক্ত হওয়ার অপরাধে গ্রামের লোকজন তাঁকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে। কঙ্কালের সঙ্গে শুয়ে থাকার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতেই স্থানীয় মৌলবিদের রায়ে ইয়াসমিনকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয় এবং তাঁকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। ইয়াসমিনের প্রেমের বাস্তবতা কি হাস্যকর? আমাদের হিসাব ও ছক-কষা দিনযাপনে ইয়াসমিন উদ্ভট হতে পারেন, অবাস্তব, মিথ্যে নন। কোনও মতবাদ বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রেমকে হাস্যকর চিহ্নিত করলে তার মাপ নিয়েই সন্দেহ জাগে। নির্বোধ নিষ্ঠুর গলায় বেত্রাঘাতের ফতোয়া দিতে পারে মৌলবাদীরাই।

'দিবারাত্রির কাব্য'কে মানিকবাবু বলেছেন, তাঁর রোমান্টিক কাহিনী লেখার 'চরম নিদর্শন'। তাঁর মধ্যে চলতে থাকা ভাববাদ ও বস্তুবাদের সঙ্ঘাতের প্রমাণ। জনৈক পাঠিকার প্রশ্নে মানিকবাবুই 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছিলেন, দিন হোক রাত্রি হোক, আকাশে পৃথিবীর এতটুকু প্রতিবিম্ব নেই— শুধু আকাশের গ্রহতারার আলো পৃথিবীকে উপলক্ষ্য করে খানিকটা চিরস্থায়ী অন্ধকার সৃষ্টি করে রেখেছে। হেরম্ব একদিন— যেদিন প্রথম আনন্দের সঙ্গে তার দেখা হয়— এ সত্য লক্ষ্য করেছিল। আকাশে পৃথিবী নেই— পৃথিবীতে আকাশ আছে। দুর্বোধ্য, রহস্যময়, আয়ত্তাতীত, নিঃসম্পর্কীয় সুদূর সুন্দর আকাশ— আদি অন্তহীন। আমরা পৃথিবীর জীব— আমাদের পথ পৃথিবীর ধূলার পথ। পথিক আকাশের। আমরা চলি পৃথিবীর পথে— খুঁজি আকাশের পথিককে। নিজের এই অনুভবকে পরবর্তীকালে ভাববাদ বলে চিহ্নিত করে মানিকবাবু কতটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সে-সম্পর্কে সংশয় থাকা অমূলক নয়। এখানে

উল্লেখ করা সম্ভবত প্রাসঙ্গিকই হবে, ১৯৫৪ সালে মানিকবাবু ডায়েরিতে লিখছেন, মানুষের জগৎ আর জলবায়ু বাতাস ইত্যাদি অবলম্বন করে জীবিত মানুষের জগৎ পৃথক করাই রোমান্টিসিজম। আরও অনেক জগৎ আছে। চেতনায় তার সাড়া পেয়েছি। চেতনা দিয়ে চেতনার সীমাই শুধু জানা যায়— আরও অনেক কিছু আছে বিরাট ব্যাপার সেটা চেতনায় উপলব্ধি করা যায়— তার বেশি কিছু সম্ভব নয়।

গাওদিয়ার গ্রামীণ বাস্তবতা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন নেই। পল্লীসমাজ-সুলভ কোন্দল এবং জোতদার-জমিদারের বিবেকহীন শাসন-শোষণের বিবরণের অভাবে গাওদিয়ার বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং মনে হয়, প্রতিটি চরিত্রই গ্রামশহর-অভেদে আমাদের চেনা। পদ্মানদীর জেলেদের জীবনে বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ আমাদের উপন্যাস পাঠে কখনওই বিঘ্ন ঘটায় না। পদ্মাপাড়ের প্রত্যয়িত অনুলিপি আমাদের দাবি নয়। হোসেন মিঞা তো বাস্তবের চেয়ে বড় সত্য। শ্যামার জননীত্ব দেবীত্বে পৌঁছয় না বলেই তা বাস্তব। কী ভয়ঙ্কর এই দাম্পত্যসম্পর্কের বাস্তবতা: 'ছেলেমেয়েদের লইয়া নিজের জন্য যে জীবন শ্যামা রচনা করিয়াছে, তার মধ্যে শীতল আশ্রয়ের মতো, জীবিকার উপায়ের মতো তুচ্ছ একটা পার্থিব প্রয়োজন মাত্র। আপনার প্রতিভায় সৃজিত সংসারে শ্যামা ডুবিয়া গিয়াছে। শীতল সেখানে ঢুকিবার রাস্তা না খুঁজিলেই সে বাঁচে। 'দিবারাত্রির কাব্য'-র হেরম্বও তো কঠিন বাস্তব। সুপ্রিয়া হেরম্বর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে। হেরম্ব সাহস পায়নি। নিজেকে দান করার চেয়ে কঠিন কাজ জগতে কী আছে? 'হেরম্ব জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। মন তার সর্বদা অপরাধী, অহরহ তাকে আত্মসমর্থন করে চলতে হয়।.... আনন্দ, পুলক, উল্লাস সংগ্রহ করা আজ তার পক্ষে অত্যন্ত জটিল কাজ।' 'সর্পিল' গল্পে 'পরপুরুষ' অনন্তর প্রতি কেতকীর আসক্তিকে কীভাবে অবাস্তব বলি? 'যে রাজ্যে শুধু বালি ধূ ধূ করছে, তার অধিকার নিয়ে মেয়েমানুষ মারামারি করে না'— কেতকীর এই অসঙ্কোচ চেতনা কোনও সামাজিক সৌজন্যে অবাস্তব করে দেওয়া হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্বিষ্ট ছিল এক ভিন্নতর, গভীরতর বাস্তবতা, মানুষের সহজ আবেগ-অনুভূতির উপরিতল নয়, অবচেতনার প্রায়ান্ধকার প্রবাহ থেকে তিনি কঠিন ও অপ্রিয় সত্য তুলে আনেন, যার নজির সমকালের সাহিত্যে কিছু হলেও ছিল।

বাংলা কথাসাহিত্যে গভীরতর বাস্তবতার লেখককে একদিন নিজেরই এই অসামান্য সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে সংশয়ী হতে হয়েছে। তিনি তখন মার্কসবাদে অনুগত। লিখছেন, 'মার্ক্সবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি' বা 'আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল গণ্য করতে হবে?' মধ্যবিত্ত ভদ্রজীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশ-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতিতে মন বিষিয়ে ওঠা, এই জীবন থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়া— এই প্রচণ্ড সংঘাতের স্বরূপ মানিকবাবুকে চিনিয়েছে মার্ক্সবাদ— এ সংঘাত হল ভাববাদ ও বস্তুবাদেরই সংঘাত, সমাজজীবনে আজ যা প্রকট হয়েছে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। ১৯৪৪-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৩-এ তিনি লিখেছিলেন যে প্রথম বয়সে তাঁর সাহিত্যরচনার পিছনে অন্যতম তাগিদ ছিল 'নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মরমর এই সমাজের কাতরানি গভীর ভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতিসুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মতো মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি! সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। পরবর্তীতে মার্ক্সবাদেই মানিকবাবু সেই সমাধান বা মলম খুঁজেছিলেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সম-সমাজ হল তাঁর অভীষ্ট। ১৯৪৪ পরবর্তী তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ২৬, গল্পগ্রন্থ ১০টি। কিন্তু 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', অহিংসা, 'চতুষ্কোণে'র লেখক মার্ক্সবাদী পর্বে 'চিহ্ন' এবং 'হলুদ নদী সবুজ বন' ছাড়া স্থায়ী প্রভাব রাখতে পারেন না। তাঁর বহু লেখাই পুনরাবৃত্তি মনে হয়। শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্থানীয় লেখা হয়ে থাকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি'।

একজন সমাজসচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক লেখকের চল্লিশ দশকের পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদী হওয়ার স্বাভাবিকতা মেনে নিলেও মার্ক্সীয় দর্শন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পচেতনার, শিল্পীসত্তার কতটা অঙ্গীভূত হতে পেরেছিল এ-প্রশ্ন জোরালো থাকে। বহিরঙ্গে এই দর্শনের প্রতি শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অনুগত ছিলেন, এটা ঘটনা। আবার এটাও সত্য, এই দর্শন তাঁর সৃজনশীলতার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, বহুমাত্রিক স্বতঃস্ফূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছিল। মনের বিকার থেকে রেহাই পেতে পরিণততর তিনি মার্ক্সবাদে নয়, শরণ নিয়েছেন অন্যত্র, তাঁর দিনলিপি এ-কথা বলে। মনে পড়ছে, নিজের কবিতার বইয়ের সমালোচনার জবাবে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' বা আজকের যুগের যে কোনো রকম ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে শুধু 'আশাবাদী মনোভাব' কবচের মতন যে কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানালয় থেকে কিনে আনলে চলবে না। সে মনোভাব আশাবাদী হতে

পারে, কিন্তু তা আরোপিত ও আড়ষ্ট — স্বাভাবিক ও সর্বজনীন নয়।... স্বর্গের সিঁড়ি এত সোজা নয়।'

বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক আশুতোষমুখ্য ইলিয়াসের মতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্ক্সবাদী পর্বের লেখা অনেক তীক্ষ্ণ এবং ভাষায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তবে ইলিয়াস স্বীকার করেন, দ্বিতীয় পর্বের লেখায় তাঁর উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে কাহিনীর ভেতরকার দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য অখণ্ড স্রোতোধারায় প্রবাহিত হয় না। প্রায়ই কাহিনীকে উপচে ওঠে তাঁর সিদ্ধান্ত, চরিত্রের বুদ্ধি সমাজের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। কারণ বিশ্লেষণ করে ইলিয়াস লেখেন, মানুষের ক্ষযকে উন্মোচন করে পাঠককে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ক্ষয়ের নিরাময়ের সংকল্প খুঁজতে গেলেন যেখানে, সেখানে তখনও অবক্ষয় অব্যাহত রয়েছে। বিদেশি শাসনের অবসান ঘটছে, সেখানে বিপুল ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। শ্রমজীবী লড়াইতে নেমেছে, লড়াইয়ের নেতৃত্ব যাদের হাতে তারা এই হাতই মেলাতে চায় ভক্তিবাদীদের সঙ্গে। যুদ্ধে ফ্যাসিবাদীরা হেরে গেছে, কিন্তু দেশের বিশাল সমাজে ফ্যাসিবাদের কদর্য রূপের চর্চায় বিরতি পড়েনি। দুর্ভিক্ষে মুনাফা লোটে যারা, ক্ষমতায় আসে তারাই। নতুন রাজনীতির রোগা ধারাটি মধ্যবিত্তের যে পরিবর্তনটুকু এনেছে সেখানেও নতুন ধরনের উদ্ভট সহ-অবস্থান।

এই ঘোরতর বর্তমানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সামাজিক সংকল্প হয়ে ফোটে না। তবে মানিকবাবু ইচ্ছাপূরণের গল্প ফাঁদেন না, পার্টির ফরমায়েস অনুযায়ী কাহিনী সরবরাহ করেন না। পার্টিতেই তাঁর লেখা নিয়ে তর্ক ওঠে। তাঁর বিশ্বাস ছিল এতটাই আন্তরিক ও সৎ।

সাহিত্যকর্মে অটুট থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে কি বিশ্বাস তেমনই ছিল? ২৫.৬.১৯৫৪-এর দিনলিপিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। মার দয়া চেয়ে আসছি — মা দয়া করে আসছে — আজ একদিনে কত কথাই যে স্পষ্ট হয়ে গেল।... অনেক চেষ্টা করে মাকে প্রণাম ঠুকে ঠুকে (ঘুষ দিয়ে) চলার মানে হয় না। অনু-পরমাণু পোকামাকড় মাছি থেকে পৃথিবীর জীবজন্তু পৃথিবীর বাৎসরিক ঘুরপাক খাওয়া থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু নিয়মে চলার মূলাধার নিয়মতান্ত্রিক মা। মার জগতে অনিয়ম নেই। মা নিয়মে ক্ষমা করে। নিয়মে দয়া করে।' এক জায়গায় নয়, আরও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, 'মায়ের' প্রতি আস্থা নিবিড়তর হয়েছে। দিনলিপি পাঠে স্তম্ভিত হতে হয়। আপসহীন ও কড়া ধাতের মানুষটি ভেতরে ভেতরে এতটা ভেঙে পড়েছিলেন? এ কি দারিদ্র্য ও চিকিৎসাতীত ব্যাধির প্রহারে নিরন্তর জর্জরিত মানুষের কাতরোক্তি? নাকি বিশ্বাসভঙ্গের, স্বপ্নভঙ্গের প্রতিক্রিয়া? তিনি কি উপলব্ধি করেছিলেন মার্ক্সবাদের সীমাবদ্ধতা, পার্টি রাজনীতির সঙ্কীর্ণতা? পৌঁছেছিলেন অনতিক্রম্য অসহায়তায়? আর সেই কারণেই বাংলা কথাসাহিত্যের তাৎপর্যময় লেখক, অসুস্থ সমাজের নিরাময়কামী, স্বপ্নদ্রষ্টা, বৈঞ্জানিক মানবতার সাধক মানুষটি এক অলীক আস্তিকো আত্মসমর্পণ করেছিলেন? সাহিত্যচর্চায় তিনি যে শেষ পর্যন্ত আশাবাদী, সেটা কি অভ্যাস বা শৃঙ্খলা? একটি প্রশ্নও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তিনি নিজেও প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন না। □

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র-প্রথম খণ্ড / পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি / ১৫০.০০

নবকলেবরে নজরুল বিষয়ক আকরগ্রন্থ

কামাল হোসেন

গবেষক ও প্রাবন্ধিক আজহারউদ্দীন খানের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪-এর ২৬ মে। প্রকাশক ছিলেন কালকাটা বুক ক্লাব। এরপর দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন ডি. এম. লাইব্রেরী। শেষ সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৩৮০ সালের আশ্বিন মাসে। তারপর বহুকাল বইটির আর কোনও সংস্করণ বের হয়নি। অথচ নজরুল সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক ও গবেষক মাত্রেই জানেন, আজহারউদ্দীন সাহেবের বইটি তথ্য ও বৈদগ্ধ্যের সুবাস ছড়ানো একটি মহামূল্যবান আকরগ্রন্থ। সুখের কথা, নজরুল শতবর্ষ উপলক্ষে বইটির একটি পরিমার্জিত প্রায় ছ'শো পাতার বিপুলায়তন সংস্করণ বেরিয়েছে, নজরুল- অনুরাগীদের কাছে যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

নজরুলের জন্মশতবার্ষিকীর বছরে দুই বাংলাতেই অসংখ্য নজরুল-সংক্রান্ত বই প্রকাশিত হচ্ছে। কিছু কিছু নিঃসন্দেহে খুব ভাল কাজ, কিন্তু বেশ কিছু বই পড়ে মনে হয়, শতবর্ষের বাজার ধরার জন্য খুবই তাড়াহুড়োয় সম্পূর্ণ করা এলোমেলো কাজ। তা ছাড়া তথ্য ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাঁরা অনেকেই বিষয়বস্তুর উপর খুব সুবিধার করতে পারেননি; হয়ত এসব ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আজহারউদ্দীন খান সেই বিরল সাহিত্য-গবেষকদের একজন, যাঁরা প্রচারের আলো থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখতেই

ভালবাসেন। কলকাতা থেকে অনেক দূরে মেদিনীপুরের হবিবপুর বড় আস্তানায় বাস করে নিঃশব্দে নিজের মনের মতো করে ভাস্কর্য সৃষ্টির মতো একাগ্রচিত্তে তাঁর একক সাধনায় এক একটি অসাধারণ প্রবন্ধের গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন। এখনও যে কোনও তরুণের মতো তিনি উদ্যমী ও প্রাণবন্ত।

নজরুল সম্পর্কে তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল রবিবারের যুগান্তর সাময়িকীতে (১৯৫০ এর ২৯ জানুয়ারি)। এরপর নজরুল সম্পর্কে আরও লেখার ইচ্ছে এবং তথ্য সংগ্রহের অনুসন্ধিৎসা বেড়ে যায়। নজরুলের দুই বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে উৎসাহ দেন। তাঁরা দু'জনে তাঁকে কার কার কাছে যেতে হবে এবং কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তার একটি ছক তৈরি করে দিয়েছিলেন। পুরনো পত্রপত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করে তথ্যগুলি পর পর তিনি সাজিয়ে ফেলেন। তাঁর লক্ষ ছিল, শুধু জীবনী নয়, কবি-রচিত সাহিত্যেরও আলোচনা করবেন। এক হিসাবে গোটা মানুষটা সম্পর্কে পাঠকরা যাতে মোটামুটি ধারণা পেতে পারেন সেদিকে লক্ষ রেখেই বইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেজন্য গবেষণার নামে পন্ডিতি দেখিয়ে পাঠকদের ভড়কে দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সাদামাটা ভাষায় কবিকে সবার সামনে তুলে ধরাই ছিল তাঁর সংকল্প। যুগান্তর, স্বাধীনতা, বর্তমান (সরোজকুমার রায়চৌধুরী সম্পাদিত) প্রভৃতি পত্রিকায় নজরুলের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধগুলিকে সংকলিত করেই তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'বাংলাসাহিত্যে নজরুল' আত্মপ্রকাশ করে।

আজকে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর কাছাকাছি এসে বইটির নবতম সংস্করণটি হাতে নিয়ে মুগ্ধ হতে হয় এর বিষয় বৈচিত্র্যে ও তথ্যের ব্যাপকতায়। খুব নিরাসক্তভাবে ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে সন্নিবিষ্ট করে একটি অসাধারণ জীবনী রচনা করেছেন আজহারউদ্দীন খান। নজরুলের জীবনী হিসাবে আমার যদিও কবিবন্ধু মুজফ্ফর আহমদের স্মৃতিকথাটি খুব আকর্ষণীয় মনে হয়, তবুও বলব, যাঁরা খুব দ্রুত রেফারেন্স খুঁজতে চান, তাঁদের কাছে আজহারউদ্দীনের লেখা জীবনীটি বিশেষ সাহায্যকারী হবে বলে মনে হয়। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বত্র তিনি মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি।

বস্তুত ইতিমধ্যেই দুই বাংলাতে আলোচ্য গ্রন্থটি এত বেশি পরিচিতি ও সম্মান লাভ করেছে, বর্তমান আলোচনার সীমিত পরিসরে খুব বেশি তথ্যের পুনরুক্তির বোধহয় প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু আগ্রহী পাঠকের উৎসাহবৃদ্ধির জন্য জানাতে পারি, এই সংস্করণে অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে, অনেক অধ্যায় প্রায় নতুন প্রবন্ধের মতো নতুনভাবে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত বিষয়সূচি মোটামুটি এরকম: নজরুল সাহিত্যের আলোচনা, নজরুল সাহিত্যের বিচার, আধুনিক বাংলা কবিতা ও নজরুল, নজরুল-সাহিত্যের ভূমিকা, শিশু সাহিত্যে নজরুল, নজরুল সাহিত্যে নারী, গীতিকার নজরুল, দেশের মুক্তি সাধনায় নজরুল, নজরুল গ্রন্থ পরিচয়, নজরুল সঙ্গীতের রেকর্ড তালিকা প্রভৃতি — অসংখ্য মূল্যবান তথ্য ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ মূল্যবান বিষয়সম্ভার।

নজরুল শতবর্ষের এই আলোড়িত মাহেন্দ্রক্ষণে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে গবেষণারত আজহারউদ্দীন সাহেবের এই অসাধারণ গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠকরা নতুনভাবে পাঠ করলে উপকৃত হবেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের পরিচিত অনেক প্রাজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক, যাঁরা নজরুলকে কোনও 'বড় কবি'ই মনে করেন না, তাঁদের অনেক প্রশ্ন ও সমালোচনার উত্তর এই বইটিতে লিপিবদ্ধ আছে।

তবে আমার যেটা মনে হয়, একজন কবির সত্যিকার মূল্যায়ন করেন মহাকাল। সমালোচকের সস্নেহ দৃষ্টি কিংবা তিক্ত নিষ্ঠুর উপেক্ষা — কোনওটারই ক্ষমতা নেই কবিকে বা কোনও সৃষ্টিশীল মানুষকে মহাকালের দূরত্ব অতিক্রম করানোর। নজরুল 'বড় কবি' কিনা সময়ই বলে দেবে। সেক্ষেত্রে একশো বছর সময়ও যথেষ্ট না হতে পারে। □

বাংলা সাহিত্যে নজরুল — আজহারউদ্দীন খান / সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩ / ২০০.০০

কবিতায় স্বপ্নের আবিষ্কার

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

হাতের কাছে ন'টি কবিতাগ্রন্থ। নানা বয়সের কবি, নানা সময়ের, বিভিন্ন আঙ্গিকের। দেখার চোখ এবং প্রকাশমাত্রাও বিভিন্ন ধরনের। ছয় দশকের কবি যেমন আছেন এই সমাহারে, তেমন একেবারে সাম্প্রতিক তরুণ কবিও আছেন। এই ন'টি কাব্যগ্রন্থ থেকে কি ছয় এর দশক থেকে ন'-এর দশক অব্দি রচিত কবিতার মূল অভিক্ষেপ কিংবা হাল-হকিকৎ বুঝে নেওয়া সম্ভব? নাকি বাংলা ভাষায় রচিত কবিতা, বাঙালি রমণীর মতোই বিচিত্র স্বভাব এবং বিচিত্র মানসিকতার; সহজে তার থই পাওয়া যায় না; গভীরে যতই প্রবিষ্ট হওয়া যায়, তার নিহিত পাতালছায়া ততই বিস্মিত, মুগ্ধ এবং বিভ্রান্ত করে কৌতূহলী পাঠককে।

প্রথমেই আমরা আলোচনা করব — পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'পরশুরাম-পর্ব' কাব্যগ্রন্থটি। ১৯৯৬-এ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত এই গ্রন্থটি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি দীর্ঘ কবিতা। বলা

যায়, পাঁচ-এর দশক থেকেই দীর্ঘ কবিতার প্রতি কবি এবং পাঠক উভয়েরই আগ্রহে রীতিমতো ঘাটতি লক্ষিত হয়। পঞ্চাশের আলোড়ন-সৃষ্টিকারী কবিরা প্রায় কেউই দীর্ঘ কবিতায় উৎসাহ দেখাননি। পরবর্তী দশকে একা পবিত্র মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ কবিতার দুরূহ আঙ্গিকটিকে নিয়ে একনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এই সময়েরই উৎকৃষ্ট ফসল পবিত্র-রচিত 'ইবলিশের আত্মদর্শন'—যা নিঃসন্দেহে বাংলা কবিতার ক্লাসিক সম্পদ। পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য,—যেখানেই হোক, নামী কবিদের রচিত দীর্ঘ কবিতার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ পাঠকের চোখে পড়তে পারে। তাদের মধ্যে একটি হল—দীর্ঘকবিতার ভাবনাপ্রতিমাটি যে কোনও পুরাণ-প্রোথিত কাহিনীর ওপর নির্ভর করে পরিণতি পায়। গত তিরিশ বছরেরও বেশি সময় কবিতা লিখছেন পবিত্র। পাঠযোগ্য এবং স্মরণযোগ্য অনেক দীর্ঘকবিতার রচয়িতা তিনি। সেই সব রচনাতেও আমরা লক্ষ করি মিথ এবং মিথের ব্যঞ্জনার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার। 'পরশুরাম-পর্ব'-তেও পবিত্র দীর্ঘকবিতার এই মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগী। মহাভারতীয় পরশুরাম, যিনি পিতার আদেশে হত্যা করেছিলেন নিজের মা-কে, এই কবিতায় আবিষ্কৃত হন আত্মসমালোচনায় বিদীর্ণ এক বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ ব্যক্তিমানুষ হিসাবে। —'জেনেছি—সর্বস্ব দানে নারীর একারই দায়;/পুরুষের শুধু/সন্তোগ, দহন, ত্রাস, মর্দন, লেহনই ধর্ম;/জয় তারই, নারীর পূর্ণতা পরাজয়ে?' —এই তেতো উপলব্ধি, নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজসৃষ্ট এই বৈষম্য-চেতনা পরশুরামকে ক্লিষ্ট করে; — অপরাধবোধে ছিন্নভিন্ন হন তিনি। —'আমিও বহন করি সেই মৃত-চেতনার উত্তরাধিকার; —'। কিন্তু শুধুই যদি পুরাণ-কল্পিত সেই অভিশপ্ত চরিত্র পরশুরামের আত্মধিক্কারেই সীমাবদ্ধ থাকত এই কবিতা, তাহলে তা তেমন ভাবে বিশেষ হয়ে উঠত না পাঠকের কাছে। পবিত্রর এই রচনা আধুনিক পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য এই কারণেই যে, তাঁর পরশুরাম, বস্তুত, আধুনিক মানুষেরই এক প্রতীকী প্রতিনিধি। আধুনিক সময়ের মূল ব্যর্থতা, গ্লানি, অসুখ, হতাশা এবং বিপন্নতা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় পুরাণের পরশুরামের স্বগত উচ্চারণ কিংবা বিলাপে। সত্যকথনের দায় নিয়ে একা বেঁচে থাকতে হয়েছিল পরশুরামকে। আধুনিক পরশুরামও সেই একই দায়বদ্ধতার উচ্চারণ করে—'রাজা আসে, রাজা যায়.../ গণতন্ত্র... সাম্যবাদ... মিছিলে-মিছিল.../ একাকার রাজপথ, গলিপথ/ কোনো অবক্ষয়/ দেখিনা। সংসদে হুঙ্কারহীন ভীষণ শব্দে কানে দিই খিল।/ সকলেই বক্তা, কোনো শ্রোতা নেই।' পবিত্রর পরশুরামের 'স্বপ্নের নেই মরণ', 'তার চলা বিরামহীন, তার —/ পাপড়ি ঝরাতে ঝরাতে থাকে/ ফুটে ওঠার গল্প।' সেই পরশুরাম শুধু মাত্র আত্মধিক্কারে পরাজিত কোনও আত্মা নয়, সে দেখতে জানে স্বপ্ন, আবিষ্কার করতে জানে স্বপ্নকে; সে খুঁজছে 'বৈরী বিশ্বের প্রাণ-ভোমর...।' ...'বইয়ে দেবো দিগন্ত জোড়া আলোর ঢল —', —এই স্বপ্নে উজ্জীবিত, এই শপথে দীক্ষিত আধুনিক পরশুরামের আহ্বান মানুষের প্রতি—'এসো অন্ধ আর খোঁড়া আর বামন,/ এসো ভাবরাহীদের দল,/ ছেঁড়া ট্রাউজার পরা বেকার যুবক আর নৃত্যপিঠ কেরানী,/ আর তোমরা, হে যৌনপীড়নক্লিষ্ট যুবতী!/ এসো সর্বস্ব খোয়ানো ভিখারী শিশুর পাল,/ পা মেলাও এই পদযাত্রায়।'... বাংলা কবিতার দীর্ঘ পদযাত্রায় পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের এই দীর্ঘ কবিতাটি এক বিশিষ্ট সংযোজন, —যা বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবিদাকেই পূরণ করেছে বলা যায়।

কাব্যনাটকের চর্চা সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় বিশেষভাবে নজরে আসে না। একমাত্র বুদ্ধদেব বসুই ছয় এবং সাতের দশকে এই বিশেষ মাধ্যমটিকে নিয়ে তুমুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। পরিণামে বাংলা কাব্যচর্চার আবহমান ধারাবাহিকতায় যুক্ত হয়ে ছিল নতুন এক মাত্রা। আমরা পেয়েছিলাম উঁচু মানের কিছু কাব্যনাটক যা এখনও কলকাতার অভিজাত মঞ্চগুলিতে সাড়ম্বরে অভিনীত হয়। চারের দশকের এবং পাঁচের দশকের কোনও কোনও কবি অবশ্য বেশ কিছু সফল কাব্যনাটক রচনা করেছেন। সম্প্রতি আমরা লক্ষ করছি যে ছ'য়ের দশকের পরিশ্রমী এবং পরিশীলিত কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত কাব্যের এই ধারাটির প্রতি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ১৯৯৬-এ প্রকাশিত তাঁর 'নির্বাচিত কাব্যনাটক' তাঁর সেই আগ্রহ এবং একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার উজ্জ্বল উদাহরণ। মোট আটটি কাব্যনাটকের সমাহার এই নির্মেদ গ্রন্থে। প্রতি নাটকেরই আয়তন সংক্ষিপ্ত। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে এখানে পরিবেশিত কাব্যনাটকগুলি কবির একান্ত অভিনিবেশের উদাহরণ। পরপর রচনাগুলি পড়লে পাঠকের একইরকম মনে হতে পারে যে আমরা একটি দীর্ঘ নাটকের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পড়ছি; আবার একই সঙ্গে সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিও এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যনাটক। এর কারণ বোধহয় এটাই যে, আটটি কাব্যনাটকেরই মূল বিষয় হল প্রেম বা প্রেমজনিত আশা, হতাশা, ক্ষোভ, বিক্ষোভ এবং অপূর্ণ কামনাবাসনার ধ্বক। 'ঘর ও আকাশের গল্প'-এ শুধুই এক পুরুষ ও নারীর কথোপকথন; নামহীন পুরুষ ও নারী। প্রেম বিষয়ক সেই চিরন্তন টানাপোড়েন এখানেও; —যদিও বলা যায়, বৈধ প্রেমের থেকে অবৈধ প্রেমের প্রতিই মঞ্জুষের পক্ষপাতিত্ব। এই রচনায় নারী চায় ঘরের নিশ্চিন্ত ও সুরক্ষিত প্রেম;—"আমি যে তোমাকে চাই প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিদিন/ এসো নিয়ে যাই ঘরে/ আমাদের বাইরের প্রেম/ তুমি আর 'না' বোলো না প্লিজ।" কিন্তু পুরুষ বলে—'মুক্ত প্রেমে দেওয়ালের বাঁধন এনো না/ কাউকে কি পাওয়া যায়

প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিদিন।' 'মৈত্রেয়ীর কাছে' কাব্যনাটকটিও মূলত দুই অসমবয়সী পুরুষ ও নারীর কথোপকথন। প্রৌঢ় পুরুষ বলে—'আমি যে পারি না নিতে—/নড়বড়ে দাঁত, সাদা চুল/চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি/ অমসৃণ ত্বক।' উত্তরে নারী বলে—'মাঝে মাঝে নিষেধের বেড়া টপকে এসে/ ভালোবেসো।/ কোনো দায়বদ্ধতায়/নিজেকে পীড়ন তুমি করো না কখনো।' 'অবগাহন' রচনাটিতে মঞ্জুষ জমদগ্নি, রেণুকা এবং পরশুরামের পরিচিত মিথটিতেই সন্ধানী আলো ফেলতে চেয়েছেন। মঞ্জুষের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি এই রচনায় পরিচিত মিথটিকে ভাঙতে চেয়েছেন। চিত্ররথ ও মঞ্জরিকার নিষিদ্ধ প্রেম গোপনে দেখে ফেলেছিলেন রেণুকা; যা দেখে তাঁর 'সমস্ত শরীরে তোলপাড়/রক্তে এত উত্তাপ উষ্ণতা...।' স্বামী জমদগ্নির আদেশে পুত্র পরশুরাম হত্যা করে নিজের মা রেণুকাকে। এই নাটকে আমরা দেখি হিংসা, অনুশোচনা কিংবা আত্ম গ্লানা নয়; প্রেমই বদলে দেয় ঋষি জমদগ্নি ও পুত্র পরশুরামকে;—জমদগ্নির অনুভব—'ভালোবাসা এক তীব্র অধিকারবোধ/ হয়তো বা অহংকারও/ তাতে যদি সামান্য আঘাতও লাগে/ মানুষ ব্যাবুল হয়...'/ নাটকের শেষ হয় অন্য ভাবে। ভালবাসার তীব্র অনুভবই বোঝাপড়া আনে জমদগ্নি ও রেণুকার মাঝে। মঞ্জুষের পরশুরাম তাঁর নিজস্ব এবং অনন্য সৃষ্টি; এই পরশুরামও অসাধারণ প্রেমবোধে দীক্ষিত আধুনিক পরশুরাম যার স্বগত কথন—'আজ আমি তৃপ্তি নিয়ে ভাবতে পারি/ আমি ভালোবাসার সন্তান/আমি যাই—সেরে আসি স্নান/ আপনারা দুজন এখন ভিতরে যান/ ভিতরেও আজ খুব আলো জ্বলে আছে...'।

কাব্যনাটকের এই পরিচ্ছন্ন সংকলনটি বাংলা কবিতার মর্যাদা যেমন বাড়িয়েছে, তেমনই মঞ্জুষের কাছে পাঠকের প্রত্যাশাও বাড়িয়েছে। আমরা চাই—রৈখিক নয়, মঞ্জুষ পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক লিখুন; তৃপ্ত করুন পাঠকদের।

'গুপ্ত গ্রন্থের মতো কবিতার খাতা/ বিপ্লবীর গোপন নির্দেশ সম্বলিত/ কিংবা যেন তিব্বতের ঘৃতের প্রদীপে/ আলোকিত গুম্ফার গভীরে রাখা অত্যন্ত/ প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্রের বিরল রহস্যময় পুথি...'। এই পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠ করে শুধু মুগ্ধ নয়, চমকিত হয়ে উঠি। এক নতুন কণ্ঠস্বর শুনছি না?... এক নতুন শব্দচেতনা, গম্ভীর, অভিজাত এবং বৌদ্ধিক এক কাব্যমাতা? 'মেঘ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নের প্রত্যেক আবিষ্কারে' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার অংশ উদ্ধৃত করলাম। এক দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে কাব্যচর্চায় মগ্ন আছেন মেঘ। বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রায়ই চোখে পড়ে আমাদের। এখানে আলোচিত কাব্যগ্রন্থটি মেঘের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁর প্রথম গ্রন্থেই মেঘ ব্যক্তিক্রমী, মৌলিক, পরিণত এবং গভীর। আমাদের জীবনের সব কিছুতে যেমন, অনিবার্যভাবে কবিতা কিংবা সাহিত্যের চর্চাতেও সাংবাদিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। চটজলদি বিষয় নিয়ে ঝটিতি পাঠযোগ্য কবিতার এক চটুল ভাষা আছে যা এখন অনেকেরই করায়ত্ত। কবিতা লিখতে এসে প্রথম থেকেই সম্ভবত মেঘ সংকল্পবদ্ধ যে সবাই ট্রাম লাইনের মতো যে সরলরেখায় হাঁটেন, তিনি সেদিকে হাঁটবেন না। নিজের কবিতাকে তিনি করে তুলবেন মন্ত্রের মতো শুদ্ধ, দিগন্তের মতো সুদূর ও রহস্যময়, দীর্ঘদিন ধরে আন্তরিক মমতায় তিল তিল করে গড়ে তোলা ভাস্কর্যের মত সুন্দর, সাংকেতিক ও গম্ভীর। শব্দের অন্তর্নিহিত মহিমা, রহস্য ও সম্ভাবনাকে নিজের কবিতায় আবিষ্কার করতে চান মেঘ; এবং তাঁর কাছে এক একটি কবিতার রচনাই হল তাঁর নিজের গ্রহণে লালিত প্রতিটি স্বপ্নের উন্মোচন কিংবা আবিষ্কার। এ কারণেই তাঁর সান্দ্র উচ্চারণ এ রকম—'স্বপ্নের প্রত্যেক আবিষ্কারে জন্মলে নতুন ঝরনা / জেগে ওঠে, খুঁজে পাই অজানা উদ্ভিদ/ নতুন অচেনা ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে বিরল হরিণে;...'। মেঘ-রচিত কবিতার এক একটি পঙ্‌ক্তিই যেন বোধ, জ্ঞান ও গাঢ় অভিজ্ঞতার অনুবিধ্ব। যেমন মেঘ যখন লেখেন—'শিল্পকলার ভিতর মৃত্যু ঘুমিয়ে আছে'; কিংবা—'তুমি অশ্বত্থ নও/ তুমি তো ভগ্নাংশ মাত্র/ সুনিবিড় বস্তুপুঞ্জে চূর্ণবিচূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের অল্প এক কণা'—; অথবা—'সর্বগ্রাসী সুন্দরের এই তাজমহলে/ মৃত্যুর হাতছানি পাই, মৃত্যু আলোড়ন তোলে মগজে হৃদয়ে'... তখন আমরা, পাঠকেরা অনুভব করি যে মেঘের কবিতার শিকড় কোনও বালি চড়ায় নয়, জীবনের অপরিসীম রহস্যের খোঁজে প্রতিক্ষণ এক অনুসরণের গভীরে প্রোথিত। তরুণ এই কবির কবিতা যে প্রকৃত প্রস্তাবে, পদ্যসই শব্দের পরিকল্পিত ভাস্কর্য, তা তাঁর কবিতা থেকেই প্রমাণিত 'এলিফ্যান্টা' কবিতায় মেঘ আহ্বান করেন বিরল সৌন্দর্যসৃষ্টিকারী সেই ভাস্করকে—'ও ভাস্কর, আঙুল আমাকে ছোঁয়াও/ হে ভাস্কর তোমার পায়ে আমার দণ্ডবৎ/মহেশমূর্তি মিলেমিশে যাক আমাতে—/অস্তিত্বে —/আমার শিরে, জীবনের মাটি জলে।' গভীর এক বিশ্বাস এবং অনুরেণণায় প্রাণিত হয়ে কবিতা রচনা করেন বলেই সামগ্রিক হাততালি কিংবা সহজলভ্য কোনও সাফল্যের প্রতি মেঘের আস্থা নেই। তিনি শিল্পে যেমন, মননেও তেমনই পুরোপুরি ক্লাসিক; সেই কারণেই তিনি লেখেন—'কবিতাগুলিকে বলো/ চলে যাক/ অফুরন্ত সময়ের দিকে।' এই বিরল কাব্যগ্রন্থটির সবথেকে উৎকৃষ্ট কবিতাটি হল আমার মতে,—'ছেলে ভুলোনো ছড়া'; যার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হল এ রকমই অনন্য—'খোকা, দুষ্টুমি করতে নেই, শান্ত হয়ে বোসো/ তোমার মা পুড়ছে/ ওই দেখো পাহাড় গলে কেমন নদী আর গাছগুলো/ মানুষ হয়ে যায়—'। অন্তরঙ্গ প্রকাশনার সাহসী উদ্যোগ এই গ্রন্থটি।

মেঘকে বলি— আপনি আরও লিখুন; বাংলা কবিতার পেলব মসৃণতায় যোগান দিন আরও স্বাস্থ্য, আরও ভাস্কর-প্রাণিত শব্দচেতনা।

'জীবনবাদী অজিত সত্যের মুখ অনাবৃত করে দেখান তাঁর কবিতায়।' সাতের দশকের বিশিষ্ট কবি অজিত বাইরীর 'আগুনের চাদর'-এর ব্লার্বে জানানো হয়েছে। আমরাও এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। অজিত এক পরিশ্রমী এবং প্রকৃত মানুষ-দরদী কবি। জীবন বিষয়ক ছোট ছোট তাঁর নিজস্ব অনুভব, ভাবনা (এবং দর্শনও বলা যায়) অজিত প্রকাশ করেন চাতুর্যহীন, প্রাঞ্জল, নির্মেদ এবং মৃত্তিকা-গন্ধী এক ভাষায়, যা একান্তই তাঁর নিজস্ব। ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি যে অজিতের জীবনে অনেক দুঃসময় গেছে কিন্তু তবুও তিনি প্রকৃত প্রেমিকের মতো কবিতাকে আঁকড়ে আছেন প্রগাঢ় বেদনায়, ভালবাসায়। অজিতের চেতনাসমৃদ্ধ দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে সরল গদ্যে লিখিত একটি কবিতায়—'নিজের জায়গা থেকে'। অজিত জানান,—তাঁর পাঠকদের—'বুকের সন্তানের মতো কলমকে অন্যের সেরেস্তায় ভাড়া খাটাতে রাজী নই। ঘাড়ের ওপর চেপে আছে বুনো বাইসনের রোখ। চোয়াল শক্ত করে কামড়ে আছি কলম।' এই একই ধরনের সঙ্কল্প প্রকাশিত আরও একটি অসাধারণ কবিতায়—(জোঁক), যেখানে অজিত বলেন—'যদি কামড়াতেই হয়,/ জোঁকের মতো কামড়ে ধরো।' প্রকৃত শিল্পীর বিশ্বাসে নিজের কাছে নিজেরই অঙ্গীকার অজিতের—'উপেক্ষার নুনের ছিটে/ যতোই পড়ুক মুখে/ তুমি কামড়ে থাকো,/কামড়ে থাকাই শিল্পীর স্বধর্ম।' শিল্পী হতে পারেন অজিত কিন্তু সংসারে সন্ন্যাসী আদৌ না। তাঁর ঘর-গেরস্থালি আছে; আছে সন্তানের জন্য মমত্ব। আর মৃত্যুচেতনায় ঋদ্ধ এই সামান্য চাহিদা—'আমার যা কিছু চাওয়া, সবই সন্তানের জন্যে;/ সে আমার নশ্বরদেহকে মুড়ে দেবে আগুনের চাদরে।' 'আগুনের চাদর'— মৃত্যু কিংবা বহ্নিমান চিতার এতো নিপুণ চিত্রকল্পের ব্যবহার অজিতের মতো কবির পক্ষেই সম্ভব। জীবনের এবং মানুষের প্রতি আস্থা অবিচল রাখতে চান যাবতীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেন—'দূর থেকে প্রতিটি মানুষকেই মনে হয়/দুর্ভেদ্য দেয়াল।/ কাছে গেলে দেয়াল সরে গিয়ে উন্মুক্ত দিগন্ত।' 'সময়ের সত্যকে প্রকাশ' করবার জন্য উন্মুখ অজিত বাইরীর দু-লাইনের এই কবিতাটি তাঁর জাত প্রকৃতই চিনিয়ে দেয়—'যখন যুদ্ধ ছিলো, তখন তিনি একা;/ এখন যুদ্ধ শেষ, তাঁর পাশে অনেক মানুষ।' কবিতার নাম—'কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। এখানে আলোচিত অজিত বাইরীর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'সময় এবং শহিদবেদি' আর 'আগুনের চাদর' তাঁর প্রতি পাঠকদের আগ্রহ আরও বাড়াবে।

'সব ফুলই সূর্যমুখী' কাব্যগ্রন্থে উদয় চট্টোপাধ্যায়ের 'খুকি, বাড়ি যাও' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না—'দাঁড়িয়ে থেকো না, খুকি,/ বাড়ি যাও,/ চারদিকে লোলুপতা... স্বপ্নময় প্রেম আছে পৃথিবীতে/ বিশুদ্ধ নিসর্গও কিছু,/ তাই কি এসেছ খুঁজতে?/ ভাগ্যবতী হলে/ পেয়ে যাবে কোন একদিন.../ এখন পড়ন্ত বেলা এলোমেলো হাওয়া/ চারদিকে লোলুপতা,/ আমি ব্যতিক্রম নই—/ খুকি, বাড়ি যাও।' বলাই বাহুল্য, 'আমি ব্যতিক্রম নই' এই পঙ্‌ক্তিই কবিতাটির মেরুদণ্ড। এই কবির রচনা আমরা আরও পড়তে চাই।

. মূলত গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক কামাল হোসেন যে কবিতাতেও দক্ষ কম নয়, তা বোঝা গেল তাঁর কাব্যগ্রন্থ—'সীমান্তের মানুষ' পাঠ করে। 'হল ঘরের সমস্ত চেয়ারে আজ বসে আছে/ সংখ্যাহীন শববাহক'—এ রকম এক চিত্রকল্পের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয়। এ কি মৃত্যুর উৎসব? কামালও, আমরা লক্ষ করি, কবিতার ক্লাসিক স্থাপত্যে বিশ্বাসী। হৃদয়ের গাঢ় অনুভব থেকে তিনি লেখেন—'পয়ার কিংবা মাত্রাবৃত্তে এরপর শুধু দ্যাখো/ অস্তিত্বের উপড়ে ফেলা অসমাপ্ত রসায়ন,/প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির অস্থির শিখায় যেমন/যুদ্ধ মাতানো স্তরের অবিরাম সাংকেতিক অনুবাদ,...'। কথাসাহিত্য এবং কবিতা—দুটি মাধ্যমেই প্রশ্নহীন দক্ষতা করায়ত্ত থাকা সহজ নয়। কামাল হোসেনের পক্ষে তা সম্ভব হয়। তাঁর অনেক কবিতাই—'মানবিক নির্মাণ'।

চিত্রকল্প-নির্ভর কবিতা লেখেন বাংলাদেশের কবি হোসাইন কবির। 'জলের কল্লোল বৃক্ষের ক্রন্দন' গ্রন্থটিতে অনেক কবিতাই বারবার পড়তে হয় চিত্রকল্পের চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্যের টানে। শব্দের ওজন মেপে, বুদ্ধি, কল্পনা এবং সংহত আবেগের জারক-রসে রচিত হয় এই কবির চিত্রকল্পগুলি; যা পাঠকের কল্পনাকে প্রকৃতই উত্তেজিত করে। কয়েকটি উদাহরণ—'ল্যাম্প পোষ্ট মেপে হাঁটে/ সভ্যতার ঘোড়া'; 'পুকুরের লোনা জলে ভাসছে দুপুর/বেহুলার চোখ/ ভাসছে দুপুর/ আমাদের সমস্ত দুপুর...', 'খোসা ছাড়িয়ে/ নগ্ন আপেল/ মৃদু হাসি'—; 'যুদ্ধাহত একটি কাক কাঁদছিলো মগজের শার্সিতে'—। স্বতন্ত্র ঘরানায় কবিতা রচনা করেন হোসাইন কবির। তাঁকে এপার থেকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাই। আর অপেক্ষা করব তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের। □

পরশুরাম-পর্ব—পবিত্র মুখোপাধ্যায়/কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা-২৬ / ১৫.০০

নির্বাচিত কাব্যনাটক—মঞ্জুষ দাশগুপ্ত/ মহাদিগন্ত, বারুইপুর / ৪০.০০

স্বপ্নের প্রত্যেক আবিষ্কারে—মেঘ মুখোপাধ্যায়/ অন্তরঙ্গ প্রকাশনা, কলকাতা ৬৮ / ২৫.০০

সময় এবং শহিদবেদি—অজিত বাইরী / স্বর্ণাক্ষর, হাওড়া ১ / ১৫.০০

আগুনের চাদর—অজিত বাইরী/রক্তমাংস, হাওড়া ১ / ১৫.০০

সব ফুলই সূর্যমুখী—উদয় চট্টোপাধ্যায়/মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পঃ / ২৫.০০

সীমান্তের মানুষ—কামাল হোসেন/প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা ১৭ / ২০.০০

জলের কল্লোল বৃক্ষের ক্রন্দন—হোসাইন কবির/বাড পাবলিকেসন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ / ৩৫.০০

সময়ই পরমহংস কাব্যের দুধসাগরে

হাসির মল্লিক

চল্লিশ বছর ধরে একজন কবি কবিতা লিখে চলেছেন। চল্লিশ বছর কি খুব কম! এ তো সমগ্রজীবন। এই সময়সীমায়, জীবনযাপনে মঞ্জুষ দাশগুপ্তের আটটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচন করে প্রকাশিত হয়েছে 'নির্বাচিত কবিতা'।

এই দীর্ঘ সময়ে একজন কবির নির্বাচিত কবিতা যা হয়ে উঠতে পারে কবিক্ষমতার প্রতিনিধিত্বের দলিল বা কবির দগ্ধ হৃদয়ের পর বেঁচে থাকা সবুজ ঘাস অথবা কাব্যের দুধসাগর—যেখানে জল থেকে আলাদা করে চেনা যাবে দুধ। পাঠক মুখোমুখি হবে তেমন পরমহংসের—এমত আকাঙ্ক্ষা যেমন জাগে তেমনই মনের কোণে প্রশ্ন উঁকি মারে কবিতা কি পারবে ভেঙে দিতে সময়ের ঘড়ি? নাকি সময়ই জীর্ণ করবে কবিতাকে? এই প্রশ্নে মঞ্জুষের কাব্যজগতে প্রবেশ করে কবির বদলে যাওয়াকে চিহ্নিত করি। '৬২-তে প্রকাশিত 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর মঞ্জুষ বদলেছেন '৯৫ সালে 'অন্ধকার অন্ধ নয়'তে এসে। এই দীর্ঘ সময়ে কবি, কবিতা, সমাজ যেমন দ্রুত বদলেছে তেমনই কবি ও কবিতা সম্পর্কে সমাজভাবনা ও বদলেছে। তবে মঞ্জুষ তাঁর কবিস্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্যে অপরিবর্তনীয়, তা হল মঞ্জুষের প্রেমিকহৃদয়। প্রথম দিকের কবিতায় 'শঙ্খ সাদা মেয়ে' কবির 'হৃদয় রক্তাক্ত' করেছে যেমন, এখনও তো তেমনই কবিকে প্রেম পরম ভিখারি করেই রেখেছে। সমগ্রকাব্যচর্চা কালে এ কবির প্রেমভাবনার ধরন—'ভালবাসা মোরে ভিখারি করেছে, তোমারে করেছে রানি' জাতীয় রোমান্টিক বিধুরতা। কবি প্রেমের যাতনায় জ্বলেছেন, বিরহে কাতর হয়েছেন আবার আকাঙ্ক্ষা করেছেন রক্তমাংসের নারীকেই। মঞ্জুষের কবিতায় নারী কোনও বিমূর্ততার প্রতীক নয়। বরঞ্চ কবি সরাসরি জানান, 'দ্বিচারিনী সেই নারী যাকে আমি ভালবাসি'। আর প্রেমে শুধু সমর্পনই নয়। কবি লেখেন, 'হে প্রেম, হে দুঃখ তুমি অনির্বাণ জ্বলে থাকো, জ্বালাও আমাকে'।

মঞ্জুষের কবিতায় প্রথম দিকে শক্তি-সুনীল-শঙ্খের প্রভাব রয়েছে। সুনীলের 'নীরা' জাতীয় কবিতার মুডের সঙ্গে মঞ্জুষের প্রেমের কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। (নির্বাচিত কবিতা সুনীলকেই উৎসর্গ করা।) অন্যদিকে 'তাহলে' কবিতা—'আমি হাত পেতে থাকি হায়! অন্নপূর্ণা ভিখারিনী।' এ যেন 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' শঙ্খ ঘোষের উচ্চারণ। শক্তিরধারা সঞ্জাত মঞ্জুষের প্রথমদিকের কবিতায় বাউল উচ্চারণ, 'আমার সমস্ত কিছু রেখেছি যে তোমার সিন্দুকে।' পূর্বসূরীদের এই প্রভাব মঞ্জুষের কবিতাকে বাংলা কবিতার তৎকালীন পরিবর্তনশীল ধারায় চিহ্নিত করে। কেননা আধুনিক কবিতা কোনও ঐতিহ্য ছুট, একক কবির প্রচেষ্টা নয়। বহু কবির মিলিত উদ্যোগ। এ উদ্যোগে একে অপরের মুড, কাব্যরীতি বহন করেই রচনা করে চলেছেন কবিতার নানা রূপ। এ পর্যায়ে মঞ্জুষও পঞ্চাশের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সরাসরি আধুনিক কবিতার জগতে ঢুকে পড়েন এবং নিজস্বরচনা বলতে থাকেন নিজস্ব রীতিতে—তা সমকালের কাব্যরচনার ধারাকে ছুঁয়েই। মঞ্জুষের নিজস্বতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'স্বর্গ থেকে টেলিফোন' কাব্যগ্রন্থ। এ কথা আমি আগেই 'চতুরঙ্গে' লিখেছিলাম—'আগুনের ডানা' বইটি আলোচনা করতে গিয়ে।

বহু কবির মতো মঞ্জুষের কাব্যচর্চা কালে নিজের কবিতারই পুনরুক্তি আছে বার বার। এত পুনরুক্তি কেন? ওই বোধগুলো প্রিয় বলে? তা সত্ত্বেও কবি বহু মগ্ন কবিতা লিখেছেন। যেমন—'পা' 'বিরহ বিষুবরেখা' 'তপস্বিনী' 'রাধামোহনপুর'। এ কবিতায় লেখেন—'ঘুমোইনি তো ঘুমের মধ্যে তবুও যেন আছি / স্মৃতির ভিতর উঠলো ডেকে রাধামোহনপুর'। এ জাতীয় অনেক কবিতার চিত্রকল্পে, ছন্দে ও সাবলীলতায় কবি আমাদের মনোযোগ দাবি করেন।

মঞ্জুষই তো লিখেছেন আমাদের পরিচিত কবিতার লাইন 'সুন্দরের কাছে যেতে নেই / টুকিটাকি ভুল ধরা পড়ে।' 'প্রেমিক রোদ্দুর তার বান্ধবী হাওয়ার সাথে / খেলা করে

নদীতে এখন' কিংবা সেই লাইন 'মাঝে মাঝে ভুল দরজায় টোকা দিতে ইচ্ছে হয় খুব।' এসব ওঁর 'স্বর্গ থেকে টেলিফোন' বইয়ের কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থটি কবির শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এরপর থেকে মঞ্জুষের কাব্যে বদল আসে। বদলটা টের পাওয়া যায় 'এত প্রিয় এখন পৃথিবী' (১৯৯২) তে—বদলটা 'আগুনের ডানা'য় আরও বেশি প্রকট। যেখানে ব্যক্তিগত প্রেমভাবনা বিরহ, রোমান্টিকতা থেকে সরে কবিতায় সমাজভাবনা ফুটে উঠছে। এই পর্যায় থেকে কিন্তু মঞ্জুষের কবিতার গ্রাফ নিম্নমুখি হয়। চিত্রকল্প যত সম্ভব পরিহার করে বক্তব্য সরাসরি বলার জন্য অনেক কবিতা ঢিলেঢালা হয়ে উঠেছে। আসলে মঞ্জুষের দক্ষতা প্রেম ও রোমান্টিক কবিতাতেই। তবু জীবন ও সমাজের বদলে কবি বদলান। 'চশমার কাচ / ক্রমাগত বদলাতে থাকি'। এই যেন নিয়তি। সময়ের ঘাত।

কিন্তু মঞ্জুষ '৯৫ সালে যেন চোখে নতুন চশমার কাচ লাগান 'অন্ধকার অন্ধ নয়' কাব্যে নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকে। এ পর্যায় কবির যেন পরিণতিবোধের পর্যায়। শান্ত, সমাহিত মনন-সঞ্জাত এক মঞ্জুষকে আবিষ্কার করি। কবি মগ্নজগৎ রচনা করেছেন—'খুব রাতে চাঁদ ফটোগ্রাফার ফিরিয়ে দেয় ডার্করুম', 'জল আয়নায় মুখ দেখছে কাক' ভূতেদের প্রতিবিম্ব নেই, 'বরফের উপর আমার আত্মার লাল লিখে রাখি / আমার রক্ত কখনো কালো ছিল না/ বিনীত ছিলাম বলে ভুল ভেবেছিলে।' সময়ের বদলে এমত কথনে নতুন মঞ্জুষকে দেখি। এ পর্যায়ে আরও ভিন্ন ফসলের কামনা কবির কাছে প্রত্যাশা করি।

আহমদ রফিকের এ বাংলায় প্রধান পরিচয় বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক ও রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসাবে। তিনি যে একজন কবি এ পরিচয় আমাদের অজানা ছিল। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' হাতে পেয়ে জানতে পারছি তাঁর কাব্যচর্চা বহুদিন ধরেই চলছে গবেষণা, প্রবন্ধের পাশে পাশে সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই। পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। অতি সুমুদ্রিত প্রকাশনা।

আহমদ রফিক অত্যন্ত সমাজসচেতন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ভাবনা থেকে কবিতাগুলি লিখেছেন। সময়কে তিনি পাশে সরিয়ে রেখে অলীক কাব্যজালে মেতে ওঠেননি। সময় তাঁর কবিতার বিষয় এবং সময়ের দাবি অনুসারেই কাব্যভাবনা বদলেছে। কবিতাগুলোতে মানুষ, সমাজ, সমাজের মধ্যে মানুষের অবস্থান আর সময়ের বদলে মানুষ কেমন আছে, বাঁচার জন্য বিপ্লব কেমন এবং স্বদেশপ্রেমের কথা ফুটে উঠেছে। এসেছে বাংলাদেশের কবিতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ ভাষাশহিদের কথা।

এই প্রত্যক্ষ ভাবনা কিন্তু আহমদ রফিকের কবিতাকে সুডৌল ও পেলব হতে দেয়নি। বাস্তবতাবোধে নির্ভেজাল থাকায় কবিতায় কবিহৃদয়ের রক্তক্ষরণের আড়াল হয়েছে। কবিতাগুলো যত তত্ত্ব ভারাক্রান্ত, দার্শনিকতা সম্পৃক্ত, তত জীবন ও আবেগ সম্পৃক্ত নয়; মেধাসঞ্জাত কিন্তু হৃদয়সঞ্জাত নয়। এ কবির বোধে—'জীবন আমার চোখে তবু কোন পুতুলনাচের / ইতিকথা নয়।' 'জীবন এখনো গভীর জটিল জিজ্ঞাসাময় অন্তহীন সময় রহস্যে / নিত্য চেষ্টা বাস্তবিক অন্তহীন শ্রম'।

আর কবিতায় যে ধরনের সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তা হল—'ওদিকে জীবন পোড়া গন্ধ শুঁকে / ইটের উনোন কিংবা ডাস্টবিন খুঁটে খায়— / গাছের ছায়ায় ভাঙ্গা গেরস্থালি, আদিম আগুন / ছাইচাপা, মধুর উত্তাপ।' কবিতার আজকের পাঠক এ ধরনের নির্মাণকে কবিতা বলবেন কি না জানি না। □

নির্বাচিত কবিতা—মঞ্জুষ দাশগুপ্ত / কবিতা-পাক্ষিক, কল-২৬ / ৩০.০০।

শ্রেষ্ঠ কবিতা—আহমদ রফিক / বইপাড়া, শাহবাগ, ঢাকা / ৮০.০০

দুটি ভিন্ন মেরুর জীবন

মালবিকা সেনগুপ্ত

কোনও লেখক যখন উপন্যাস লেখার জন্য কলম ধরেন, তখন ধরেই নিতে হয় অক্ষরমালা অভিজ্ঞতার কাছে নতজানু হবেই। অভিজ্ঞতাহীন কল্পনার পরতে সার্থক সৃষ্টি বোধ হয় সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল—অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটা কেমন? কোন শ্রেণীর পাঠকের কাছে লেখক পৌঁছতে চাইছেন? এসবের উপরই নির্ভর করে উপন্যাসের চরিত্র—গ্রামীণ, নাগরিক অথবা অতি নাগরিক। আলোচ্য উপন্যাস 'ছায়া মানুষ' ও 'প্রথম প্রত্যূষ' যথাক্রমে গ্রাম ও শহরের পটভূমিকায় রচিত দুটি ভিন্ন চরিত্রের উপন্যাস।

সোহরাব হোসেনের 'ছায়া মানুষ' গ্রামের পটভূমিতে মানুষের চাওয়া ও না পাওয়ার বাসনা পূরণের এক কাব্যিক ফ্যান্টাসি। চেনা পরিপার্শ্ব, নিতান্তই সাধারণ জীবনপ্রবাহের মধ্যে অন্তর্লীন কামনার ঢেউ যখন মাথা তোলে তখন সে আকাশ ছুঁতে চায়। ঊর্ধ্বমুখী সেই প্রবাহে জীবনের দিনগুলি বদলাতে থাকে একটু একটু করে। আর সেই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয় চেনা মানুষের অচেনা ছবি। সোহরাব হোসেনের উপন্যাস 'ছায়া মানুষ' এমনই একটি ছবি আঁকার চেষ্টা—দৈনন্দিনের সঙ্গে কাব্যিক ফ্যান্টাসির যুগলবন্দি।

উপন্যাসের নায়ক সরম আলি আমবাগানের পাহারাদার। সিনেমা পাগল সরম আলির প্রিয় নায়িকা হেলেন। হেলেনের 'দুধে আলতা রঙ' আর পরীর মতো রূপে বিভোর হয়ে থাকে সে। রাতের স্বপ্নে তার মিলন হয় হুরী-পরীদের সঙ্গে। বাস্তবে সে যথার্থ অর্থে বে-শরম গ্রামের বিধবা ফজলীর সঙ্গে (আম বাগানের পাহারাদারের প্রেমিকাকে অন্য নামে মানাত না বোধহয়) জড়িত। সরমের বউ ইমানতন বিবি চার সন্তানের মা অথচ 'পোড়া তালকাঠ' (তাই তো ফজলী-সরম মিলন দৃশ্যে তীব্রতা সৃষ্টি করতে পারেন লেখক)। ফজলী সরম আলির প্রেমিকা, সরমের পরী-মানবী অথবা তাঁর পরীগমনের স্বপ্নপূরণ।

শরিকি বিবাদে মান্নাদের আমবাগানে ফলন্ত গাছের ডাল কেটে নিয়ে যায় কে বা কারা? সরম আলির ক্ষণিক আলগা পাহারায় এতবড় একটা কাণ্ড হল! সরম নিজেও ভাবে—তা বলে এমনভাবে ডাল কাটতে পারে কেউ? ফলবান গাছের? সরমের অন্তরমহলের ভাবনাগুলি বাইরে আসে, আর তখনই চমক জাগে। চমকে যায় তার মালিক, গ্রামের মাতব্বর, মৌলবি, স্ত্রী ইমানতন এমনকী ফজলীও। মুহূর্তে অচেনা হয়ে পড়ে সরম আলি। '—শালা মানুষ না সপ শোর। সপ শোরের ঔরসে পয়দা। না হলি অমন ফলবান গাছের গায়ে হাত ওটে কারুর? ...' (পৃ. ৬)

ভাতের হাঁড়ির সঙ্গে কথোপকথন চলে সরমের—'ফলবতী গাছগুলোরে কাটলি তোরা? এটা কি মানুষের পরিচয়?...' 'বুঝতে পারছো না এ রাজনীতি! রাজনীতি খেলো দেশটারে'—ভাতের হাঁড়ি বলে। 'শালার রাজনীতির পাছায় মুতি! রাজনীতি করতি গে দয়া ধম্ম সপ ত্যাগ করতি হবে? বে-এনছাপ মানুষ হোতি হবে? বলি ফলবান গাছ আর পয়তী নারী তো একই কথা। পারবি কেউ নিজির পয়তী বো'র প্যাটে ঐরাম করাতের পোঁচ বসাতি?... 'দে মা অন্নমতি তুই শোরের পোগুনোরে বন্টু-টাইট দে'।

আম গাছের ডাল কে কাটল মীমাংসা হয় না। প্রমাণ খোঁজার পালা চলে। তারই মধ্যে নিত্য বোঝাপড়া ফজলীর সঙ্গে সরম আলির। শরীরের বোঝাপড়ার সঙ্গে চুক্তি হয় আধাআধি টুকরির বখরা। লেখকের বর্ণনায় অনবদ্য হয়ে ওঠে দৃশ্যটি—"কালো ভিরকুট্টি অন্ধকার মেঘের উপর এখন যেন হাজারটা রূপালী তরবারির মুহুর্মুহুঃ কাটাকাটি চলছে কাহার পাড়ার আকাশে। সেদিকেই অপলক তাকিয়ে সরম। সে বলে: দ্যাখ ফজলী দ্যাখ। শালা কালোর মধ্যেও হেলেনের উরোতের ঝলকানি।... দখিন কোণের আকাশে তীব্র গর্জনে বাজ পড়ে। ভয়ার্ত ফজলী সবে ঝলকানো এক বিদ্যুতের আলোয় সরমকে দেখে নিয়ে তাকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরে।... খানিকটা গরম রক্তের উষ্ণতার আশায়। সরমও সাড়া দেয়। দু'হাতে ফজলীকে বুকে চেপে ফিস ফিস করে বলে—'দু-টুকরি আম মানে হাজার টাকার লীলাখেলা। মনে থাকে যেন আধাআধি। কতো দিন সে বালবাচ্চাগুলোর মুখি এট্টু পোলোয়া-আলোয়া, গোস্তো-গরমি ধরতি পারিনিকো। মনে থাকে যেন—আধাআধি।" (পৃ. ৫৭)

পাঠকের মনে পড়ে যায়, সরম আলি পিতা। সাদাসিধে সরম আলির পরত খুলে রূপবদল ঘটে। লজ্জাহীন, শয়তান, কৌশলী এক সরম আলি পাঠকের সামনে এসে পড়ে।

মৌলবি এলেন সরমকে শায়েস্তা করতে। সরম তখন পাকা কথক। '...আর এট্টা কোচ্চেন করি জবাব দেন দিনি আপনি তো জেন হাঁছেল করা পীর। বলেন দিনি, কাফের হয়ে মরে গেলি কবরে মনকের ও নেকির এসে কিসব কোচ্চেন টোচ্চেন করে, হ্যাঁ কি না? 'হ্যাঁ'—ঘামতে ঘামতে জবাব দেয় মৌলবী। ...'না ব'লতি পারলি? 'শাস্তি পাবে। মহা শাস্তি...' '...তালি হক কথাখান বলেন হজুর এক পাপের জন্য বান্দা কবার সাজা পাবে? গোরে একবার—আবার কেয়ামতের দিনিও একবার? এডা কি ঠিক বিচার হোলো? বিচারের আগেই কি শাস্তিখান দোবা হোলো না? বিচারের নামে খোদার এডা কি ছিনেমা করা হোলো না?' (পৃ.৪০)

নটেখালির মানুষেরা অবাক হয়। এ তাদের সেই সরম তো? নিখুঁত মাপের ও ফাঁসের জালতি তৈরির ওস্তাদ সরম। লগির মাথায় জালতি বেঁধে সব ঠিকঠাক করে যখন ছেড়ে দেয় তখন সে লগি এক দেখার বস্তু হয়। —'... ও শালী য্যাতো বড় আমের খোল হোক না একবার গলগে দড়িতি টান দ্যাও, মুখ মেরে যাবে, কোনো শালা ফকসাতি পারবে না?' শুধু কি আম? '...ও শালা বড় মালিক ছোট মালিক—বড় মেম্বার—রব্বানি মেম্বার যারেই পুরবি সে জালতিতি সপ ঐরাম ফাঁস এঁটকে যাবে।' (পৃ. ১০৫)

এতসব কথা তার মগজেই ছিল, 'জালতির মতন সে বুনে তুলেছে মাত্র। আমবাগানের পাহারার অধিকার সে ছাড়বে না। চতুর সরম ছলনায় ভোলায় সকলকে। আমবাগানে সে পরী নামাবে। ইমানতনের বিয়ের সিল্কের কাপড়ে তৈরি হয় পরীর সাজ, আর 'পরী' নামার সময় পাশে থাকে ফজলী! অবাক হয় ফজলীও। তার উপোসী যৌবন প্রতিদিন তৃপ্ত করা চেনা শরীরের সরম আলিকে মনে হয় 'পরীগা দান', অদ্ভুত, অচেনা, 'ছায়া মানুষ।'

সুলিখিত উপন্যাস 'ছায়া মানুষ।' উপন্যাসের ভাষা উত্তর চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা যার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) যশোর, খুলনার ভাষার মিল রয়েছে। যেহেতু একটি বিশেষ শ্রেণীর জীবনযাত্রা নিয়ে উপন্যাস সেহেতু অনেক শব্দের অর্থ থাকলে সাধারণ পাঠকের সুবিধা হত। লিখনশৈলী চমৎকার,

সাতের দশকের বাংলা উপন্যাসের গর্বিত সময়কে মনে পড়িয়ে দেয়। দরিদ্র, শোষিত মানুষের প্রতিবাদী, কৌশলী রূপ সৃষ্টিতে সার্থক 'ছায়ামানুষ' লেখকের প্রতি পাঠকের দাবি বাড়িয়ে দেবে।

সম্পূর্ণ বিপরীত পটভূমিকায় লেখা শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'প্রথম প্রত্যূষ।' উপন্যাসটি স্পষ্টতই কোনও একটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের জন্য। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হবে এ যেন লেখকেরই কাহিনী। অতিকথন ও আত্মকথন অনেক সময় বিষয়বস্তুকে গৌণ করেছে, চরিত্রগুলিই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের নায়ক বা অরণি কথক। সেই সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে এসেছে আর একটি চরিত্র সুপ্রতীক, অরণির বন্ধু। অরণি সব অর্থে অভিজাত। জীবনচর্চায়, পারিবারিক ঘেরাটোপে, বন্ধুবৃত্তে। অরণি তার বন্ধু 'নিকটতম বন্ধু' সুপ্রতীককে প্রতিনিয়ত আবিষ্কারের চেষ্টা করে। এই আবিষ্কারের চেষ্টার মধ্যেই উপন্যাসের শুরু। সব ক্ষেত্রে 'বিশিষ্ট' সুপ্রতীক একসময় অরণির প্রেমিকার কাছেও আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে যা হবার তাই হয়েছে। প্রেমিকা ও বন্ধুকে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে দেখে অরণি যন্ত্রনাবিদ্ধ হয়, নিজেকে ফিরে পাবার চেষ্টা করে রেমব্রান্টের ছবির মতো চারিদিকের আতিশয্য থেকে মুক্ত হয়ে।

বাবা, মা এবং বোন ঝিল্লিকে নিয়ে অরণির পরিবার। দুপুর বারোটার পরে কখনওই যাদের লাঞ্চ গড়ায় না। খাবার পর এরিখ সেগাল বা মার্কুয়েজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বাবা। বিকেলে ফিয়েট চালিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যান। এ হেন পরিবারের ছেলে অরণি নামী কলেজের 'ভাল ছাত্র'। যথাসময়ে সে প্রেমে পড়ল মধুমন্তীর, যার ডাকনাম 'টুম'। টুমের সঙ্গে পরিচয় যেন অরণির জন্মান্তর ঘটাল। টুম কেমন মেয়ে? সে খুব ভাল পিয়ানো বাজায়, ভাল রান্না করে, 'ভডকা' 'জিন' সবই পছন্দ করে এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখা কবিতা মুখস্থ বলতে পারে, পুরোটা।

এবার আসা যাক সুপ্রতীকের কথায়। তাঁর ঠাকুর্দা পাশ্চাত্য সঙ্গীতে পারদর্শী, ইনস্ট্রুমেন্টে দক্ষ ছিলেন। বাবা মদ্যপ। মায়ের জীবনে বহুপুরুষের আগমন দেখেছে সুপ্রতীক। রক্তে সঙ্গীত আর লাম্পট্য নিয়ে তার বেড়ে ওঠা। তাই বোধহয় একুশ বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক—'চোদ্দ থেকে চল্লিশ মেয়ে ঘেঁটে দেখেছি সব এক—এক!" (পৃ. ৬৫) অরণির বন্ধু সুপ্রতীকের কাছে তাই 'হিউম্যান রিলেশনশিপ' কথাটার থেকে 'অ্যাবসার্ড' আর কিছু হতে পারে না (পৃ. ৬৬)। কে জানে 'অ্যান আর্টিস্ট ইজ লাইক অ্যান ওপিয়াম ইটার' (পৃ. ৬৮), আর তা ছাড়া অর্থপ্রাপ্তির ব্যাপার তো একটা আছেই। তাই সে শিল্পী হতে চায়, 'প্রয়োজনটুকু সেখান থেকে শুষে নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলার' চেষ্টা করে। কেননা 'চিন্তাশীল মানুষের মনের ক্রমবিকাশ' সেখানে আছে বলে!

উপন্যাসের পাঁচটি ভাগ। সুপ্রতীকের সঙ্গে বন্ধুত্ব—অরণির প্রেমে পড়া ও গল্প লেখার ইচ্ছে—টুমের সঙ্গে সুপ্রতীকের পরিচয়। এরই মাঝে রয়েছে অরণির এক বিমানদা'র কথা (নীললোহিতের ছায়া স্পষ্টতর)—চাঁদিপুর ভ্রমণ টুমদের সঙ্গে—অরণির নিজেকে ফিরে পাওয়া।

এরই মধ্যে চাঁদিপুর ভ্রমণ অংশটি চমকপ্রদ। সেখানে পাঁচটি পুরো এবং প্রায় পুরো কবিতা। জয় গোস্বামীর পরপর রয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী, আল মাহমুদ, ব্রাউনিং, বিষ্ণু দে। থাকা উচিত ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি' ('হঠাৎ নীরার জন্য')। তবুও এই অংশেই কিছুটা 'রিলিফে'র কাজ করে 'কাজলদা' ও 'সবিতা বৌদি'। এই দম্পতির ভালবাসা ও মান-অভিমানে কোনও 'অ্যারিস্টোক্রেসি' নেই। 'কনিয়াক', 'বার্গ্যান্ডি'-র আভিজাত্য থেকে অনেক দূরের বাসিন্দা এঁরা। বৃষ্টির দিনে বেগুনি আর সাবুর পাঁপড় ভাজা হয় এদের বাড়িতে। বেকার স্বামী ও চাকুরে স্ত্রীর সংসারে যাবতীয় স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব সেখানে উপস্থিত। অরণির অভিজাতবৃত্তে এরা যেন অন্য গ্রহের বাসিন্দা।

উপন্যাস জুড়ে ঊর্ধ্বকমার ছড়াছড়ি। 'বিশিষ্ট', 'অসাধারণ', 'প্রেমে পড়লাম' 'নিজেকে খুঁজে পাওয়া' (পৃ. ১১) 'বিবেক', 'উত্তরণ'...এবং আরও অনেক। লেখকের সংশয় কি নির্দিষ্ট শব্দকে ঊর্ধ্বকমাবদ্ধ করেছে? লিখনশৈলী 'অ্যারিস্টোক্রেটিক' এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটাই বোধহয় উপন্যাসের একমাত্র কথা। □

ছায়ামানুষ—সোহরাব হোসেন / রত্নাবলী, কলকাতা-৯ / ৪০.০০

প্রথম প্রত্যূষ—শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় / গ্রন্থ মিত্র কলকাতা-৯ / ৪০.০০

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

আজকের পরিবেশ-বিতর্কের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের পরিবেশ বির্তকের কোনও পূর্ণাঙ্গ কিংবা বিস্তৃত আলোচনার জন্য এ নিবন্ধের অবতারণা করছি না। কারণ দেশ-কাল-বিষয়ের বাহুল্যে ও জটিলতায় 'পরিবেশ' আজ এক বহু-বিতর্কিত বিষয়; স্বল্প পরিসরে, সীমিত আয়াসে সেই বির্তকের প্রতিফলন সম্ভব নয়। আমার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত, সাধারণভাবে পরিবেশ বিতর্কের মূল সূত্রগুলির অনুসন্ধান করা, পরিবেশ সংক্রান্ত বহুমুখী আলোচনায় যার বিচিত্র প্রকাশ আমাদের চোখে পড়েছে। বস্তুতপক্ষে আজকের পরিবেশ চিন্তা, পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ বিতর্ক এই বহুমুখী চিন্তাসম্ভার থেকেই গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আছে বিষয়ের বাহুল্য আর নানা শাস্ত্রের অবদান। তৎসত্ত্বেও মৌলিক সূত্রগুলির, প্রধান প্রশ্নাবলির অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়ত, আজকের পরিবেশচেতনা তথা বিতর্কে ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাটির সন্ধান করা হয়েছে। আজকের বিতর্কে পরিবেশের প্রশাসনিক ইতিহাস তথা সামাজিক ইতিহাসের একটা গুরুত্ব আছে; সমসাময়িক ইতিহাসও পরিবেশগত ব্যাখ্যায় এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আধুনিক পরিবেশবাদকে কালক্রমিক বিচারে আধুনিক ইতিহাসেরই সমার্থক করে দেখা হয়েছে। যে তাত্ত্বিক কাঠামোয় আধুনিক পরিবেশবাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এমনকী তার যে সমালোচনা করা হয়েছে তার মধ্যেও পাই ইতিহাসের এই তথাকথিত আধুনিক যুগের টানাপড়েন। নানা অর্থেই ইতিহাস তাই আজকের পরিবেশ বিতর্কের প্রেক্ষাপট, হয়ত দিশারীও।

পরিবেশ-বিতর্কের আলোচনায় গোড়াতেই একটা কথা স্বীকার করা ভাল। পরিবেশের অবক্ষয়, প্রকৃতি, ভবিষ্যতের আলোচনা নিছক তাত্ত্বিক নয়, এর একটা বাস্তব কার্যক্রমভিত্তিও আছে। পরিবেশ একটা চেতনা, একটা বিজ্ঞান, আবার একটা অভিজ্ঞতাও বটে, নানা কার্যক্রম এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। আজকের পরিবেশ-বিতর্ক গড়ে উঠেছে নানা গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ফলে। এর মধ্যে উল্লেখ্য হলেন রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক। রাজনীতিবিদগণ পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নানাভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এই উপস্থাপনায় কিছু প্রশ্ন—যেমন বনভূমি সংরক্ষণ কিংবা বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা—সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে, যদিচ কিছু বিষয়—যথা শিল্প-বাণিজ্য ও পরিবেশের সম্পর্ক—নিয়ে উন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতর্কও দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীর আলোচনায় এসেছে জৈব ও অজৈব জগতের জটিল কিন্তু নির্ভরশীল সম্পর্কের কথা, আর আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে পরিবেশ দূষণের নানা প্রসঙ্গ। সমাজকর্মীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সচেতনতাকে যথাযথভাবে তুলে ধরা: কখনও পরিবেশ সংরক্ষণে গণচেতনার বিস্তারে, কখনও বা পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে সরকারি দৃষ্টি আকর্ষণে। প্রকৃতি ও প্রকৃতিগত সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যষ্টি, গোষ্ঠী ও সমষ্টির মধ্যে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংঘর্ষের সূত্রপাত, তাই সমাজতাত্ত্বিকের আলোচ্য। আজকের পরিবেশ বিতর্ককে সামনে রেখেই ঐতিহাসিক প্রসারিত করেছেন পরিবেশগত ইতিহাসের সীমারেখা ও দৃষ্টিকোণ: কখনও উনিশ ও বিশ শতকে, কখনও তারও আগে, নানা কথামালায়, নতুন দৃষ্টিতে। দার্শনিকের বিচারে পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র বিচিত্র মাত্রা পেয়েছে।

পরিবেশ বিতর্কে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ প্রায়শ উল্লেখিত হয়। মনে রাখতে হবে যে সমাজবিজ্ঞানী শব্দটি এখানে সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত নয়। ব্যাপক অর্থে সমাজবিজ্ঞানীর মতামতের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিকভাবে সংবেদনশীল বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গি। সামগ্রিকভাবে সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্মাণেই এই সব বিষয়ের ঐকমত্য।

বৈজ্ঞানিক বা সমাজবৈজ্ঞানিক, কিংবা উভয় দৃষ্টির সংমিশ্রণে আধুনিক পরিবেশ বিতর্ক যে চেহারাই নিক না কেন, সামগ্রিকভাবে আজকের পরিবেশচেতনা কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নমালা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। এই অবস্থাটা শুধু ভারতের নয়, সারা পৃথিবীরই। চারটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, যথা (ক) জৈবিক বা bio-centric (খ) ইকোলজিক (গ) অর্থনৈতিক এবং (ঘ) নৈতিক। জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পাই মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণী ও বৃক্ষলতা সমবায়ে যে বহুবিধ জীবনধারা তার প্রতি এক ধরনের আনুগত্য।

এই আনুগত্য কখনও মানুষের প্রয়োজনভিত্তিক, কখনও বা জীবনধারার পরস্পর নির্ভরশীলতার সূত্র ধরে তা নিছক মনুষ্যপ্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে। বন্যজীবন সংরক্ষণের প্রাসঙ্গিকতা এই সূত্রেই। ইকোলজিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পাই এক ধরনের স্থিতিশীল ব্যবস্থার কথা, যা দীর্ঘ সময়ের মাপে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে গড়ে উঠেছে। মানুষ, বৃক্ষলতা, প্রাণী, জলস্থলের ব্যবহার এমনকী সংস্কৃতির সমবায়ে এই যে স্থিতিশীলতা, এর ব্যত্যয়েই পরিবেশগত বিপর্যয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অর্থনৈতিক দক্ষতা সূত্রের দ্বিবিধ প্রয়োগ, যা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ধ্বংসাত্মক কিংবা রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে পারে। প্রকৃতিজাত সম্পদের অধিকতর, দক্ষতর ব্যবহারের মধ্যে আছে সেই ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া। অথচ অর্থনৈতিক দক্ষতা সূত্রের প্রসারণেই পাই প্রাকৃতিক সম্পদের ভয়াবহ শূন্যতার ভবিষ্যৎ চিত্রটি, যে জন্য আজকের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব। সর্বোপরি পাই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি—এ শুধু 'প্রকৃতির অধিকারে'র কথা বলে না, বন্যজীবন, আরণ্যক মানুষ এমনকী নিসর্গের সম্পর্কসূত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা করে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'র আদর্শকে কখনও প্রসারিত করে, কখনও পাল্টে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ মনুষ্যভিত্তিক নৈতিকতার ধারণার পাশাপাশি পরিবেশগত নৈতিকতার ধারণাকে স্থাপন করতে চায়।

পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলির নিহিত তাৎপর্য আজকের পরিবেশ বিতর্কে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক ভারতের কথাই ধরা যাক। সাধারণভাবে মনে করা হয় আধুনিক পরিবেশ সচেতনতা শুরু হয়েছে ভারতবর্ষে অনেক পরে, বিংশ শতাব্দীতে। এর প্রথম যুগটি সূত্রপাতের যুগ, যখন গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এর প্রচ্ছন্ন প্রকাশ। দ্বিতীয় যুগটি কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সমকালীন ভারতবর্ষের। পরিবেশ সংক্রান্ত নানা প্রতিবাদী আন্দোলন (যথা চিপকো) এবং তৎসংলগ্ন বৌদ্ধিক সচেতনতায় এর প্রকাশ। বস্তুত ১৯৭৩-এর ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে ১৯৮৫-এর স্বতন্ত্র পরিবেশ মন্ত্রণালয় স্থাপন পর্যন্ত প্রশাসনিক ইতিহাস বৃহত্তর পরিবেশ সচেতনতা তথা বিতর্কেরই বহিঃপ্রকাশ। আজকের পরিবেশ-বিতর্কের মূল প্রশ্নগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যোগসূত্রটি। তিনটি বিষয়ের ধারে-কাছে প্রশ্নগুলি জড়ো হয়েছে—(১) পরিবেশের বর্তমান অবস্থা (২) বিভিন্ন প্রযুক্তির বহনযোগ্যতার (sustainability) প্রশ্ন এবং (৩) মতাদর্শ ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রশ্ন। মতাদর্শগত প্রশ্নে একদিকে আছেন গান্ধীবাদী বা নব্য গান্ধীবাদীরা, অন্যদিকে ইকোলজিক্যাল মার্কসবাদীরা। এই দুই মতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছেন যথাযথ প্রযুক্তিবাদীরা। বিতর্কের মৌলিক প্রশ্নগুলি কিংবা মতাদর্শের মৌলিক অবস্থানগুলি ব্যাখ্যা করলেই পাওয়া যাবে পরিবেশ সচেতনতার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যোগসূত্রটি। নব্য গান্ধীবাদীরা যদি নৈতিক প্রশ্নের উপর চাপ দেন তো মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক প্রশ্নে। কিন্তু জৈবিক ও ইকোলজিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই এঁরা গ্রহণ করেন।

মনে রাখা প্রয়োজন, আজকের পরিবেশ-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতটি কিন্তু ঐতিহাসিক। কালক্রমিক বিচারে ইতিহাস বিতর্কটিকে কত পিছনে নিয়ে যাবে কিংবা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিটি কতদূর প্রসারিত করা যাবে সেই নিয়ে মতান্তরের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু পরিবেশের বিপর্যয়ে, তার চেতনার নির্মাণে আধুনিক ইতিহাসের ভূমিকাটি প্রণিধানযোগ্য। পরিবেশের ক্ষেত্রে নৈতিক প্রশ্নের বিচারে, সংস্কৃতি তথা চিন্তার প্রভাবের আলোচনায়, আধুনিক পরিবেশবাদের জন্মক্ষণ অনুসন্ধানে, আর তার চরিত্রের বিশ্লেষণে ইতিহাসই হল সহায়ক প্রেক্ষিত। পরিবেশগত ইতিহাসে এইসব প্রশ্নের গভীরতর তাৎপর্য আছে। পরিবেশগত আন্দোলনের মুখ্য উদ্দীপনা হিসাবে কাজ করেছে পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র, এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত। পরিবেশগত ইতিহাসে অবশ্য নৈতিক প্রশ্নগুলি স্পষ্ট নয়, কিন্তু একেবারে অনুপস্থিতও নয়। ডোনাল্ড ওরস্টার এর মধ্যে এক দ্বন্দ্বের ছায়া খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর ভাষায়: 'পরিবেশগত ইতিহাসের জন্ম... একটা নৈতিক উদ্দেশ্য থেকেই এবং এর পিছনে প্রবল রাজনৈতিক দায়িত্ববোধও ছিল। কিন্তু বয়স্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে এই ইতিহাস বিদ্যাবত্তার এমন এক অনুসন্ধানে পর্যবসিত হয় যার না আছে কোনও সরল কিংবা একক উদ্দেশ্য না নৈতিক কিংবা রাজনৈতিক প্রচারের কার্যক্রম।' অবশ্য মানবিক জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা ও অবস্থানই এর বিষয়বস্তু থেকে গিয়েছে। ওরস্টারের বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়, পরিবেশগত ইতিহাসের বিষয়বস্তু তিন পথে এগিয়েছে। প্রথম পথটি তো প্রকৃতিকেই বোঝার চেষ্টা, অতীত কালের ক্রমে প্রকৃতি যেভাবে সংঘটিত হয়েছে, যেভাবে কাজ করে গিয়েছে তাকে বোঝা। আজকের প্রকৃতি-পরিবেশ পাঠের গৌরচন্দ্রিকাও বলা যেতে পারে তাকে। দ্বিতীয় পথটি সমাজ-অর্থনীতির সেই পরিমণ্ডলের অনুসন্ধান করেছে যার যোগসূত্র হল পরিবেশ। পরিবেশের ইতিহাস এখানে পরিবেশে আবদ্ধ মানুষের, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠনের ইতিহাসে পরিণত হয়। কিন্তু তৃতীয় পথেই হাজির হয়েছে সূক্ষ্ম, মানবিক প্রশ্নাবলি, যাকে নিছক মানসিক বা বৌদ্ধিক প্রশ্নাবলিও বলা হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিরন্তর সংলাপের অংশ হিসাবে এসেছে নানা প্রসঙ্গ: প্রত্যক্ষ্যের উপলব্ধি, নীতিশাস্ত্র, আইন, মিথ এবং বোধগম্যতার হরেক কাঠামো। ওরস্টারের ভাষায়, 'মানুষ সর্বদা তার চতুর্দিকের বিরাজমান জগতের মানচিত্র নির্মাণ করে চলেছে। সে তার সম্পদ-সংস্থানের সংজ্ঞা নির্ণয় করে চলেছে, কী ধরনের কার্যকলাপ পরিবেশ হানিকর কিংবা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

হবার যোগ্য তার বিচার করেছে এবং সাধারণভাবে মানবজীবনের পরিণতির আলোচনা করেছে। যদিচ পরিবেশবিদ্যার আলোচনার তিনটি পথকে আমরা আলাদা করেছি বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য, কার্যত একটি **একক সচল অনুসন্ধানের** ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে এই তিন পথের সমন্বয়েই। এই অনুসন্ধানে প্রকৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন, মানবিক চিন্তা ও বাসনার আলোচনা একসাথেই হতে পারে।

আধুনিক পরিবেশ বিতর্কের মতোই আধুনিক পরিবেশবাদের জন্মকাহিনী ও চরিত্র ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয় হয়েছে। একটা কথা প্রথমেই বলা প্রয়োজন, আধুনিক পরিবেশগত ইতিহাস এবং ১৯৭০-এর দশকের বিশ্বব্যাপী পরিবেশ-সচেতনতা নিছক সমার্থক নয়। আধুনিক পরিবেশবাদ তথা পরিবেশগত ইতিহাস আরও দীর্ঘকালীন: স্বচ্ছন্দে একে উনিশ শতকে চিহ্নিত করা যায়। ইদানীং আধুনিক পরিবেশচিন্তার ঐতিহাসিক পরিধিটিকে আরও বাড়ানো হয়েছে, শুরু হয়েছে তার সমালোচনাও।

আধুনিক পরিবেশচিন্তার জন্মলগ্ন বিষয়ে রিচার্ড গ্রোভের মতামত এই নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। তাঁর গ্রন্থ 'গ্রীন ইম্পিরিয়ালিজম' (১৯৯৫) এবং 'ইকোলজি, ক্লাইমেট অ্যান্ড এম্প্যায়ার' (১৯৯৮) পরিবেশগত ধারণাসমূহের গোড়াপত্তনে ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক প্রসার-পর্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে। পরিবেশচিন্তার উৎসস্থল এইভাবে আমেরিকা থেকে, ইউরোপ থেকে উপনিবেশে এসে পৌঁছয়। সংক্ষেপে গ্রোভের যুক্তিবিন্যাস ও তার সমালোচনামূলক বিচার আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

আধুনিক পরিবেশচিন্তাকে গ্রোভ প্রায় তিনশো বছর পিছিয়ে দিতে চান। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক বিস্তার পর্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েও এই চিন্তা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। ১৫০০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে ঔপনিবেশিক বিস্তার পর্বের চরিত্র তাই গ্রোভের কাছে দ্বিমুখী: একদিকে ব্যাপক ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অর্থনৈতিক তথা পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করেছে, আবার পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক 'আধুনিক' চিন্তাও শুরু হয়েছে এই পর্বে, পশ্চিমি বিজ্ঞানী সম্প্রদায়েরই উদ্যোগে। দুটি বিষয়ে এই চিন্তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথম, উষ্ণ জলবায়ুর উপনিবেশগুলির বনভূমি সংরক্ষণে; দ্বিতীয় এবং ওই সূত্রেই যুক্ত বিভিন্ন বট্যানিক্যাল গার্ডেন নির্মাণে। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের এই নতুন জয়যাত্রা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে তার স্বতন্ত্র অবস্থান সূচিত করে। এই স্বতন্ত্র অবস্থান অবশ্য পশ্চিমের পেশাদারি বৈজ্ঞানিক সচেতনতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ থেকেই উদ্ভূত: এক অর্থে তা পরিবেশচিন্তায় ইউরোপীয় এবং অ-ইউরোপীয় জ্ঞানতন্ত্রেরই ফল।

গ্রোভ-কথিত আধুনিক পরিবেশচিন্তার জন্ম-বৃত্তান্তের কয়েকটি সমালোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, গ্রোভ পশ্চিম থেকে উৎসারিত ইকোলজিক্যাল সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ, উপনিবেশের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর তার ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট মিতবাক। গ্রোভের রচনায় ক্রসবির ('ইকোলজিক্যাল ইম্পিরিয়ালিজম: দি বায়োলজিক্যাল এক্সপ্যানসন অব ইউরোপ', ১৯৮৯) দৃষ্টিশক্তি নেই। দ্বিতীয়ত, গ্রোভের লেখায় প্রাক-ঔপনেবেশিক পর্বের বনভূমি বিনাশের সঙ্গে ঔপনিবেশিক পর্বের বিনাশের কোনও পার্থক্য সূচিত হয় না, যদিচ প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার কথা তিনিও বলেন। মনে হয়, ঔপনিবেশিক পর্বের পরিবেশ বিপর্যয়ের থেকেও পরিবেশ সচেতনতার দিকেই তিনি চাপ দেন, যদিও এই সচেতনতা বিপর্যয় রোধে যে আদৌ কার্যকর ছিল না, সেকথা গ্রোভও স্বীকার করেছেন। সর্বোপরি, ঔপনিবেশিক কালে আধুনিক পরিবেশচিন্তায় পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দেশীয় জ্ঞান, চিন্তা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের কথা বলেছেন তিনি, কিন্তু পশ্চিমি জ্ঞানতন্ত্রের মূল কাঠামোটির প্রাধান্য সর্বদাই মেনে নিয়েছেন। প্রকৃতি ও সংস্কৃতির টানাপড়েনে ঔপনিবেশিক পরিবেশ ও পশ্চিমি চিন্তার মূল দ্বন্দ্বটি তাই লুপ্ত হয় না।

আধুনিক পরিবেশবাদের জন্মকাহিনী এবং তার সমালোচনাতেও তাই পাই আধুনিক ইতিহাসেরই দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপট।। আজকের পরিবেশ-বিতর্কের আলোচনায় এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শুধুমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যাই দেয় না, এক অর্থে দিশারীরও কাজ করে। বহু-মত-কন্টকিত আজকের পরিবেশ বিতর্কে একটি বিরোধ স্পষ্ট: সেটি হল পরিবেশ সম্পর্কিত বিশ্বজনীন (গ্লোবাল) ধারণার সঙ্গে স্থানীয় (লোকাল) ধারণার বিরোধ। এই বিরোধের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পরিবেশ বিষয়ে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির বিরোধ, পরিবেশ ও বিকাশের বিরোধ, পরিবেশ ও সমতার বিরোধ। মৌলিক বিজ্ঞান প্রধানত বিশ্বজনীন ধারণাগুলিকে পুষ্ট করেছে, সমাজবিজ্ঞান স্থানীয় ধারণাকে। আজকের পরিবেশ-বিতর্ক তথা আধুনিক পরিবেশবাদ কিন্তু গড়ে উঠেছে বিশ্বজনীন ও স্থানীয় ধারণার সমন্বয়েই। বিশ্বজনীন ধারণার মধ্যে পাই পশ্চিমি চিন্তার ছায়া, স্থানীয় ধারণার মধ্যে পাই দেশীয় জ্ঞান ও রীতিনীতি। পরিবেশের যথাযথ সংরক্ষণে ফলিত বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতি ও ভাবনার গুরুত্ব আজ স্বীকৃত। আধুনিক পরিবাশবাদকে বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে গ্রোভের কাহিনী এক বিশেষ পথে অগ্রসর হয়েছে, তাকে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে দেখলে হয়ত অন্য পথের সন্ধান পাওয়া যেত। পরিবেশের বিশ্বজনীন ও স্থানীয় ধারণার দ্বন্দ্বে, তার যথাযথ অনুধাবন ও সম্ভাব্য সমাধানে, ইতিহাস তাৎপর্যময় দিশারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। □

এবারকার 'চতুরঙ্গ' (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫) হাতে পেয়ে এক টানে পড়ে ফেললাম। অনেকগুলি চমৎকার অনুভবী গদ্য এবারকার আকর্ষণ। লেখাগুলি শান্ত, প্রসন্ন ও সিদ্ধান্তময়। পাঠকের কাছ থেকে প্রতিবাদী চিঠি আনার মতো উত্তেজক নয়। তবু সেগুলি নয়, আমার বেশি ভাল লেগেছে গৌরী আইয়ুবকে নিয়ে স্মৃতিবহুল শ্রদ্ধাঞ্জলির অংশ। একটা কথা বোঝা গেল, গৌরীদি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেও হয়ে উঠেছিলেন সর্বময়ী। যেন জ্যোৎস্নার মতো পরিপ্লাবী, সকলেরই সামগ্রী। কলকাতায় তাঁর সুন্দর সাজানো ঘরের বিছানায় বসে থাকতেন বাধ্যত কিন্তু মনটা চলত সব রকমের পীড়িত আর্ত মানুষের জন্য সেবাকামনায়। কলকাতার কত জন তাঁর নিকট সান্নিধ্য, স্নেহ, ভালবাসা পেয়েছেন। তাঁদের স্মৃতিচারণে বহু তথ্য উঠে এসেছে। কলকাতা থেকে একশো কিলোমিটার দূরে বসবাসকারী মফস্বলের মানুষ হিসাবে আমারও গৌরীদির সম্পর্কে কিছু কৃতজ্ঞ স্মৃতি প্রত্যুপহার দেবার আছে। চতুরঙ্গের পাঠকদের সেই উজ্জ্বল মহীয়সী নারীর জীবনের আরও দুয়েকটি দিক জানাবার জন্য এই চিঠির অবতারণা।

আইয়ুবদের পার্ল রোডের বাড়িতে ষাটের দশকে যে কবার গেছি (তখন আমি তরুণ অধ্যাপক) তার লক্ষ্য ছিলেন আবু সয়ীদ। গৌরী তখন সংসারের নানা নেপথ্য বিধানে ব্যস্ত থাকতেন, ক্বচিৎ ঘরে আসতেন। তবে কথাবার্তায় যোগ দিতেন। তাঁর সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে অনেক পরে—আবু সয়ীদ তখন প্রয়াত। এবারকার যোগাযোগ গৌরীদিরই আগ্রহে। কোনওভাবে তিনি জেনেছিলেন (বোধ হয় স্নেহভাজন কামাল হোসেনের কাছে) যে আমার বড় মেয়েটি মানসিক প্রতিবন্ধী। তাকে নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ও জিজ্ঞাসার শেষ ছিল না। পরে দেখলাম, শুধু আমি নই, কলকাতা ও তাঁর চেনাজানা বহু মানুষের জড়বুদ্ধি সন্তানদের সম্পর্কে 'ইস্' বলে জিভ চুকচুক না করে গৌরীদি ভেবেছিলেন অনেক বড় একটা কথা। ভেবেছিলেন আমরা (অর্থাৎ এইব অসহায় সন্তানদের জনকজননী) যখন বৃদ্ধ হব বা প্রয়াত হব তখন এদের দেখবে কে? তাই গৌরীদি এইসব সন্তপ্ত স্বপ্নচ্ছিন্ন অভিভাবকদের নিজের ঘরে ডেকে দিনের পর দিন কথা বলেছিলেন একটা আবাস নির্মাণের আশু প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে। তার জন্য জমিসংগ্রহ, অর্থসংগ্রহ, (এসব কাজে অর্থের অভাব হয় না, আমরাও অনেকে যথাসর্বস্ব দিতে রাজি) সেবিকাসংগ্রহ সবই তিনি বহুদূর পর্যন্ত ভেবেছিলেন। তাঁর প্রয়াস যে বাস্তবের মুখ দেখেনি তার জন্য দায়ী আমাদের সমন্বয়হীন চেতনা কিংবা নিজের সন্তানটুকুর জন্যই শুধু একক ভাবনার কৃপণতা। কিন্তু এটা সত্যি যে এই ভাবনাচিন্তার দিনগুলোর স্বপ্নবাদী গৌরীদির যে-মাতৃমূর্তি দেখেছ, যে-উৎকণ্ঠা আর বেদনাবোধ, তার কোনও তুলনা নেই। এতবড় পৃথিবী ও আমার জানাচেনার বিরাট বৃত্তে একমাত্র গৌরীদিই এগিয়ে এসেছিলেন। উপদেশ দিয়েছিলেন বড় মেয়েটির ব্যাধির কারণে সুস্থ স্বাভাবিক ছোট মেয়েটি আমার যেন উপেক্ষিত না হয়, তাকে সঙ্গ দেওয়া জরুরি। বলেছিলেন, 'আইয়ুব যখন খুব অসুস্থ। বিচারবুদ্ধি পর্যন্ত ছিল না, তখন পুষন ছোট। পাছে বাবার অসুস্থতা তার কচি মনে অন্য প্রতিক্রিয়া আনে তাই পুষনকে মাঝে মাঝেই আমি সন্ধ্যের পর পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপো থেকে ট্রামে করে ময়দান আবার তাতেই ফিরে কত গল্পে কবিতায় মশগুল রাখতাম।'

আজ সেই পুষন প্রতিষ্ঠিত। আমার ছোট মেয়েটিরও বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধী বড় মেয়েটি নিশ্চল বসে জানতে পারল না মমতাময়ী তার এক পিসি চলে গেলেন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বৃত্ত ছিঁড়ে। অথচ শেষদিকে গৌরীদি তো ছিলেন শারীরিক প্রতিবন্ধী, তবু মনের বহতা কোনওদিন থামেনি।

গৌরীদি সম্পর্কে আরেকটা অন্যরকম স্মৃতিও আজ জেগে উঠছে। বছর কয় আগে তাঁর হঠাৎ শখ হয়েছিল তাঁর ঘরে আমার গলার গান শোনাবেন তাঁর কিছু নির্বাচিত প্রিয়জনকে। এমন অনুষ্ঠান তো তিনি কতজনকে দিয়ে কতবার করেছিলেন। কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল সস্ত্রীক। সেই সঙ্গে অনুরোধ ছিল নৈশ আহার এবং মফস্বলবাসী বলে রাত্রিবাসেরও। চিঠিতে লিখেছিলেন 'আপনারা আইয়ুবের ঘরে থাকবেন।' আইয়ুবের ঘরে আমাদের প্রবেশাধিকার ও রাত্রিবাসের দুর্লভ স্মৃতি আমার জীবনে এক আশ্চর্য অর্জন। অমিতাভ চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণে যে-'আইয়ুব-কৃষ্টির' কথা উল্লেখ করেছেন তবে কি গৌরীদি তার অন্তঃস্থলে আমাকেও স্থান দিয়েছিলেন?

সুধীর চক্রবর্তী

৮ রামচন্দ্র মুখার্জি লেন, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১

ENJOY

Arambagh's chicken

SERVED **FRESH-N-CHILLED**

WITHIN MINUTES OF YOUR ORDER

FROM ANY OF OUR EXCLUSIVE

COUNTERS AT CALCUTTA

ARAMBAGH HATCHERIES LIMITED

59B, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700 020

DIAL : 240-2179/2760/1930/0873. FAX : 91-332474137

Sales Offies.351 5037/350 3089

PSL UniMcCann